নবরত্ন।

[সৎশিক্ষাপ্রদ উপন্যাস-গল্পাবলি।]

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী

সম্পাদিত।

প্রকাশক—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া।

Printed and Published
By
DHIRENDRANATH LAHIRI,
at the
"Prithibir Itihasha" Printing Works,
2, Annoda Prosad Banerji's Lane, Khirertola,
Howrah. (*Calcutta*,)

সম্পাদকের বক্তব্য।

আজকাল প্রায় সকল দেশেই উপন্যাসের বা গল্পের বইএর বড়ই আদর। যাঁহারা সামান্য একটুও লেখাপড়া শিখিয়াছেন, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি যুবক কি যুবতী, তাঁহাদের প্রায় সকলের নিকটই উপন্যাসের বা গল্প-পুস্তকের গতাগতি দেখিতে পাই।

উপন্যাস, উপকথা, উপাখ্যান, কাহিনী অথবা গল্প, যে নামেই অভিহিত করি, সে সেই একই পর্য্যায়ের সামগ্রী, বিভিন্ন বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সমাজের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বেই বা কিরূপ উপাখ্যান, কিরূপ গল্প, কিরূপ কাহিনী মানুষের চিত্তবিনোদন করিত, আর এখনই বা তাহা কি আকারে প্রবর্ত্তিত হইতেছে; একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, মাত্র একটা ধারা-পরিবর্ত্তনের বিষয় বোধগম্য হয়।

প্রাচ্যে প্রতীচ্যে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, এক সময়ে পুরাণ-ইতিহাসের কাহিনী-পরম্পরা মানুষের চিত্তবিনোদক ও সৎশিক্ষা-বিধায়ক দ্বিবিধ উদ্দেশ্যসাধক ছিল। অধুনা কল্পিত গল্প বা উপন্যাস আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। এদেশে যেখানে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীদাসের মহাভারত আদর পাইত ; এক জনে একখানি পাঠ করিতে বসিলে, দশ জনে ঘেরিয়া বসিয়া তাহার পাঠ শুনিত ; এখন সেখানে, কোথাও গোপনে, কোথাও বা প্রকাশ্যে, কোথাও অর্দ্ধ-সঙ্কুচিত ভাবে, কোথাও বা নিঃসঙ্কোচে উপন্যাস প্রবেশ করিয়াছে। এখন বোধ হয় এমন গৃহস্থ অতি অল্পই আছেন—যাঁহাদের গৃহে উপন্যাসের বা গল্প-পুস্তকের আদর নাই।

উপন্যাস বা গল্প-পুস্তক হইলেই তাহা যে অনাদরের সামগ্রী হইবে, পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যায় কেহ যেন তদ্রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হন। পরন্তু উপন্যাস-গল্পের সাহায্যে সমাজের যে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে পারি। তবে, সর্ব্বথা বিবেচনা করা উচিত,—পঠিতব্য উপন্যাস গল্পের প্রকৃতি কিরূপ উপাদানে বিগঠিত হওয়া কর্ত্তব্য! সে উপন্যাস বা গল্প পঠিতব্য নয়—যে উপন্যাসে বা গল্পে সৎশিক্ষা নাই। সে উপন্যাস বা সে গল্প পঠিতব্য নয়,—যে উপন্যাস পাঠে সৎপ্রসঙ্গে সদাচারে বা সদ্ধর্ম্মে অনুরক্তি না জন্মে। সে

উপন্যাস বা গল্প অপঠিতব্য,—যাহাতে মনোমধ্যে কুচিন্তা, কুভাব বা কু-প্রবৃত্তির উন্মেষণ হয়। কোনও উপন্যাস বা গল্প পাঠের পূর্ব্বে তাহা পঠিতব্য কি অপঠিতব্য, সর্ব্বথা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এমন অনেক উপন্যাস বা গল্প আছে,—যাহা পড়িতে কৌতূহলপ্রদ, অথচ কুশিক্ষার আধার। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি—কত সময় কত বিপরীত পথে কৃতিত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু তাহার সকল চিত্রই কি প্রদর্শনীয়? চোর চৌর্য্যবৃত্তিতে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে, লম্পট লাম্পট্য-বিষয়ে অশেষ চাতুর্য্য প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু সে চিত্র প্রস্ফুট করিয়া, স্বভাব-চিত্র অঙ্কনের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া, যিনি পাঠকের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট করেন, তিনি নিপুণ চিত্রকর হইলেও, তাঁহার উপন্যাস কখনই সমাজে স্থান পাওয়া কর্ত্তব্য নহে। দর্পণে যে প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়, তাহা যথার্থ হইলেও সকল সময় প্রীতিপ্রদ নহে। দর্পণে কৃমি-কীট-পূর্ণ পয়ঃপ্রণালীর প্রতিচ্ছবিও প্রতিভাত হয়, আবার কুসুমসম্ভারের সৌন্দর্য্য-সুষমাও প্রকাশ করে। কিন্তু ঐ উভয় দৃশ্যের কোন্‌টি প্রাণারাম?—কোন দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় প্রীতি-প্রফুল্ল হয়?

যাহা সুন্দর, যাহা সৎ, তাহাই অনাবিল আনন্দের উৎস। জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, তাহা সেইখানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়—যেখানে সৎ শান্ত শুভ্র নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান বিদ্যমান।

সুতরাং প্রবন্ধে, অনুবন্ধে, গল্পে, কাহিনীতে, উপাখ্যানে, উপন্যাসে, সর্ব্বত্র সদ্ভাবের বিকাশ আবশ্যক। অসদ্ভাব-রূপ আবর্জ্জনারাশি পরিত্যাজ্য, আর সদ্ভাবরূপ রত্নরাজি সংগ্রহ প্রয়োজন,—এই শিক্ষা কেন্দ্রীভূত করিয়া যে উপন্যাস বা যে গল্প বিরচিত হয়, তদ্দ্বারাই সমাজের হিতসাধন ও জনসমাজের জীবনগতি সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

'নবরত্ন'—সেই মহান্ লক্ষ্য লইয়া লোক-সমাজে প্রচারিত হইল। সৎকর্ম্মে আনুরক্তি উৎপাদন ও অসৎকর্ম্মে বিরাগবর্দ্ধন—'নবরত্নের' মূল লক্ষ্য। পাপপুরুষ প্রলোভন-জাল বিস্তার করিয়া প্রাণিমাত্রকে আকর্ষণপূর্ব্বক কেমনভাবে উদরসাৎ করিবার চেষ্টা পাইতেছে; আর সৎপুরুষের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে সে জাল ছিন্ন করিয়া প্রাণিগণ কেমনভাবে উদ্ধার লাভ করিতেছে,—'নবরত্নের' গল্পমালায় তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইবে। 'নবরত্নের' প্রতি উপন্যাসে বা প্রতি গল্পে সুশিক্ষার অভিনব আলোক শান্তিময় পথ প্রদর্শন করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে।

'নবরত্ন'—নয় জন বিভিন্ন লেখকের রচনায় সংগ্রথিত। আমার দৃষ্টিতে 'নবরত্নের' প্রতি চূড়াই রত্নসম্ভার পূর্ণ। তবে 'নবরত্নের' কোন্ চূড়া মধ্যস্থানীয় অর্থাৎ উচ্চতম, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিব না। আমার দৃষ্টিতে মন্দিরের নয়টী চূড়াই সমধিক শোভাসৌন্দর্য্যসম্পন্ন। নবরত্ন-মন্দিরের যে কোনও একটী চূড়া

ভাঙ্গিয়া গেলে, মন্দির যেমন নষ্ট-শ্রী হয় ; এ নবরত্নেরও একজনকে উপেক্ষা করিয়া অন্যজনের প্রতিষ্ঠা-খ্যাপনের চেষ্টা পাইলে, আমারও মনে সেইরূপ, ইহার সৌন্দর্য্যহানির আশঙ্কা আসে। কাহাকে উপেক্ষা করিয়া কাহার প্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিব? 'নবরত্নের' যাঁহারই প্রতি লক্ষ্য করি, তাঁহারই সম্বন্ধে মনে হয়, তিনি বাঙ্গালার যে-কোনও প্রসিদ্ধ গল্প-লেখকের অপেক্ষা হীন নহেন। তুলাদণ্ডের ন্যায়-বিচারে তুলনা করিলে, ইঁহাদের কাহারও প্রতিভা বাঙ্গালার কোনও প্রসিদ্ধ লেখকের প্রতিভা অপেক্ষা কম নহে।

যে উদ্দেশ্য যে লক্ষ্য লইয়া 'নবরত্ন' সংগ্রথিত হইল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক,—উপন্যাস-গল্পের মধ্য দিয়া নরনারীর হৃদয়ে সচ্চিন্তা সদ্ভাব বিকাশপ্রাপ্ত হউক ; তবেই 'নবরত্নের' সার্থকতা। দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া যদি দেবভাব সঞ্জাত না হইল, তবে আর মন্দিরে দেবতার অধিষ্ঠান কি ?

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়,
হাওড়া।

নিবেদক,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

সন ১৩২৪ সাল, শুভ ১লা বৈশাখ।

সূচীপত্র।

জ্যোতিঃ।

———‡ § ‡———

(১)

কৌশাম্বী-নগরে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। যজন-যাজন দ্বারা ব্রাহ্মণের দিনপাত হইত।

সংসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং একটি শিশু পুত্র মাত্র বিদ্যমান ছিল। পত্নীর নাম যশা, শিশু পুত্র কপিল নামে অভিহিত।

ব্রাহ্মণ যজন-যাজন দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, অতিথি-অভ্যাগতের সৎকারে সমস্তই নিঃশেষ হইয়া যাইত;— ভবিষ্যতের সংস্থানের প্রতি তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

সহসা কাশ্যপের লোকান্তর ঘটিল। তাঁহার অন্ন সংস্থান অপরে অধিকার করিল। সুতরাং তাঁহার সহধর্ম্মিণী যশা এবং তাঁহার শিশু পুত্র কপিল পথের ভিখারী হইল।

"পতি দেশ-মান্য পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র কপিল—সে কি মূর্খ হইয়া থাকিবে?"

দিনের পর যতই দুঃখের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, জননীর চিত্ত সেই দুশ্চিন্তায় ততই আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

শ্রাবস্তী-নগরে কাশ্যপের এক বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম—ইন্দ্রদত্ত। যশা সেই ইন্দ্রদত্তের নিকট আপনার অঞ্চলের নিধিকে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন।

ইন্দ্রদত্তের অবস্থাও তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না। সুতরাং বিদ্যা-শিক্ষা-দানের ভার লইতে সম্মত হইলেও, তিনি বালকের ভরণ-পোষণের ভার লইতে সমর্থ হইলেন না। তবে তত্রত্য এক সহৃদয় বণিকের সহিত তাঁহার সম্প্রীত ছিল। সেই বণিককে অনুরোধ করিয়া তিনি সেই বণিক-ভবনে বিদ্যার্থী কপিলের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এইরূপে শ্রাবস্তী-নগরের এক বণিকের গৃহে কপিল আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার আহারের ও বাসস্থানের ব্যবস্থা বণিক করিয়া দিলেন। ইন্দ্রদত্ত তাহার শিক্ষাদানে ব্রতী রহিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে কপিল দিন দিন বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা-লাভে সমর্থ হইল।

(২)

কপিলের পরিচর্য্যার জন্য বণিক-গৃহে এক কিশোরী দাসী-রূপে নিযুক্তা ছিল।

সে আজ চৌদ্দ বৎসরের কথা—রাজগৃহে ভীষণ দুর্ভিক্ষ-দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। সেই সময় এক গ্রামপ্রান্তে বণিক ঐ কিশোরীকে কুড়াইয়া পান।

তখন উহার বয়ঃক্রম এক বৎসর মাত্র। মুমূর্ষু জননীর ক্রোড়ে পড়িয়া শিশু ক্ষুধায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। বণিকের উপস্থিতির মুহূর্ত্ত পরেই উহার জননীর ইহজীবন শেষ হয়। তাহার মৃত্যু দেখিয়া বণিকের মনে হইল—যেন তাঁহার হস্তে কন্যার ভার অর্পণ করিবার জন্যই দুঃখিনী দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিয়া ছিল।

বণিক বালিকাকে আপন গৃহে লইয়া আসিলেন। এক জন বিশ্বস্ত পরিচারিকার উপর উহার লালন-পালনের ভার অর্পিত হইল।

বণিকের ভবনে অনায়াসলভ্য অসন-বসনে লালিত-পালিত বর্দ্ধিত হইয়া, পরন্তু যৌবনোদ্গমের শ্রীসৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া, দুঃখিনীর কন্যা এখন অপরূপ রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী হইয়াছে।

যদিও তাহার বৃত্তি এখনও অপরিবর্ত্তিত, যদিও সে এখনও পরিচারিকার কার্য্যেই বিনিযুক্ত; কিন্তু তাহার প্রাণে এখন আশা-শতদল বিকাশোন্মুখ,—নব রাগের নব নব অঙ্কুর উদ্গত।

কিশোরীর এই বয়ঃসন্ধিক্ষণে, ব্রাহ্মণযুবক কপিলের পরিচর্য্যার ভার তাহার উপর ন্যস্ত হয়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বিধির যাহা অলঙ্ঘ্য বিধি, উভয়কেই তাহার অধীন করিয়াছিল। অনুরাগের আকর্ষণে, চুম্বক-লৌহের ন্যায়, পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে হইয়াছিল।

(৩)

পাঠ-সমাপনান্তে শয়ন-গৃহে আসিয়া একদিন কপিল দেখিল—"সেই কিশোরী বিমর্ষ মনে বসিয়া রহিয়াছে। অন্যান্য দিন কিশোরীর স্মিত-মধুর সম্বর্দ্ধনায় কপিলের প্রাণে যে প্রীতির সঞ্চার হইত, আজ তাহার সম্পূর্ণ অভাব অনুভূত হইল।

কপিল উদ্বিগ্ন মনে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন—তোমায় আজ এমন দেখ্‌ছি কেন?"

কিশোরী উত্তর দিতে পারিল না। তাহার পলাশ-নয়নে অশ্রুবিন্দু ঢলঢল করিতে লাগিল। কপিল বস্ত্রাঞ্চলে তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া স্নেহ-সম্ভাষে কহিল,—"বল, বল—কেন তোমার এ ভাবান্তর ঘটিল! আমি এতদিন এখানে বাস করিতেছি; কৈ, কোনও দিন তো তোমার এমন মলিন মুখ দেখি নাই! তোমার কষ্টের কি কারণ, আমায় মুক্তকণ্ঠে বল; আমি প্রাণপণ যত্নে তোমার সে কষ্ট লাঘব করিবার চেষ্টা করিব।"

কপিলের আগ্রহাতিশয্যে, কিশোরীর হৃদয়ের কপাট খুলিয়া গেল। অর্দ্ধ-সঙ্কুচিত অর্দ্ধ-সন্ত্রস্ত ভাবে সে আপন বক্তব্য বিবৃত করিল। তাহার বিষাদের কারণ এই যে, তাহাদের জাতীয়-উৎসবে সে যোগ দিতে পারিবে না; কেন-না, সে নিরাভরণা।

কিশোরী কাঁদিয়া কহিল,—"বিধি কোন্ পাপে আমায় এত গরীব করিলেন?"

কপিল সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—"তোমার এই দুঃখ দূর করিবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব। আমি এই রাত্রেই বাহির হইতেছি; তোমার অলঙ্কার-ক্রয়ের উপযোগী অর্থ আমি কল্যই সংগ্রহ করিয়া আনিব।"

(৪)

শ্রাবস্তী-নগরে ধন নামে আর এক বণিকের বসতি ছিল। অতুল ঐশ্বর্যশালী ধন, দাতার শিরোমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার দানের একটি বিশেষ নিয়ম ছিল। প্রতিদিন প্রত্যূষে যে ভিক্ষার্থী তাঁহাকে প্রথম অভিবাদন করিতে পারিত, তাহাকে তিনি দুই খণ্ড সুবর্ণ প্রদান করিতেন। কপিল সেই সংবাদ অবগত ছিল। সুতরাং সে রাতারাতি রওনা হইয়া বণিকের দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিবার সঙ্কল্প করিল। তাহার প্রাণভরা আশা—সেই প্রথমে বণিককে অভিবাদন করিতে সমর্থ হইবে; সুতরাং স্বর্ণখণ্ডদ্বয় তাহারই প্রাপ্য হইবে।

মানুষ মনে করে এক; ঘটনাবর্ত্তে সংঘটন হয় অন্যরূপ।

কপিল গভীর নিশীথে একাকী বণিকের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। সন্দেহ-বশে রাজপ্রহরিগণ তাহাকে অবরোধ করিল। কপিল কোথায় প্রভাতে কিশোরীর অলঙ্কারের ব্যবস্থা করিবে; না—সে কারাগারে আবদ্ধ হইল।

রাজা প্রসেনজিৎ তখন শ্রাবস্তীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার দরবারে চৌরপর্য্যায়ভুক্ত কপিল বিচারার্থ নীত হইল।

সুকান্তি ব্রাহ্মণযুবককে চৌরপর্য্যায়ভুক্ত দেখিয়া, রাজার মনে একটু সন্দেহের উদয় হইল। অন্যান্য অপরাধিগণের বিচার শেষ করিয়া, একান্তে কপিলকে ডাকিয়া, রাজা সত্য তত্ত্ব অবগত হইবার প্রয়াস পাইলেন। কপিল মুক্তকণ্ঠে অকপটে সকল কথা প্রকাশ করিল।

প্রসেনজিৎ কহিলেন,—"যুবক! তোমার কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তুমি হিসাব করিয়া বলিতে পার? তোমায় আমি বিবেচনার জন্য সময় দিতেছি। তুমি যাহা চাহিবে, আমি তোমাকে তাহাই দিব। তুমি ধীর স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া আসিয়া আমার নিকট অর্থ যাচ্ঞা কর; তোমার সকল অভাব আমি পূরণ করিয়া দিব।"

(৫)

কপিল রাজোদ্যানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। রাজা প্রসেনজিৎ বলিয়াছেন, তাহার সকল অভাব পূরণ করিবেন। সুতরাং কি পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হইলে সকল অভাব পূরণ হইতে পারে, কপিল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

কপিল মনে মনে কহিল,—"কত চাহিব? এক শত! দুই শত! পাঁচ শত! সহস্র! কত চাহিব।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল—'সহস্রেও কুলাইবে না। লক্ষ! দশ লক্ষ! কোটী!—চাহিতেই যখন পাইব, চাহি না কেন?'

কপিল উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজার নিকট কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিবে—স্থির করিল। এক পদ, দুই পদ, তিন পদ অগ্রসর হইল। আবার কে যেন বাধা দিল। কাণে কাণে কহিল,—"আরও—আরও—"

কপিল আকাঙ্ক্ষার সীমা দেখিতে পাইল না। কত অর্থ মিলিলে অভাব পূরণ হইতে পারে, গণনাঙ্কে নির্ণয় হইল না। যতই প্রার্থনার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিল, ততই অভাবের আধিক্য পুরোভাগে বিদ্যমান দেখিল।

দেখিতে—দেখিতে—দেখিতে—শেষ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, অভাবও আর মিটে না, আশাও আর ফুরায় না। তখনই তাহার অন্তরে সে এক দিব্য জ্যোতিঃ বিকাশ পাইল। কপিল দেখিল,—"তৃষ্ণাবধিং কোগতঃ।"

(৬)

রাজা প্রসেনজিৎ পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। ব্রাহ্মণযুবক যে প্রার্থনা করিবেন, রাজা তাহাই পূরণ করিবেন। মন্ত্রিগণের অনেকেই সেই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হইয়াছেন।

কপিল উদ্ভ্রান্তের ন্যায় রাজসভায় প্রবেশ করিল।

এ কি সেই ব্রাহ্মণযুবক কপিল! এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার এ কি পরিবর্ত্তন! তাহার সেই কুঞ্চিত কেশদামকে এমন করিয়া উৎপাটন করিল! তাহার সেই গৌরকান্তি কেনই বা এরূপ ধূলায় ধূসরিত হইল! কেন তাহার সে অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষানত নয়ন আজ ঊর্দ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন!

কপিল রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল,—"রাজন্, আপনার ঐ অর্থের চাকচিক্যে আমার চিত্ত আর আকৃষ্ট নয়। সকল চাকচিক্যের আধার যিনি, সকল জ্যোতিঃর আদি যিনি, তিনি আজ আমার অন্ধ আঁখি উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। আমি আজ বুঝিয়াছি, লালসা যতই বাড়াইব, ততই বাড়িবে; কামনা যতই পূরণ করিতে যাইব, ততই বৃদ্ধি পাইবে।"

এইরূপে পরম তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া কপিল প্রস্থান করিল। আকাঙ্ক্ষার অবসানে, তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে, দিব্যজ্ঞান বিকাশে, তাহার জীবন্মুক্তি লাভ হইল।

ভিখারী।

—‡ * ‡—

(১)

ম্লানমুখে গৃহিণী কহিলেন,—"আর কত কাল ভাব্‌বে?"

কর্ত্তা কহিলেন,—"যত কাল জীবন, তত কাল ভাবনা। ভাবনার হাত এড়াতে পার্‌লেম কৈ?"

গৃহিণী কহিলেন,—"ইচ্ছে ক'রে ভাবনার জাল জড়ালে, সে জাল ভগবানও ঘুচাতে পারেন না!"

কর্ত্তা।—ইচ্ছা করে কোন্ নির্ব্বোধ জড়াতে যায়?

গৃহিণী।—ইচ্ছা নয় তো আর কি বলি! এত যায়গা থেকে এত ভাল ভাল সম্বন্ধ এলো, একটাও মনে ধর্‌লো না,—এ সাধ নয় তো আর কি বলি?

কর্ত্তা।—তোমার মতে যে গুলো ভাল, আমার বোধ হয় সে গুলো খুবই মন্দ।

গৃহিণী অভিমানভরে কহিলেন,—"তা বৈ কি! আমার বুদ্ধিই বা কি, আর বিবেচনাই বা কতটুকু! তবে আমি স্ত্রীলোক, মোটামুটি যা বুঝি, তাতে মনে হয়—ভাল মন্দ সব মেয়ের অদৃষ্টের ফল।"

কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন,—"তবে আর কথা কেন? চুপে চাপে বসে থাক্‌লেই হয়! মেয়ের অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।"

গৃহিণী কহিলেন,—"তুমি কথার রাজা। কথায় তোমায় ঠকায় কে? ভেবে ভেবে শরীরটা খারাপ না কর্‌লেই বাঁচি।"

কর্ত্তা বিশ্বেশ্বর বাবু সুরসিক লোক। রহস্যের হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"না, সে ভয় আর নাই। দুধ মরে ক্ষীর হয়েছে, আর খারাপ হচ্ছে না।"

গৃহিণী কহিলেন,—"রামপুরের বসুরা খুব বড় লোক। তাদের ঘরের ছেলে—দেখ্‌তে কার্ত্তিক। লেখা পড়ায় শুন্‌লেম দুটা পাশ দিয়েছে। সে ঘরে পড়্‌লে রেবতী আমার চিরসুখী হতো।"

কর্ত্তা আবার একটু হাসিলেন। হাসিয়া কহিলেন,—"সে তো মেয়ের অদৃষ্টে থাকা চাই!"

গৃহিণী আপন কথায় আপনি ঠকিয়া পড়িলেন। কর্ত্তার কথার উপযুক্ত উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। অগত্যা নীরবে গম্ভীর বদন অবনত করিয়া রহিলেন।

কর্ত্তা কহিলেন,—"সে আমি সব জেনেছি। সে সম্বন্ধের আর সবই ভাল, কেবল এক কলসী দুধে একটু চোনা পড়েছে!"

গৃহিণী আশ্চর্য্যের ভাবে কহিল,—"সে কি?"

কর্ত্তা দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন,—"হাঁ, আমি বিশেষ অনুসন্ধান করেছি; সব জেনেছি। জেনে শুনে সে আশা একেবারে পরিত্যাগ করেছি।"

গৃহিণী আবার কহিলেন,—"আমিও সব খোঁজ নিয়েছি। ধনে, মানে, কুলে, শীলে—সর্ব্ব অংশে রামপুরের বসুরা খুব বড়। ছেলেও ভাল। তার মন্দটা তো কৈ আমি কখনও কিছু শুন্‌তে পাই-নি!"

কর্ত্তা কহিলেন.—"সবই ভাল, কেবল ছেলেটা খারাপ। ছেলের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়।"

গৃহিণী কহিলেন,—"সে তোমার ভুল। কোনও শত্রুতে লাগিয়েছে।"

কর্ত্তা দৃঢ়তার সহিত কহিলেন,—"দেখ, আমি বিশেষ না জেনে-শুনে এমন একটা কথা বলি-নে। বিশেষতঃ, রেবতীর যাতে সুখ হবে, তেমন সম্বন্ধ কি সাধ করে পরিত্যাগ কর্‌তে পারি! তাকে সুপাত্রে সমর্পণ কর্‌তে পার্‌লে আমার আর ভাবনা কি? তা হ'লে সকল ভাবনার হাত এড়িয়ে দু'জনে কাশী গিয়ে বাস কর্‌তে পারি।"

গৃহিণী কহিলেন,—"কাশী যাবার এত তাড়াতাড়ি কি! রেবতীর বিয়ে দাও। তার ছেলেপিলে হোক। তাদের নিয়ে শেষ-কালটা দু'দিন আমোদ-আহ্লাদ কর। মনুষ্য-জন্ম সফল হোক। তার পর তীর্থ-ধর্ম্ম করলেই হবে।"

কর্ত্তার বদন বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন হইল। কর্ত্তা বিষণ্ণ-বদনে কহিলেন,—"তাই তো ভাবি! আমাদের তো আর ছেলে-মেয়ে নাই! রেবতীই আমাদের ছেলে—সেই আমাদের মেয়ে। তার সুখেই আমাদের সুখ। স্ত্রী-জন্মের সুখ সৎস্বামী নিয়ে। তেমন স্বামীর হাতে তাকে দিতে পারলেম কৈ?"

এই সময় হরি মাষ্টার আসিয়া বাহিরে ডাকিলেন।

কর্ত্তা কহিলেন,—"আসুন।"

গৃহিণী প্রস্থান করিলেন। হরি মাষ্টার আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন,—"আমি একটি পাত্র ঠিক করেছি। বড় ভাল ছেলে। লেখা-পড়ায় স্বভাব-চরিত্রে খুব ভাল।"

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা বাপের মত জেনেছেন?"

হরি মাষ্টার কহিলেন,—"মা বাপ তার কেউ নাই। ছেলে নিজে। সংসারে তার আর কেহই নাই। নিজের উদ্যোগে নিজের চেষ্টায় বি-এ পড়ছে। আগে বলেছিলো, যতদিন কাজ-কর্ম্ম ভাল রকম না হয়, ততদিন বিবাহ করবে না। এখন সে মত ছেড়েছে। তবে যেন একটু উদ্ধত কি তেজস্বী বলে বোধ হয়।"

বিশ্বেশ্বর বাবু কহিলেন,—"সে মন্দ নয়। তবে 'উদ্ধত' এক, আর 'তেজস্বী' আলাহিদা জিনিস। ছেলেপিলে একটু তেজস্বী হওয়া ভাল। আমি সেটা পছন্দ করি। নেহাৎ পড়ে মার খাওয়া লোক আমি ভালবাসি না।"

হরি মাষ্টার কহিলেন,—"দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আমি তাকে এনে আপনার সহিত আলাপ করিয়ে দেব। আপনি দু-চার দিন বেশ পরীক্ষা করে বুঝে দেখুন।"

কর্ত্তা।—সে উত্তম কথা। ছেলেটির নাম কি?

হরি মাষ্টার।—শশাঙ্ককুমার ঘোষ। বাসাপুরের ঘোষেদের ছেলে। কুলে-শীলে ভাল।

কর্ত্তার হৃদয় আনন্দে গলিয়া গেল। যাহা বহুকাল হইতে অন্তরের নিভৃত কোণে ব্যাকুল প্রাণে তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাহাই যেন হঠাৎ বিধি মিলাইয়া দিলেন। পুত্রহীন ব্যক্তির সুপুত্র লাভ করিলে যেমন আনন্দ হয়, বিশ্বেশ্বর বাবু সেইরূপ আনন্দে বিভোর হইলেন। তিনি কল্পনার চক্ষে সোণার সংসার স্থাপন করিয়া, তন্মধ্যে পুত্রকন্যা সহ পরম সুখে বাসের সৌভাগ্য সেই মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে লাগিলেন।

হরি মাষ্টার প্রস্থান করিলে গৃহিণীকে ডাকিয়া কর্ত্তা সকল কথা কহিলেন। কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়ে সেই পাত্রকে কন্যা দিবার পরামর্শ স্থির করিয়া ফেলিলেন।

(২)

শশাঙ্ক রেবতীকে বিবাহ করিল। বিবাহের যৌতুক বলিয়া সে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিল না। বিশ্বেশ্বর বাবু জামাতার উদার তেজোগর্ব্ব ভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

রেবতীর সহিত শশাঙ্কের বিবাহ হইবার পর বিশ্বেশ্বর বাবু জামাতাকে নিজ গৃহে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। শশাঙ্কের উদ্ধত বা তেজস্বী মেজাজ কিছুতেই শ্বশুরের প্রস্তাবে অবনত হইল না। বিশ্বেশ্বর বাবু অনেক অনুরোধ করিলেন। শশাঙ্কের সেই একই কথা—একই উত্তর—"বাসায় না থাকিলে পড়া-শুনার ক্ষতি হইবে।"

বিশ্বেশ্বর বাবু কত বুঝাইয়া বলিলেন,—"পড়ার ক্ষতি হইবে না; বরং পড়া ভালই হইবে। এখানে নির্জ্জনে পৃথক ঘরে পাঠের সুবিধা হইবে।"

শ্বশুরের কোনও কথাই শশাঙ্ক গ্রাহ্য করিল না। বিশ্বেশ্বর বাবু তাহাতে মনে মনে একটু দুঃখিত হইলেন। শশাঙ্ক তাহাও গ্রাহ্য করিল না। বিশ্বেশ্বর বাবু মনে মনে কহিলেন,—"তেজস্বিতা ভাল, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়!"

বি-এ পরীক্ষার পর শশাঙ্কের হঠাৎ কঠিন পীড়া হইল। শশাঙ্কের যতক্ষণ জ্ঞান ও শক্তি রহিল, ততক্ষণ সে নিজের 'সিট' হইতে নড়িল না।

নিতান্ত অবসন্ন অবস্থায় বিশ্বেশ্বর বাবু তাহাকে বাটিতে লইয়া আসিলেন। চিকিৎসায় ও সুশ্রূষায় শশাঙ্কের পীড়া অল্প দিনেই আরোগ্য হইল। কিন্তু তাহার দুর্ব্বলতা কিছুদিন রহিয়া গেল। শরীর দুর্ব্বল হইল; কিন্তু শশাঙ্কের সে তেজস্বিতা দুর্ব্বল হইল না।

একটু আরোগ্য লাভ করিয়াই শশাঙ্ক পীড়িত শয্যায় উঠিয়া বসিল; কহিল,—"আপনারা আমার জন্য অনেক ভুগিলেন। এখন আমি সারিয়াছি। এখন বাসায় চলিয়া যাই।"

শ্বশুর অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু শশাঙ্ক গোঁ ছাড়িল না। শ্বাশুড়ী-ঠাকরুণ কাছে বসিয়া অনেক কথা কহিলেন। সে দুর্ব্বল রমণী হৃদয়ের কান্না-কথায় কে কাণ দেয়! শশাঙ্কের সেই গোঁ—সেই একই কথা—"এখন আমি ভাল হইয়াছি; এখন বাসায় যাই।"

শ্বাশুড়ী বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"কে জানে বাপু, তোমার মা-বাপের কি যে মাহষে-গোঁ ছিল, কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে!"

শশাঙ্ক কোনও কথা কহিল না। হাসিতে হাসিতে শ্বাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া, যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বাশুড়ী চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বারিপূর্ণ নবীন নীরদ-খণ্ডের ন্যায় রেবতী আসিয়া গভীর বিষণ্ণ বদনে স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার মুখে কথা নাই। তাহার নয়নের কোণে দুই এক ফোঁটা অশ্রু—পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু!

একটু দাঁড়াইয়া রেবতী ধীর গভীর কণ্ঠে কহিল,—"আর কিছু দিন থাকিতে হইবে।"

শশাঙ্ক হাসিয়া কহিল,—"আমাকে থাকিতে হইবে কেন? তোমাকে যাইতে হইবে।"

রেবতী কহিল,—"সে ভাল কথা। বাসা ঠিক কর। আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। এ অবস্থায় তোমার কিছুতেই যাওয়া হইবে না।"

শশাঙ্ক হাসিয়া কহিল,—"না যাইলে বাসা করিবে কে?"

রেবতী আর কথা কহিতে পারিল না। শশাঙ্ক যাইবার জন্য পদচালনা করিল। রেবতী দুইখানি ক্ষুদ্র ব্যাকুল হস্তে শশাঙ্কের দৃঢ়হস্ত ধারণ করিল। মদমত্ত বারণের বেগ সুকোমল তৃণগুচ্ছে ধারণ করিতে পারে কি? শশাঙ্ক, রেবতীর হস্ত হইতে হাসিতে হাসিতে আপনার দৃঢ়হস্ত মোচন করিল। রেবতীর হস্তদ্বয় শশাঙ্ক মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে ধারণ করিল। হাসিতে হাসিতে নীল আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রস্খলনের ন্যায় সে রেবতীর চক্ষু হইতে নিমিষে নিভিয়া গেল! বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হইতে হঠাৎ সূর্য্য খসিয়া পড়িল। সে সূর্য্যের উদয় আর কি ঘটিবে না? রেবতীর মনে হইল, যেন শশাঙ্ক কত কালের জন্য কোথায় চলিয়া গেল।

ভগবান দর্পহারী। বিরাট সম্রাটের প্রবল বলদর্প যিনি হরণ করেন, সামান্য অতি-তুচ্ছ নগণ্য মানবের দর্প তিনিই বিনাশ করিয়া থাকেন। শশাঙ্ক বাসায় যাইয়া শঙ্কটাপন্ন পীড়ায় পড়িল।

বিশ্বেশ্বর বাবু আবার জামাতাকে গৃহে আনিয়া চিকিৎসা-শুশ্রূষায় আরোগ্য করাইলেন। শশাঙ্ক আরোগ্য লাভ করিয়া মহা শঙ্কটে পড়িল। আবার বাসায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব আর শশাঙ্ক হঠাৎ কোন্ মুখে করে? শশাঙ্ক নীরবে এক এক করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায়, শশাঙ্ক চঞ্চল-দেহে চঞ্চল প্রাণে শ্বশুরালয়ে দিনের পর দিন যাপন করিয়া বড় বিরক্তি অনুভব করিল।

বুদ্ধিমান বিশ্বেশ্বর বাবু জামাতার সে মনোভাব সত্বরই বুঝিতে পারিলেন। তিনি জামাতাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন,—"বাপু, একটা কথা তোমায় বলি। সেকালে ছেলেরা শ্বশুরকে কুটুম্ব মনে করিত,—শ্বশুরবাড়ীকে কুটুম্ববাড়ী বলিয়া বিবেচনা করিত। কিন্তু এখন শিক্ষা ও উন্নতির সহিত শিক্ষিত যুবকগণের হৃদয় হইতে সে পূর্ব্বভাব দিন দিন বিদূরিত হইতেছে। এখনকার লেখাপড়া-জানা ছেলেরা আর শ্বশুরকে পর বা কুটুম্ব বলিয়া মনে করে না। তাহারা শ্বশুরকে পিতার ন্যায় মনে করিয়া থাকে। কিন্তু আমি কেবল এক তোমারই মধ্যে সে ভাবটুকু দেখিতে পাই না। তুমি রাগ করিও না। আমি বড়ই মনের দুঃখে আজি কথাটি বলিলাম। দেখ, আমার পুত্র-সন্তান নাই। একটি ছাড়া দ্বিতীয় কন্যা-সন্তানও নাই। এখন তোমরাই আমার পুত্র-কন্যা। তুমি এখনও আমাকে পর বলিয়া মনে কর কি জন্য, তাহা বুঝিতে পারি না।"

শশাঙ্ক প্রফুল্লবদনে কহিল,—"উপযুক্ত হইয়া আমি পিতার গৃহে বসিয়াও খাইতে লজ্জা বোধ করি। আপনি সত্যই পিতার স্বরূপ। আমার কর্ত্তব্য,—এখন উপার্জ্জন করিয়া আপনাদের সেবা করি। কিন্তু—"

বিশ্বেশ্বর বাবু বাধা দিয়া কহিলেন,—"তুমি আমাদের খাইতে লজ্জা বোধ কর, আমরা তোমার উপার্জ্জনের সেবা লইব কেন?"

তেজস্বী শশাঙ্ক যুক্তিযুক্ত উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"এখন তো আমার বসিয়া খাইবার বয়স নয়! এখন কার্য্যের চেষ্টা করাই আমার কর্ত্তব্য।"

বিশ্বেশ্বর বাবু কহিলেন,—"বাসায় না থাকিয়া, এখানে রহিয়া কি কার্য্যের চেষ্টা হয় না? তবে আমাদের শেষ দশায় যদি কোনরূপ ভার-গ্রহণের ইচ্ছা তোমার না থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা।"

শশাঙ্কের দৃঢ় হৃদয়ের দুর্ব্বল বিন্দুতে বড় আঘাত লাগিল। সে তাঁহাদিগের ভার লইতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হইয়া পাশ কাটাইতেছে, এ ভাবটুকু শশাঙ্কের অতি-তেজস্বী প্রাণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। শশাঙ্ক আর আপত্তি করিল না। কেবল কহিল,—"এইখান হইতেই কার্য্যের চেষ্টা করিব। কালি হইতে কার্য্যের চেষ্টায় বাহির হইব।"

বিশ্বেশ্বর বাবু কহিলেন,—"আমার মনে হয়, কার্য্যের চেষ্টা এখন না করিয়া বি-এল দিবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়।"

শশাঙ্ক দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"সে মত আমার আদৌ নাই। আমি অন্তরের সহিত আইন-ব্যবসায়কে অপসন্দ করি। জানিয়া শুনিয়া সত্য চাপিয়া রাখা, বুঝিয়া সুঝিয়া মিথ্যার পোষকতা করা, আমার বড়ই বিসদৃশ বোধ হয়।"

বিশ্বেশ্বর বাবু কহিলেন,—"কেন? তোমার বিবেক-বুদ্ধিতে যেমন বলিবে, মক্কেলের পক্ষে তেমনি পোষকতা করিবে।"

শশাঙ্ক হাসিয়া কহিল,—"ওটা ও উকিলি ফাঁকি কথা। মনকে প্রবোধ দিবার জন্য মনগড়া ফাঁকা আড়ম্বর।"

বিশ্বেশ্বর বাবু কহিলেন,—"তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, কর। এখানে থাকিয়া করিলেই আমাদের বড় আনন্দ হয়।"

শশাঙ্ক "যে আজ্ঞে" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। পার্শ্বের কক্ষে দাঁড়াইয়া রেবতী উদ্‌গ্রীব হইয়া শ্বশুর জামাতার কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। সে শশাঙ্কের মুখে "যে আজ্ঞা" কথা শুনিয়া হৃদয়ের পর্ব্বত-প্রমাণ নিশ্বাস-ভার পরিত্যাগ করিল।

শশাঙ্ক আসিয়া রেবতীর হস্ত ধরিয়া স্বীয় কক্ষে লইয়া গেল।

(৩)

ঘরে বসিয়া কিরূপে স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতে পারে, শশাঙ্ক তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সে আপনাকে আপনি চিনিয়াছিল। শশাঙ্ক বেশ বুঝিয়াছিল, পরের দাসত্ব করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা তাহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। আধুনিক

শিক্ষিতের পক্ষে স্বাধীনভাবে অর্জ্জনের একমাত্র পথ—ওকালতি বা ডাক্তারি। ডাক্তারিতে যে বিদ্যা আবশ্যক, সে বিদ্যা সে শিক্ষা করে নাই! ওকালতির শিক্ষা তাহার আয়ত্তীকৃত। কিন্তু আইন-ব্যবসায় তাহার মতিগতির পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ। এক কৃষি, অপর বাণিজ্য-ব্যবসায় তাহার তেজীয়ান প্রকৃতির অনুকূল। কিন্তু বাণিজ্য-ব্যবসায়ে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা তাহার নাই। সে সম্বন্ধে শ্বশুরের সাহায্য-প্রাপ্তির আশাও নাই। কারণ, বিশ্বেশ্বর বাবুর যে কিছু অর্থ-সম্পত্তি ছিল, তাহা বহুকাল হইতে বসিয়া খাইয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

শশাঙ্ক স্থির করিল, এরূপ অবস্থায় কৃষি তাহার পক্ষে উপযুক্ত অবলম্বনীয় পন্থা। শশাঙ্ক ভাবিতে লাগিল, অল্প অর্থে কোন্ পথ অবলম্বন করিলে, কি কি উপায় প্রয়োগ করিলে, কৃষির উন্নতি সুচারুরূপে সংসাধিত হইতে পারে। সে কৃষি সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠ করিতে লাগিল! সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল।

শশাঙ্ক বুঝিল, কেবল ভাবনা, যুক্তি আর পুস্তক পাঠে কোনও ফল ফলিবে না। হাতে-কলমে কার্য্য করিতে হইবে।

শশাঙ্ক অনেক ভাবিয়া বুঝিয়া লাক্ষা চাষের উপায় ও সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ বাবুর বাটীর পার্শ্বে তাঁহার একটি ছোট উদ্যান ছিল। শশাঙ্ক সেই উদ্যানে কয়টি কুল গাছ

লাগাইয়া, তাহাতে লা-এর বীজাণু আনিয়া স্থাপন করিল। জল-বায়ুর দোষে বা ভাগ্য-বৈগুণ্যে—যে কারণেই হউক, শশাঙ্কের প্রথম পরীক্ষার উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। শশাঙ্ক কর্ম্মবীর, 'ভাগ্য' বলিয়া কোনও কথা সে নিজের জীবন-গ্রন্থ হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছিল। শশাঙ্ক মনে করিল,—অনুকূল অবস্থা পাইলে, তাহার উদ্যানে লা-এর বীজ অবশ্যই সুফল প্রসব করিবে। শশাঙ্ক আবার লা-এর বীজ সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। রেবতীর সুকোমল সাহায্য লইয়া সে হাস্যবদনে আবার ক্ষুদ্র উদ্যান-ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যমের সহিত অবতীর্ণ হইল। বিশ্বেশ্বর বাবু অন্তরালে থাকিয়া সকল দেখিলেন, শুনিলেন ও বুঝিলেন। একদিন হাসিয়া কহিলেন,—"বাপু, এ সকল বৃথা চেষ্টা ছাড়িয়া দাও। ও সকল পথ বাঙ্গালী গৃহস্থের নয়।"

শশাঙ্ক দর্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন? বাঙ্গালী কি মানুষ নয়! তাহার কি হাত-পা নাই?"

বিশ্বেশ্বর বাবু হাসিয়া কহিলেন,—"হাত-পা খুব লম্বা লম্বা আছে। উদরটা তদপেক্ষা আরও বড়। নাই কেবল—মাথা।"

কথাটা শশাঙ্কের প্রাণে লাগিল। সে ভাবিল,—কথাটা প্রকারান্তরে তাহারই প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। শশাঙ্ক দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"না, তাহা নহে। বাঙ্গালীর মাথা খুব বড়। এইরূপ বাধা পাইয়াই সে মাথা ছোট হইয়া গিয়াছে।"

বিশ্বেশ্বর বাবু জামাতার মেজাজ জানিতেন। তিনি আর কথা কহিলেন না। আর কথা কহা উচিতও নয় ভাবিয়া, তিনি নীরবে প্রস্থান করিলেন।

শশাঙ্ক দিবারাত্রি উদ্যানের মধ্যে লা-এর বীজ আর সেই বীজের উন্নতি লইয়া দিনযাপন করিতে লাগিল। রেবতী ভাগ্য-দেবীর ন্যায় সর্ব্বক্ষণ স্বামীর সঙ্গে রহিয়া তাঁহাকে কৃষির আবশ্যকীয় ও উপযুক্ত সাহায্য যথাসাধ্য প্রদান করিতে ব্যস্ত রহিল। স্বামীর ইচ্ছা-ইঙ্গিতে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে রেবতী প্রাতে সন্ধ্যায় বদরী বৃক্ষ-মূলে, ঘর্ম্মাক্ত কপালে, সহাস্য বদনে জল-সেচন করিতে লাগিল। রেবতী মনে ভাবিতে লাগিল,—"তাহার স্বামী সামান্য পৃথিবীর মানুষ নহেন, তিনি স্বর্গের দেবতা। এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি কখনও নরলোকে সম্ভবে না। আর এত বিদ্যা-বুদ্ধির যত্ন-চেষ্টায় নিশ্চয় মাটীর গাছে সোণার ফল ফলিবেই ফলিবে। বাবা সেকেলে মানুষ; সকল বিষয় আর ভাল বুঝ্‌তে পারেন না।"

শশাঙ্ক যাহাই বলুক, যাহাই বুঝুক, অদৃষ্টের 'পড়তা' একটা আছেই আছে। সেই পড়তার বাজীতে এবারেও তাহার পালা বড় মন্দ পড়িল;—এবারেও অতি অল্প দিনেই লা-এর পোকা বিনষ্ট হইয়া গেল! শশাঙ্ক হতাশ হইল না। সে না-ছোড়বন্দা। আবার দ্বিগুণ উদ্যমে লা-এর কৃষি আরম্ভ করিয়া দিল।

বিশ্বেশ্বর বাবু মনে করিলেন,—জামাতার মস্তিষ্ক বিকৃতি

ঘটিয়াছে। তিনি বদন গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—"মিছা পাগ-লামি ছাড়িয়া দাও। যাহাতে যথার্থ ফল ফলে, এমন কাজকর্ম্ম অবলম্বন ক'র।"

শশাঙ্ক অত্যন্ত বিরক্ত হইল। একে কয়বার অকৃতকার্য্য হওয়ায় তাহার মনের ভাব প্রকৃতি-দেবীর উপর বড় বিকৃত হইয়াছিল; তাহার উপর শ্বশুরের এরূপ তীব্র সমালোচনা ও মন্তব্য শুনিয়া শশাঙ্কের তেজীয়ান হৃদয় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে কঠোরকণ্ঠে কহিল,—"বাঙ্গালীর প্রধান দোষ, সে আপনার কাজ আপনি বোঝে না, পরের কাজের সমালোচনা করে।"

শশাঙ্ক উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কথাগুলি এমন কঠোর-ভাবে কহিল যে, বিশ্বেশ্বর বাবুর কোমল প্রাণ তাহাতে অত্যন্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনিও মস্তিষ্ক ঠিক রাখিতে পারিলেন না। তিনি কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—"এখনকার ছেলেগুলা কাজ কিছু করিতে পারুক আর না পারুক, কথা অনেক রকমের শিখিয়া থাকে, কহিয়া থাকে।"

কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা পড়িল। শশাঙ্ক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—"আমার গোড়ায় ভুল হইয়াছে। পরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহার পরিণাম-ফল এইরূপই ফলিয়া থাকে।"

বিশ্বেশ্বর বাবু গম্ভীর বদনে কহিলেন,—"দেখ বাপু, তুমি যে

ভাবে কথা কহিতেছ, ওটা প্রকৃত তেজস্বিতা নয়; ওটা ঔদ্ধত্যের পরিচয়। আমি তোমার হিতৈষী অভিভাবক। আমি তোমায় যে কথা বলি, তাহা তোমার মঙ্গলের জন্যই বলিয়া থাকি। তুমি অন্যায় রাগ করিতেছ কেন?"

শশাঙ্ক কহিল,—"আমি কাহারও কথার তোয়াক্কা রাখি না।"

এই বলিয়া শশাঙ্ক বেগে প্রস্থান করিল। বিশ্বেশ্বর বাবু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শশাঙ্ক নিজ কক্ষে আসিয়া আপনার জিনিষ-পত্র গোছাইতে লাগিল। রেবতী অন্তরালে থাকিয়া, শ্বশুর-জামাতার কথা শুনিতেছিল। সে দ্রুতপদে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল। শশাঙ্কের প্রকৃতি সে জানিত। রেবতী ক্রুদ্ধ স্বামীকে কোনও কথা বলিতে সাহস করিল না।

শশাঙ্ক জিনিষ-পত্র গোছাইয়া রেবতীকে কহিল,—"এখন তুমি কি বলিতে চাও?"

রেবতী কাঁপিতে কাঁপিতে শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—"আমি আর কি বলিব?"

শশাঙ্ক,—"আমার সহিত যাইতে চাও, কি—পিতৃগৃহে থাকিতে চাও?"

রেবতী কহিল,—"আমি কি বলিব? তুমি যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই হইবে! আগে বাসা তো ঠিক করা চাই!"

শশাঙ্ক চীৎকার করিয়া কহিল,—“আমি গাছতলায় [illegible]।”

রেবতী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—“[illegible]ড়ো মানুষ। আর বেশী দিন বাঁচ্‌বেন না। তুমি তাঁকে এখন ছেড়ে যাবে?”

শশাঙ্ক উচ্চকণ্ঠে কহিল,—“আমি কোনও কথা শুন্‌তে চাই না। এক কথায় বল, তুমি যাবে কি না?”

রেবতী সজোরে শশাঙ্কের হাত ধরিল। ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—“বাবা এখন কাঁদ্‌ছেন।”

শশাঙ্ক সবলে রেবতীর হাত ছাড়াইয়া, নিজের খানকয়েক পুস্তক ও দুই এক খানা কাপড় লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

রেবতী ছিন্না-লতার ন্যায় মাটীতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল।

(৪)

কয় বৎসর কাটিয়া গেল। শশাঙ্কের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। বিশ্বেশ্বর বাবু বহু স্থানে বহু অনুসন্ধান করিলেন। কোথাও জামাতার সন্ধান পাইলেন না।

শশাঙ্কের ছিন্ন পাদুকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, রেবতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত কাল কাটাইল। তাহার মুখ ম্লান, শরীর শীর্ণ, হৃদয় ভগ্ন। শরতের পূর্ণশশধরসম যে মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া শশাঙ্কের ন্যায় মদমত্ত বারণ্ মুগ্ধ হইয়া নিগড়বদ্ধ রহিত, সে মুখমণ্ডল আজি প্রভাতের শীর্ণ-শশীর ন্যায় পরিম্লান: রেবতীর সেই বিষাদপূর্ণ আঁধারময় মুখমণ্ডল দেখিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার হৃদয়

ভাঙ্গিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর বাবু মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ছিঃ, কেন এমন কাজ করিলাম ?"

কন্যার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, জননী হতাশ-হৃদয়ে রুগ্নশয্যায় পতিত হইলেন। রেবতী ভাঙ্গা প্রাণ কোনরূপে জোড়া দিবার চেষ্টায় উঠিয়া বসিল ; সংসারের কার্য্যের ভার আপন হাতে গ্রহণ করিল ; ছিন্ন-প্রাণকে দৃঢ়-বন্ধনে বাঁধিয়া বৃদ্ধা রুগ্না জননীর সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

যে সুখের দিন একবার চলিয়া যায়, মানুষের শত চেষ্টায় আর তাহা ফিরিয়া আসে না। বিশ্বেশ্বর বাবু সংসার-চক্রের গতি ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। ভাগ্য-নেমি যেমন উল্টা দিকে চলিয়াছে, তেমনি বিপরীত দিকেই চলিতে লাগিল ; আর ফিরিল না—মানুষের শত চেষ্টায় আর কিছুতেই ঘুরিয়া আসিল না।

বিশ্বেশ্বর বাবুর সংসারের কুদিন, এক একটি করিয়া, অতি ভারাক্রান্ত ভাবে, অতি মন্থর-গতিতে, কাটিতে লাগিল। কিছুদিন পরে দুঃখের গৃহিণী—রেবতীর জননী, বিশ্বেশ্বর বাবুর সংসারকে অপার দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন ; যাইবার সময় পতির পদধূলি লইয়া কহিলেন,—"আর এদেশে থাকিও না। মেয়েটাকে লইয়া পশ্চিম যাইয়া বাস করিও। পশ্চিমে শশাঙ্কের সন্ধান পাইতে পার।"

গৃহিণী পরলোকে প্রস্থান করিলে কিছুদিন পরেই বিশ্বেশ্বর

বাবুর বিপদের উপর আর এক বিপদ ঘটিল। একটা ব্যাঙ্কে তাঁহার গচ্ছিত টাকার কিছু অবশিষ্ট আজিও ছিল। সেই ব্যাঙ্কটা হঠাৎ দেউলিয়া হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বর বাবু বড় বিপদে পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িল। অবশেষে তিনি একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িলেন।

সকল ভার রেবতীর দুর্ব্বল মস্তকে নিপতিত হইল। সংসারের ভার, বৃদ্ধ অন্ধ পিতার ভার, সে শীর্ণদেহে ভগ্ন-প্রাণে বহন করিতে লাগিল। নগদ টাকার হুণ্ডি এক এক করিয়া সকলই ফুরাইল। আর এক কপর্দ্দকও রহিল না। তখন সংসারের জিনিষ-পত্রে হাত পড়িল। গৃহের সকল সামগ্রী বিক্রয় হইয়া গেল। পরে রেবতী সংসারের নিত্য আবশ্যকীয়গুলি রাখিয়া অবশিষ্ট বাসন বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তাহাতে কিছুদিন চলিল। অতঃপর উপায়! রেবতী আত্মহারা হইল। এখন বৃদ্ধ অন্ধ পিতার উপায় কি? ভিক্ষা ভিন্ন আর তো কোনও উপায় নাই। সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা রেবতী কিরূপে ভিক্ষায় বাহির হইবে! রেবতী ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কহিল,—"ভগবান!"

এই বলিয়া সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

দারুণ দুর্ভাবনায় ও অনশন ক্লেশে রেবতীর দেহ অবসন্ন হইয়াছিল, আর মরণ যেন তাহাকে বাহু-প্রসারণে গ্রাস করিতে আসিতেছিল। একদিকে বৃদ্ধ অন্ধ পিতা, অন্য দিকে দেহের

শোচনীয় অবস্থা। কি করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ হইবে, রেবতী ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। বৃদ্ধ পিতার সেবার জন্য ঘৃণ্য ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বনেও রেবতী কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু সামর্থ্যে যখন কুলাইল না, তখন সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। বুঝিল, —তাহার মরণ নিকটবর্ত্তী। ভাবিল,—'বৃদ্ধ অন্ধ পিতার উপায় কি হইবে!' ডাকিল,—'ভগবন্, তুমি রক্ষা কর!' মনে মনে কহিল,—'সংসারে আমার আর কোনও সাধ নাই। এক সাধ ছিল,—পিতার সেবার ব্যবস্থা করা, আর অন্তিমে পতির চরণে মস্তক রক্ষা। ভগবান, আমার জীবনের একটা সাধও কি মিটিবে না!" রেবতী অন্ধ পিতার হস্ত ধারণ করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইল।

সম্ভ্রান্ত-বংশের কন্যা—সে কখনও ঘরের বাহির হয় নাই—মুখ ফুটিয়া কেমন করিয়া ভিক্ষা মাগিবে। সুতরাং যেদিকে দুই চক্ষু চলিল, সেইদিকেই সে একমনে চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে অবসন্ন দেহে তাহারা মাঠের মধ্যে এক বদরী উদ্যানে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল।

(৫)

নাগপুর অঞ্চলে লা-এর কৃষির তখন খুব ধুম পড়িয়াছিল। অনেকে সে কৃষির বলে, অনেকে লা-এর ব্যবসায়ের ফলে, রাতারাতি খুব বড়লোক হইয়া উঠিয়াছিল।

এক ব্যবসায়ী সাহেব আসিয়া সে অঞ্চলে লা-এর এক প্রকাণ্ড

কুঠি স্থাপন করিলেন। এক বাঙ্গালী যুবক তাঁহাকে লওয়াইয়া সেই কারবার খুলিয়াছে। সেই বাঙ্গালী যুবক—শশাঙ্ক। সাহেবের সঙ্গে সে ভাগে কারবার চালাইতেছে। শশাঙ্কের জ্ঞান, পরিশ্রম, উদ্যম ও কার্য্যতৎপরতায় সাহেব বড় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কারবারের সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে দেশে চলিয়া গিয়াছেন। শশাঙ্ক এক একটি করিয়া সে অঞ্চলে বহু স্থানে কারবার-কুঠি স্থাপন করিল।

কৃষি ও ব্যবসায়ের ফলে কৃতী শশাঙ্ক এখন খুব বড়লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থে বড় হইয়াছে বলিয়া, তাহার বাবুগিরি বা বিলাসিতা কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় নাই। এখনও পর্য্যন্ত সে সমান-ভাবে পরিশ্রম করে। কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া সে আবশ্যকীয় সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিয়া থাকে।

রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে শশাঙ্কের আবাস-গৃহ—বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে একখানি ‘বাঙ্গালা’। ‘বাঙ্গালার’ সম্মুখে ও পার্শ্বে নানাবিধ ফলফুলের মনোরম উদ্যান। আরও কিছু দূরে লা-এর পরীক্ষা-উন্নতি পর্য্যবেক্ষণাদির জন্য শশাঙ্ক একটি বদরী উদ্যান স্থাপন করিয়াছে। এখনও আবশ্যক অনুসারে শশাঙ্ক নিজহস্তে বৃক্ষের মূলে সার দেয়, নিজ-তত্ত্বাবধানে জল-সেচনাদি সম্পাদন করাইয়া থাকে।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একাকী সেই উদ্যানে পদচারণা করিতে করিতে শশাঙ্কের পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। সেই অতীত

সুখ-স্মৃতি একখানি বিস্মৃত মুখমণ্ডলের সহিত তাহার প্রাণে আবির্ভূত হইয়া শশাঙ্কের অন্তরাত্মা আলোড়িত করিয়া তুলিল। আজি এই আর্থিক উন্নতি-অভ্যুদয়ের দিনে কোথায় তাহার সেই অন্তরাত্মার আত্মা, হৃদয়ের হৃদয় প্রাণ-প্রতিমা রেবতী কোথায়! কোথায় সেই বৃদ্ধ শ্বশুর!—যিনি পিতার ন্যায় তাহাকে আদর-স্নেহে কিছুকালের জন্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন,—যিনি তাহারই মঙ্গলের জন্য, ভগবানের পাদপদ্মে প্রাণের প্রার্থনা জানাইতেন, তাহারই উন্নতির জন্য সুপরামর্শ প্রদান করিয়া নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় উপেক্ষিত হইতেন; আজি সেই দেবোপম পূজ্য শ্বশুর কোথায়!

শশাঙ্ক কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেয়,—সেই বাস্তুতে সে ভবন আর নাই। সে ভবন ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তথায় আর লোকজন কেহ নাই। সেখানকার কোনও লোক কোনও সংবাদ বলিতে পারে নাই। কেবল একজন বলিয়াছেন,—'রেবতী অন্ধ পিতার হাত ধরিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের তখনকার যে শরীরের অবস্থা, তাহাতে সম্ভবতঃ তাহারা উভয়ে পথেই মারা পড়িয়াছে।'

অটল, অচল হিমাদ্রি প্রকম্পিত হইল! বজ্রের ন্যায় যে দৃঢ়-হৃদয়, সংসারের কোনও ঘটনায়, কোনও বিপদে ভ্রূক্ষেপ করে নাই, শশাঙ্কের সেই কঠোর হৃদয় আজি বিগলিত হইল! শশাঙ্ক

শৈশবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলই হারাইয়াছিল। শশাঙ্ক জ্ঞাতিবর্গের চক্রান্তে বিষয়-সম্পৎ সকলই হারাইয়া বাল্যে পথের ভিখারী হইয়াছিল! শশাঙ্ক তরুণকালে কত পীড়ায়, কত বিপদে কত বার নিপীড়িত হইয়াছিল! কিন্তু তাহার দৃঢ়-হৃদয় কিছুতেই কখনও বিচলিত হয় নাই! আজি সে হৃদয়ের সমগ্র শক্তি চূর্ণীকৃত হইল। শশাঙ্ক অবসন্ন হৃদয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতলে লুটিয়া পড়িল। ভৃত্য প্রভুকে ধরিয়া [illegible]; নিজ উত্তরীয়-অঞ্চলে ব্যজন করিতে লাগিল।

অদূরে একটা গোলমাল শব্দ [illegible] হইল। জনৈক ভৃত্য আসিয়া কহিল,—"হুজুর, একটা মেয়ে লোক বাগিচার কুল খাইতে খাইতে মারা পড়িয়াছে!"

শশাঙ্ক অগত্যা অতিকষ্টে তথায় উপস্থিত হইল। শশাঙ্ক দেখিল—জীর্ণ শীর্ণ ভিক্ষুক পিতার ক্রোড়ে মৃতা কন্যা।

জড়বৎ স্তম্ভিত পিতা তখনও তাহার সেই বিষম বিপদের কথা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। ভিক্ষুক কহিল,—"বাবু, কিছু ভিক্ষা দেন। আমরা চোর নই—ভিখারী!"

কে এ ভিক্ষুক?—কে তাঁহার ক্রোড়ে? শশাঙ্ক নিশ্চল স্তম্ভিত নয়নে দেখিল—পিতার ক্রোড়ে অনশনে মৃতা তাহারই হৃদয়ের হৃদয়—রেবতী!

* * *

সুধীর।

——∞‡ * ‡∞——

(১)

অপরাহ্ণে আপিস হইতে হেমন্তকুমার বাড়ী আসিতেছেন। বাড়ীর সন্নিকটে আসিয়া হেমন্তকুমার স্বীয় শয়নকক্ষের গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন,—বাতায়নের পার্শ্বে দুইটী চিরপরিচিত বড় বড় চক্ষু তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। ভার্য্যা অন্নপূর্ণা প্রতি অপরাহ্ণে স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় ঐ স্থানটীতে দাঁড়াইয়া থাকেন। হেমন্তকুমারকে বাটী প্রবেশ করিতে দেখিয়াই অন্নপূর্ণা ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হইলেন। তাঁহাদের কি সুখের সংসার! স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। ছয় বৎসরের শিশুপুত্র সুধীর, পৈতৃক আমলের বৃদ্ধ ভৃত্য গোবিন্দ ও একজন পরিচারিকা—এই কয় জন লইয়াই তাঁহাদের সংসার।

হেমন্তকুমারের বাস—হাবড়ার অন্তর্গত ব্যাঁটরা গ্রামে। তিনি

বি-এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া কলিকাতায় কোনও গবর্ণমেণ্ট আপিষে এক শত টাকা বেতনে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে ৩৫ বৎসর। অল্প পরিবার বলিয়া সংসার স্বচ্ছলে চলিয়া যাইত। তাঁহাদের ন্যায় সুখের সংসার কয় জনের ছিল? অর্থ হইলেই সুখ হয় না। মনোমত স্ত্রীর অচলা ভক্তি, স্নেহের পুতলি সুধীর এবং বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য গোবিন্দর স্নেহ ও পরিচর্য্যা পাইয়া হেমন্তকুমার আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

হেমন্তকুমারের পৈতৃক বাস ব্যাঁটরা গ্রামেই। তাঁহার পিতা ঐ গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছিলেন। হেমন্তকুমার পিতার একমাত্র পুত্র। সাত বৎসর হইল হেমন্তকুমারের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তখন তাঁহার মাতা জীবিতা ছিলেন। পরে যখন সুধীর ভূমিষ্ঠ হইল, হেমন্তকুমার বলিলেন,—"বাবা আমাদের মায়া ভুলিতে না পারিয়া আবার আসিয়াছেন।" সুধীর ঠাকুরমার বড়ই আদরের ছিল। তিনি সুধীরকে সর্ব্বদা বুকে বুকে রাখিতেন; একদণ্ড চক্ষের আড়াল করিতেন না। এক বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হেমন্তকুমারকে ব্যাঁটরা গ্রামের সকলে ভালবাসিত। বাগান-পুষ্করিণী সমন্বিত তাঁহার বাসভবনটী বৃহৎ না হইলেও বেশ সুন্দর ছিল।

আপিষ হইতে আসিয়া হেমন্তকুমার স্ত্রীর সহিত সুধীরের

লেখা-পড়ার বিষয়ে আজ পরামর্শ করিতেছিলেন। অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"সুধীর স্কুলে যাইলে আমি কেমন করিয়া সমস্ত দিন একলা বাড়ী থাকিব? তুমি আপিষে, সুধীর স্কুলে, আমার মন বড়ই অস্থির হইবে।"

হেমন্তকুমার উত্তর করিলেন,—"পিতা মাতা উভয়েরই কর্ত্তব্য—পুত্রকে লেখা পড়া শিখান। সুতরাং সামান্য মায়ার বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করা কখনও উচিত নহে।"

অবশেষে স্থির হইল,—আগামী কল্য সুধীরকে স্কুলে ভর্ত্তি করা হইবে।

উপরি উক্ত ঘটনার পর প্রায় চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই কয় বৎসর হেমন্তকুমারের সংসার নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাটিয়াছে। সুধীরের বয়স এখন ১০ বৎসর, তাহার লেখা-পড়ায় বেশ মনোযোগ, সে স্থানীয় উচ্চ-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। সুধীর প্রতি বৎসর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। হেমন্তকুমারের আনন্দের সীমা নাই।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না! হঠাৎ দুঃখের ঘোর অন্ধকার আসিয়া হেমন্তকুমারের সংসারকে আচ্ছন্ন করিল।

অন্নপূর্ণার বড় অসুখ। ১৫।১৬ দিন হইতে তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে। প্রথমতঃ সামান্য জ্বর হয়; এক্ষণে বিকারে পরিণত হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীশ বাবু দুই বেলা দেখিয়া যাইতেছেন।

কলিকাতা হইতে সাহেব ডাক্তার আসিয়াছিলেন; তিনি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার আরোগ্য বিষয়ে হতাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। অন্নপূর্ণার পিত্রালয়ে তাঁহার নিকট আত্মীয় কেহ ছিল না। সুতরাং এ বিপদে কোনও আত্মীয়ের সাহায্য না পাইয়া সংসারের কার্য্যের জন্য একজন পাচিকা ও অন্নপূর্ণার পরিচর্য্যার জন্য একটী নূতন পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়াছে। হেমন্তকুমার এক মাসের ছুটি লইয়া নিয়ত স্ত্রীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। কিন্তু বোধ হয় অন্নপূর্ণা এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন না। সন্ধ্যার সময় শ্রীশ বাবু আসিয়া বলিলেন,—"রোগীর অবস্থা বড় খারাপ; আজ রাত্রে কি হয় বলিতে পারি না।" হেমন্তকুমার হতবুদ্ধি হইলেন। প্রতিবেশী কয়েক জন বন্ধু লণ্ঠন হস্তে হেমন্তকুমারের সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কেহ কেহ আবশ্যকীয় জিনিসের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। হেমন্তকুমার স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি ১১টার সময় অন্নপূর্ণা সুধীরকে দেখিতে চাহিলেন। ভাবী বিপদের ছায়ায় সুধীরের মুখ ম্লান। সে আসিয়া মাতার সম্মুখে দাঁড়াইল। মাতা আরও নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলে, সুধীর মাতার বক্ষে মুখ রাখিয়া অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। দর-দর ধারে অন্নপূর্ণার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। হেমন্ত-কুমার কাঁদিয়া আকুল হইলেন। গোবিন্দ কি প্রবোধ দিবে?
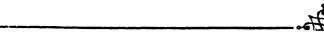
সেও কাঁদিয়া আকুল। রাত্রি ১১৷৷৹ টার সময় স্বামী ও সুধীরকে রাখিয়া অন্নপূর্ণা ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর ৮৷১০ দিন পর্য্যন্ত হেমন্তকুমার বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। সুধীরকে একদণ্ড চক্ষের আড়াল করেন নাই। দারুণ শোকে অভিভূত হইয়া হেমন্তকুমারের বোধ হইয়াছিল, যেন তাঁহার বক্ষের পঞ্জর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

হেমন্তকুমারের এখন সুধীর মাত্র ধ্যান। ক্রমে সুধীরের মুখ চাহিয়া আবার সব করিতে হইল। আপিষের ছুটি শেষ হইল—আবার তাঁহাকে আপিষে যাইতে হইল। সুধীরও পূর্ব্বের ন্যায় স্কুলে যাইতেছিল। হেমন্তকুমার সারাদিন আপিষে বসিয়া ভাবেন,—সুধীর কি করিতেছে। সংসারের দাসদাসী সকলেই সুধীরকে খুব যত্ন করে।

সুধীর স্কুল হইতে আসিয়া জল খাইয়া প্রত্যহ সদর-দরজার নিকট বসিয়া থাকিত। পিতাকে দূর হইতে আসিতে দেখিলে দৌড়িয়া পিতার নিকট যাইয়া পিতার হস্তস্থিত খবরের কাগজ, ছাতি, রুমালে জড়ান খাবার ও ফল-মূল যাহা কিছু থাকিত, পিতার হস্ত হইতে লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিত।

আবার পূর্ব্বের মত সংসার চলিতে লাগিল। হেমন্তকুমারের মনে আবার একটু একটু করিয়া শান্তি আসিতে লাগিল।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। সংসার পরের হস্তে, সুতরাং মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার অসুবিধাও হইতে লাগিল। সেইজন্য দুই এক জন বন্ধুর পরামর্শে হেমন্তকুমার পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী ইন্দুমতী দরিদ্রের কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা কেহই বর্ত্তমান ছিলেন না;— খুল্লতাতের গলগ্রহ হইয়া তাঁহার সংসারে মানুষ হইয়াছিলেন। এক্ষণে খুল্লতাত মাধব সরকার বিনা-পয়সায় ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিবাহের দুই মাস পরেই ইন্দুমতী স্বামীর বাড়ী আসিয়া চাপিয়া বসিলেন। ইন্দুমতীর বয়স ১৪ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। সুতরাং একেবারেই সংসারের গৃহিণী হইলেন। হেমন্তকুমার সুধীরকে পূর্ব্বের ন্যায় আদর ও যত্ন করিতে লাগিলেন, ইন্দুমতীও সুধীরকে বেশ যত্ন করিতেন। সুতরাং সুধীরের এখন কোনও কষ্টই নাই। কিন্তু সুধীর অন্নপূর্ণার স্মৃতি ভুলিতে পারিল না; মধ্যে মধ্যে মায়ের সেই স্নেহমাখা মুখ মনে পড়িত; তখন সুধীরের নয়ন অশ্রুধারায় ভরিয়া যাইত। কিন্তু পাছে কেহ দেখিতে পায়, সেইজন্য সুধীর তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিত। সুধীর বেশ মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করে। পড়াশুনায় মনোযোগ ও নির্ম্মল চরিত্রের জন্য সে সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল।

দুই বৎসর পরে ইন্দুমতীর একটী পুত্রসন্তান হইল। বাড়ীতে সকলেরই আনন্দ, সুধীরও একটী ভাই পাইয়া আনন্দিত হইল।

হেমন্তকুমারের ভাঙ্গা-সংসার আবার জোড়া লাগিল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, সুধীর অনুভব করিতে লাগিল যে, তাহার সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে নিজের প্রতি বিমাতার স্নেহের বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিতে লাগিল। আপিষ হইতে হেমন্তকুমার বাটী আসিলে, সুধীর পূর্ব্বের ন্যায় ছুটিয়া তাঁহার কাছে যাইত; কিন্তু সুধীর দেখিল,—পিতারও যেন মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আপিষ হইতে আসিবার সময় সুধীর তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলে তিনি বলিতেন,—'আপিস থেকে খেটে খুটে আস্‌ছি; এখন বিরক্ত ক'র না।" ক্রীত দ্রব্য-গুলি তিনি সুধীরের হাতে দিতে যেন ভুলিয়া যাইতেন। হেমন্ত-কুমার বাড়ী আসিলেই ইন্দুমতী হাসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, স্বামীর হস্তস্থিত জিনিষগুলি লইতেন; কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিত না দেখিয়া সুধীর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সরিয়া যাইত। যদি কোনও দিন সুধীর পিতার নিকট গিয়া বসিত, পিতা বলিতেন—"বাহিরে গিয়া পড় না, এখানে বসে কি কর্‌ছ?" সুধীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া যাইত।

ক্রমে ক্রমে পাচিকা, পরিচারিকারাও সুধীরকে যেন তাচ্ছল্য করিতে লাগিল। কেবল তাহার গোবিন্দ জেঠার স্নেহের হ্রাস

নাই। সুধীর ইদানীং সদা-সর্ব্বদা গোবিন্দের নিকট থাকিত, বৃদ্ধ গোবিন্দের সুধীরের উপর অপরিসীম স্নেহ। সুধীর গোবিন্দের যত্নে ও আদরে সব কষ্ট ভুলিয়া যাইত। কিন্তু এই সময়ে সুধীরের আর একটী বিপদ হইল। তাহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন বৃদ্ধ গোবিন্দ তাহাকে ফাঁকি দিয়া কয় দিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করিল। সুধীরের দুঃখ কে বুঝিবে? রাত্রে শুইয়া সুধীর গোবিন্দের জন্য কাঁদে! এখন সুধীরের খবর লইবার আর কেহই নাই।

একদিন স্কুলে সুধীরের ভারি জ্বর হইল। মাষ্টারেরা তাহাকে ছুটি দিয়া বাড়ী যাইতে বলিলেন। কিন্তু সুধীর ভাবিল,—বাড়ী গিয়া কি করিব? সে আজকাল যতক্ষণ বাহিরে বাহিরে থাকিত, ভাবিত—বেশ আছি। বাড়ী প্রবেশ করিলেই বোধ হইত—যেন কারাগারে যাইতেছে। যাহা হউক, সুধীর স্কুল হইতে বাড়ী আসিল। বাড়ী আসিয়াই সুধীর শয্যায় শয়ন করিল। বিমাতা তাহার তেমন কোনও খোঁজ লইলেন না।

পিতা আপিস হইতে আসিয়া সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে?"

সুধীর কাতরভাবে উত্তর করিল—"বাবা, ভারি অসুখ করিয়াছে।"

হেমন্তকুমার বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"সাবধানে থাক না কেন? আমাকে জ্বালাতন না করিয়া তো তোমরা নিশ্চিন্ত হইবে না!"

সুধীর বুঝিল, অসুখ করা তাহার বড়ই অপরাধ হইয়াছে। অভিমানে বালিসে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল,—'মা থাকিতে একবার অসুখ হইয়াছিল। তখন পিতা আপিষ হইতে আসিয়া কাপড় না ছাড়িয়া নিজে গিয়া শ্রীশ বাবুকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। বৃদ্ধ গোবিন্দ একবার ডিস্‌পেনসারী হইতে ঔষধ, একবার কদমতলা বাজার হইতে নানাবিধ আবশ্যকীয় জিনিস আনিতে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছিল। বাবা তখন তাহার শয্যাপার্শ্ব হইতে একদণ্ডও নড়েন নাই। আর আজ তাহাকে দেখিবার কেহই নাই!'

পাঁচ ছয় দিন হইয়া গেল। জ্বর কমিল না। কিন্তু ডাক্তারও আসিল না। স্কুলের সেক্রেটারী বিনয়েন্দ্র বাবু একজন সম্পত্তিশালী লোক। তাঁহার বৈঠকখানায় প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় অনেক ভদ্রলোকের সমাবেশ হইত। তন্মধ্যে স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যেও দুই একজন আসিতেন। বিনয়েন্দ্র বাবু ভাল ছেলেদের খোঁজ রাখিতেন; তিনি শুনিলেন যে, সুধীর অসুখ করিয়া ৫।৬ দিন স্কুলে যায় নাই। আরও শুনিলেন,—এতাবৎ সুধীরকে দেখিবার জন্য কোনও ডাক্তার ডাকা হয় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীশ বাবুকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীশ বাবুও একজন

স্কুল-কমিটির মেম্বর। তিনি অবিলম্বে সুধীরকে দেখিতে আসিলেন। শ্রীশ বাবুর মত অমায়িক লোক ও সুচিকিৎসক অতি বিরল। তাহা ব্যতীত তিনি বড় দয়ালু ও সত্যবাদী। তিনি সুধীরকে দেখিতে আসিয়া সুধীরের পিতাকে শ্লেষপূর্ণ দুই একটী বাক্য প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি দেখিলেন, সুধীরের অসুখ সামান্য হইলেও শুশ্রূষার অভাবে কঠিন হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি সুধীরকে আশ্বাস দিয়া ঔষধ দিলেন, নিজে দাঁড়াইয়া দুই বেলা পথ্য দিয়া যাইতেন। সুধীর ক্রমে সারিয়া উঠিল।

(৫)

ইন্দুমতীর খোকার আদরের সীমা নাই। সুধীরও খোকাকে বড় ভালবাসিত, কিছুমাত্র হিংসা করিত না। কিন্তু খোকা যদি দৈবাৎ তাহার কোলে কাঁদিত, সুধীরকে অযথা তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। খোকা ক্রমে বড় হইতে লাগিল। পিতামাতা তাহার নাম রাখিলেন—শরৎকুমার।

সুখে দুঃখে সুধীরের দিন কাটিতে লাগিল। সুধীর মন দিয়া লেখা পড়া করে—ভাল ছেলে বলিয়া সকলেই সুখ্যাতি করেন; সকলেই বলেন,—সুধীর কালে একজন বড়লোক হইবে। কিন্তু সুধীরের ক্ষুদ্র হৃদয়ে অহোরাত্র কি ঝটিকা বহিতেছিল, তাহা কেহই বুঝিত না।

ছয় বৎসর হইল ইন্দুমতীর বিবাহ হইয়াছে। শরৎ এখন

[illegible] ইন্দুমতী প্রায়ই স্বামীকে বলেন,—"সুধীরের তো [illegible] ভাবনা নাই! সকলেই বলে—সুধীর বড় হইয়া উপায় করিতে [illegible]ব। আমি ভাবি, আমার শরতের উপায় কি হইবে? সে যদি লেখা-পড়া শিখিতে না পারে, হয় তো আমাদের অবর্ত্তমানে সুধীর ওকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে।"

হেমন্তকুমার উত্তর করিতেন,—'সুধীর ও শরৎ উভয়েই মানুষ হবে।' ইন্দুমতীর আশঙ্কায় তিনি হাসিতেন।

এই সময় কার্য্য উপলক্ষে মাধব সরকার—কিছুদিনের জন্য হেমন্তকুমারের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর একদিন কথায় কথায় ইন্দুমতী হেমন্তকুমারকে বলিলেন,—"তুমি কেন এই বাড়ীখানা আমার নামে লিখিয়া দেও না! তাহা হইলে শরতের ভবিষ্যতের আর কোনও ভয় থাকিবে না।"

হেমন্তকুমার শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—'সে কি! আমি [illegible] হইতে সুধীরকে কিরূপে বঞ্চিত করিব?'

সেদিন ঐ বিষয়ে আর কোনও কথা হইল না। কিন্তু তাহার পর মধ্যে মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে অনেক কথা হইত। কাহারও পায়ের শব্দ পাইলে উভয়েই চুপ করিতেন। হেমন্তকুমার মধ্যে মধ্যে উকিলের বাড়ীও যাইতে লাগিলেন।

সুধীর দেখিত,—আজ কাল পিতা সদাসর্ব্বদা কি যেন চিন্তা করেন, সর্ব্বদা বিমর্ষ ও অন্যমনস্ক। তাহাকে দেখিলে তিনি যেন

আরও বিমর্ষ হ'ন। যেন কি একটা দারুণ ঝটিকা তাঁহার হৃদয় মধ্যে উঠিয়াছে। তাঁহার মনের সুখ ও শান্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

সুধীর এই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে। ফল এখনও বাহির হয় নাই। স্কুলে যাইতে হয় না। সর্ব্বদা বাড়ীতে থাকিয়া সে পিতার শরীরের ও মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে। কিন্তু সাহস করিয়া সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না।

(৬)

এক দিন বৈকালে সুধীর সদর দরজার পার্শ্বে রোয়াকে বসিয়া আছে; দেখিল—ধীরে ধীরে পিতা আপিষ হইতে ফিরিতেছেন। পিতাকে দেখিয়া সুধীর উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমন্তকুমার "বাবা সুধীর" বলিয়া ডাকিলেন। সুধীর চমকিয়া উঠিল। এমন স্নেহ-পূর্ণ স্বর সে আজ কতদিন শুনে নাই!

হেমন্তকুমার সুধীরের মস্তক নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন; বলিলেন—"বাবা, তুমি এখানে এমন করিয়া বসিয়া কেন? মাঠে খেলা করিতে যাও নাই?"

সুধীর বলিল,—"বাবা, কয়েক দিন হইতে আমার মন বড় খারাপ হইয়াছে, খেলা করিতে ভাল লাগে না।"

পিতার স্নেহ পাইয়া অনেক দিন পরে আজ যেন সুধীরের মনে শান্তি আসিল।

সেই রাত্রেই হেমন্তকুমারের ভারি জ্বর হইল। সুধীর ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিল। দুই তিন দিনের মধ্যেই জ্বর-বিকারে পরিণত হইল। হেমন্তকুমার কেবল প্রলাপ বকেন; বলেন,—"সুধীর, তোমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি!" হেমন্তকুমারের আর জ্ঞান হইল না। সাত দিনের দিন হেমন্তকুমার ষোল বৎসরের পুত্র সুধীর, চারি বৎসরের পুত্র শরৎ ও বিধবা ভার্য্যা ইন্দুমতীকে রাখিয়া, অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

ইন্দুমতী কাঁদিয়া সারা হইলেন। শরৎ কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সুধীরের দুঃখ কে বুঝিবে?

সুধীর বুঝিল,—এই দারুণ বিপদের উপর তাহার স্কন্ধে একটা ঘোরতর দায়িত্ব রহিয়াছে। নিজের পড়া শুনা চালাইতে হইবে; বিমাতার ভরণ-পোষণ যোগাইতে হইবে; কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে মানুষ করিতে হইবে। সুধীর দারুণ চিন্তাস্রোতে ভাসিতে লাগিল।

সুধীর নির্জ্জনে বসিয়া ভাবে,—"আমি কি ছিলাম, কি হইলাম! একে একে ঠাকুর-মা, মা, গোবিন্দ জ্যেঠা, অবশেষে বাবা—সকলেই ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন! বাবার স্নেহপূর্ণ মুখ আর এ জনমে দেখিতে পাইব না। আমি ভগবানের নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, এই বয়সে আমাকে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল!"

(৭)
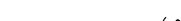
পিতার মৃত্যুর পনের দিন পরে খবর আসিল,-- সুধীর প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সুধীর ভাবিতে লাগিল—"এক্ষণে কি করি। যদি বৃত্তি পাই, তবেই পড়া হইবে। শুধু পড়ার খরচ নয়; মাতা ও ভ্রাতাকে প্রতিপালন করিতে হইবে।"

সে স্থির করিল,—"দুই বেলা 'টুইসন' করিয়া তাঁহাদের খরচ যোগাইবে। আর যদি বৃত্তি না পায়, তাহার বাপের আপিসে চাকরির জন্য দরখাস্ত করিবে।"

ইন্দুমতীর খুল্লতাত মাধব সরকার আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর ব্যবস্থা করিতে বড়ই ব্যস্ত। শ্রাদ্ধের আর তিন চারি দিন মাত্র বাকি আছে।

একদিন মাধব সরকার সুধীরকে ডাকিয়া বলিলেন—"সুধীর! বোধ হয় তুমি জান যে, এই বাটিতে তোমার কোনও স্বত্ব নাই! এই দেখ, এই দান-পত্রে তোমার পিতা এই বাড়ী তোমার বিমাতাকে দিয়া গিয়াছেন।"

এই বলিয়া তিনি সুধীরকে দানপত্র দেখাইলেন।

সুধীর [illegible] প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। সে এত দিনে পিতার [illegible], প্রলাপের অর্থ ও অবশেষে অকাল মৃত্যুর কারণ সমস্তই উপলব্ধি করিল।

সুধীর মনের দারুণ বেদনা চাপিয়া রাখিয়া উত্তর করিল,—"বাবা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমার কি বলিবার আছে? এতদিন বাবার বাড়ীতে ছিলাম, এখন মায়ের বাড়ীতে থাকিব।"

ক্রমে শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল। মাধব সরকার আর কিছুদিন থাকিয়া ইন্দুমতীর বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া ও তাহাদিগের ভবিষ্যৎ চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া তবে যাইবেন। মাধব সরকার একজন ঘোর বিষয়ী লোক। ক্রমাগত পাড়াগাঁয়ে থাকিয়া মামলা-মকদ্দমায় বেশ পারিপক্ক হইয়াছিলেন। গ্রামে কলহ-বিবাদের দালালি করা তাঁহার নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে অন্যতম ছিল। আদালতের অনেকেই তাঁহাকে চিনিতেন। অনেক উকিলের নিকট তাঁহার বেশ প্রতিপত্তিও ছিল। তিনি ইন্দুমতীর বিষয়ের কিরূপ মীমাংসা করিবেন, তাহা স্থির করিবার জন্য দুই এক জন উকিলের সহিত পরামর্শ করিতেও লাগিলেন।

সুধীর আপন ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যস্ত। তাহার আবার যে এক নূতন বিপদ আসিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সে এখন দিনের বেলায় সহপাঠীদের বাটিতে বসিয়া গল্প করে। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয় তাহাদিগের সহিত পরামর্শ করে। বৃত্তির তালিকা কবে বাহির হইবে, তাহার প্রতীক্ষায় থাকে।

(৮)

একদিন সুধীর শুনিল, বৃত্তির তালিকা বাহির হইয়াছে। সে

খাওয়া দাওয়া করিয়া গেজেট দেখিবার জন্য দুই জন সহপাঠীর সহিত কলিকাতায় যাইল। তথায় গেজেটে দেখিল—সে পনের টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। আনন্দে হৃদয় স্ফীত হইল। পিতার কথা মনে পড়িয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। নয়ন-প্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। ভাবিল,—আজ বাবা থাকিলে তাঁর কত আনন্দ হইত।

সুধীর কলিকাতা হইতে আসিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বাড়ী যাইল ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এ সংবাদ জানাইল। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া সুধীরকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা করিয়া মনে মনে ভবিষ্যৎ জীবনের নানাবিধ কল্পনা করিতে লাগিল। পরে অপরাহ্নে হাসি হাসি মুখে গৃহাভিমুখে চলিল। অনেক দিনের পর সুধীরের মুখে হাসি দেখা দিল।

বাড়ীর নিকট আসিয়া সুধীর দেখিল,—একজন মুসলমান একটী দীর্ঘ বংশ-যষ্টি হস্তে করিয়া ঠিক সদর দরজার পার্শ্বে একটী টুলের উপর বসিয়া আছে।

সুধীর দরজার নিকট আসিয়া বাড়ী প্রবেশ করিতে যাইলে সেই মুসলমান বলিল,—"এই মৎ যাও।"

সুধীর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল,—"মৎ যাও, কি বল্‌ছ? তুমি কে?"

তাহাতে সেই মুসলমান গুণ্ডা রোষকষায়িত লোচনে বলিল,—"চুপরাও শালা।"

সুধীর হতবুদ্ধি হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "দাদা মহাশয়" বলিয়া মাধব সরকারকে ডাকিল।

মাধব সরকার ভিতর হইতে আসিয়া বলিলেন,—"রহমন, কেয়া দেখ্‌তা হ্যায়? উস্‌কো গরদান্ পাকড়কে নিকাল দেও।"

রহমন্ সজোরে সুধীরকে এক ধাক্কা দিল। সুধীর ছিট্‌কাইয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে শরৎ ভিতর হইতে দরজার নিকট আসিয়া "দাদাকে মারলে" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। [illegible] ভিতর হইতে আসিয়া শরৎকে ঠাস্ করিয়া চড় মারিয়া হিঁচড়াইয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন।

গোলমাল শুনিয়া পাড়ার অনেক লোক আসিয়া জুটিল। তাঁহাদের মধ্যে হইতে এক জন প্রাচীন প্রতিবেশী মাধব সরকারকে বলিলেন,—"সরকার মহাশয়, এ কি ব্যাপার!"

সরকার মহাশয় উত্তর করিলেন,—"সুধীরের এ বাড়ীতে কোনও স্বত্ব নাই, তাই ওকে বাহির করিয়া দিলাম। ওর [illegible]

ছিল! যদি তাহাই হয়, তবে এ বাটীতে শুধু বাস করিলেই কি সুধীরের স্বত্ব জন্মিবে?"

মাধব সরকার বলিলেন,—"আমি উকিলদের সহিত পরামর্শ করিয়া জানিয়াছি, এখন উহাকে বাহির করিয়া না দিলে পরে গোল হইবে। যাহা হউক, আমাদের বিষয় লইয়া আপনাদের এত মাথা-ব্যথা কেন।"

সকলেই মাধব সরকারকে চিনিতেন। কেহ আর কিছু বলিলেন না।

মাধব সরকার সুধীরের কাপড়-চোপড় ও পুস্তকগুলি আনিয়া দিয়া বলিলেন—"তোমার যা সামগ্রী ছিল, তুমি লইয়া যাও। ইহার পর আর কোনও দাবী-দাওয়া করিতে পারিবে না।"

সুধীরের নাসিকা দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। সে হতবুদ্ধি হইয়া সব শুনিল। কোনও কথাই কহিল না।

প্রতিবেশীদিগের মধ্যে একজন ভদ্রলোক সুধীরের হাত ধরিয়া নিজ বাটিতে লইয়া গেলেন; বলিলেন,—"তুমি একটু সুস্থ হও; পরে তোমাকে বিনয়েন্দ্র বাবুর বাটিতে [illegible]

[illegible] ... তাহাকে [illegible] ...ছেন, যে গৃহে তাহার পিতা-মাতার [illegible]

গোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে, যে গৃহের প্রতি কক্ষ জীবনের অসংখ্য স্মৃতির সহিত জড়িত, যে গৃহ সুধীরের একটী মহাতীর্থস্বরূপ, সুধীর আর সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না! দুঃখে ক্ষোভে সুধীরের হৃদয়-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গেল।

(৯)

সন্ধ্যার পর সুধীরের দুই তিন জন প্রতিবেশী সুধীরকে বিনয়েন্দ্র বাবুর বাটীতে লইয়া গেলেন। বিনয়েন্দ্র বাবু স্কুলের সেক্রেটারী; তাঁহার আজ বড় আনন্দ। তাঁহার স্কুলের ছাত্র সুধীর ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী চা পান করিতে করিতে সুধীরের বৃত্তি পাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। সকলেই সুধীরের প্রশংসা করিতেছেন।

কেহ কেহ বলিতেছেন,—"এই বয়সে সুধীরের মাথার উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে পরীক্ষায় আরও ভাল ফল হইত।"

এমন সময় ক্ষত-বিক্ষত শরীরে সুধীর প্রতিবেশিগণ সহ তথায় উপস্থিত হইল। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সকলেই ব্যাপার শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। সকলেই সুধীরের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হইলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল,—সুধীরের পক্ষে মামলা-মকদ্দমা যুক্তিসঙ্গত নহে। সুধীরও তাহাতে রাজী নয়।

বিনয়েন্দ্র বাবুর একজন কলিকাতার বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন যে, তিনি বহু দিন হইতে তাঁহার পুত্রের জন্য একজন প্রাইভেট টিউটার খুঁজিতেছিলেন। সুধীরকে তিনি কলিকাতায় আপন বাটীতে রাখিতে ইচ্ছুক আছেন। সামান্য দুই এক ঘণ্টা মাত্র তাঁহার পুত্রকে পড়াইতে হইবে। বাকী সময় নিজের পড়া শুনা করিবে। তাঁহার বাটী হইতে নিয়মিত কলেজ যাইতে পারিবে। সুধীরের অন্য কোনও খরচ লাগিবে না; ইহা ব্যতীত সুধীরকে আপাততঃ মাসে মাসে কিছু দিতেও তিনি স্বীকৃত হইলেন।

ইহা অপেক্ষা সুধীরের আর ভাল বন্দোবস্ত হইতে পারে না। বিশেষ এ আশ্রয়ে থাকিলে সুধীরের ভবিষ্যতে উন্নতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সুধীর আগ্রহপূর্ব্বক এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। সেই রাত্রে সুধীর বিনয়েন্দ্র বাবুর বাটী থাকিয়া পরদিন তাঁহার দরওয়ানের সহিত কলিকাতায় বিনয়েন্দ্র বাবুর বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইল এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিল,—"যতদিন না নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের কিনারা করিতে পারে, ব্যাটরা গ্রামে আসিবে না।"

যথাসময়ে কলেজ খুলিল। সুধীর কলেজে ভর্ত্তি হইল এবং মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল।

(১০)

সুধীরকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার পর মাধব সরকার ইন্দুমতীর সংসারের এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যে, তাঁহার অভিভাবক

স্বরূপ সংসারে একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা থাকিবে। সংসার-খরচের জন্য অন্ততঃ মাসিক ৩০৲ টাকার আবশ্যক।

হেমন্তকুমার পৈত্রিক বাটি কিছু বন্ধক করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত পিতা-মাতার শ্রাদ্ধাদিতেও ব্যয় করিয়াছিলেন। সুতরাং নগদ কেবলমাত্র এক হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই টাকায় অতিকষ্টে আড়াই বৎসর চলিতে পারে।

মাধব সরকার বলিলেন,—"এক্ষণে উহাতেই সংসার চলুক; পরে ভবিষ্যতের একটা বন্দোবস্ত করা যাইবে।" তিনি বলিলেন,—"ইন্দুমতি! তুমি তো জান—আমার অবস্থা ভাল নহে। আমি অর্থ দিয়া তোমাকে সাহায্য করিতে পারিব না। তবে যখন আবশ্যক হইবে, সৎপরামর্শ দিয়া উপকার করিব।"

সরকার মহাশয় বাটী ফিরিলেন। ইন্দুমতীর সংসার অতি-কষ্টে চলিতে লাগিল। শরতের পড়াশুনায় বেশ মনোযোগ দেখা যাইতে লাগিল। পাঁচ বৎসর বয়সে সে স্থানীয় বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্তি হইল। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

স্বামিত্যক্ত টাকাগুলি ফুরাইলে সংসার কিরূপে চলিবে, উহা একটা সমস্যার বিষয় হইল। ইন্দুমতী যখন সে কথা ভাবেন, শিহরিয়া উঠেন।

সুধীর কোথায় কি অবস্থায় আছে, ইন্দুমতী তাহার কোনও সংবাদ পান নাই। মধ্যে মধ্যে শরৎ মাকে জিজ্ঞাসা করিত,—"মা,

দাদা কোথায়?" ইন্দুমতী ইহার কোনও উত্তর দিতেন না বা তাহার খবর লইবার জন্য কোনরূপ চেষ্টাও করিতেন না।

যদি দৈবাৎ কলিকাতায় দেশের কাহারও সহিত দেখা হইত, সুধীর আগ্রহপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিত,—"সবাই কেমন পড়া শুনা করিতেছে?" সুধীর শুনিয়াছিল, বিমাতার সংসার একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে এবং তাহার বিশ্বাস ছিল,—মাধব সরকার থাকিতে তাঁহাদের কোনও কষ্ট হইবে না। যেমন করিয়া হউক, তিনি একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

(১১)

হেমন্তকুমারের মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। একদিন প্রাতঃকালে স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিসনার বাবু, হেমন্তকুমারের বাটীতে আসিয়া ডাকিলেন—"বাড়ীতে কে আছেন?" কমিসনার বাবুর হাতে একটী দরখাস্ত রহিয়াছে। দরখাস্তে এইরূপ লেখা আছে,—

"মহামহিম

হাবড়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান মহোদয়

বরাবরেষু।

দরখাস্তকারিণী—শ্রীমতী ইন্দুমতী দাসী। আমার নিবেদন এই যে, আমি হাবড়া মিউনিসিপালিটির ৬নং ওয়ার্ডে—লেনের—নং বাটীর মালিক হইতেছি। পাঁচ বৎসর হইল আমার স্বামীর

মৃত্যু হওয়ায় আমি আমার একমাত্র নাবালক পুত্র লইয়া নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। এতাবৎ ঋণ করিয়া সংসার চালাইয়া আসিতেছি; এক্ষণে আমার সংসার অচল হইয়া উঠিয়াছে। এমতে আমি প্রতি কোয়াটারে ১০৸৴০ টেক্স দিতে নিতান্ত অক্ষম। অতএব প্রার্থনা,—হুজুর কৃপা করিয়া আমাকে ট্যাক্সের দায় হইতে অব্যাহতি দিবার আজ্ঞা হয়। ইতি— শ্রীমতী ইন্দুমতী দাসী।"

কমিশনর বাবুর ডাক শুনিয়া শরৎ ছুটিয়া আসিল।

কমিসনার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার মাতা কি এই দরখাস্ত করিয়াছেন?"

শরৎ উত্তর করিল,—"হাঁ।"

কমিসনার বাবু বলিলেন,—"আমার গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।"

শরৎ বাড়ীর ভিতর যাইয়া খবর দিলে ইন্দুমতী আসিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইলেন এবং শরতের দ্বারা কমিশনার বাবুর নিকট এই মর্ম্মে জবাব দিলেন,—'স্বামী নগদ টাকা যাহা কিছু রাখিয়াছিলেন, তাহা ২॥০ বৎসরের মধ্যে নিঃশেষ হয়। তাহার পর সংসার অচল হইয়া উঠে। তাঁহার খুড়া তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া এই বাটী বন্ধক দেওয়াইয়া ৩০০০৲ টাকা কর্জ্জ করান। উক্ত তিন হাজার টাকার মধ্যে দেড় হাজার টাকা মহাজনের সুদ

দিবার জন্য তাঁহার খুড়ার পরামর্শে তাঁহার মারফৎ কোনও কারবারীর দোকানে খাটাইবার জন্য দেওয়া হয়। বক্রী দেড় হাজার টাকা ভাঙ্গিয়া এতাবৎ সংসার চলিতেছে। উক্ত কারবার নষ্ট হওয়ায় সেই দেড় হাজার টাকা ডুবিয়া গিয়াছে। সুতরাং মহাজনের সুদ মোটেই দেওয়া হয় নাই। বক্রী সংসার খরচের দেড় হাজার টাকা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তাঁহার খুড়া অনেক দিন তাঁহাদের কোনও খবর ল'ন নাই এবং তাঁহার এমন কোনও আত্মীয় নাই যে, অর্থ দিয়া সাহায্য করেন। এক্ষণে যদি টেক্স মাপ করা হয়, তবে আর কিছু দিনের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান থাকে।"

কমিসনার বাবু আবশ্যকীয় বিষয়গু'ল নোট করিয়া লইলেন ও আশ্বাস দিয়া বলিয়া গেলেন,—"আপনার টেক্স মাপ হইবে।"

(১২)

সাত বৎসর হইল ইন্দুমতী বিধবা হইয়াছেন। তাঁহাদের সংসার আর চলে না। ইন্দুমতীর যে সমস্ত অলঙ্কার ছিল, তাহাও খরচের জন্য একে একে বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে কোনও কোনও দিন তাঁহাকে অনশনে কাটাইতে হইয়াছে। কিন্তু এখনও পাগলু শরতের দুই বেলা অন্ন জোগাইয়া আসিতেছেন। তাহাও আর বেশী দিন পারিবেন না। শেষে বোধ

হয় 'অনাথবন্ধুসমিতির' সাহায্য লইতে হইবে! ইন্দুমতী কাতর-ভাবে অনেক বার মাধব সরকারকে খবর দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আসেন নাই।

শরৎ স্কুলে বেশ পড়াশুনা করিতেছে। মাষ্টারেরা বলেন,—"সেও দাদার মত হইবে।"

কিন্তু ইন্দুমতীর ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। মহাজন সুদে আসলে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার ডিক্রী করিয়াছে। বাড়ীও নিলাম হইয়া গিয়াছে। আলিপুরের সম্মানশালী উকীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় উহা খরিদ করিয়াছেন। অতুল বাবুর বাড়ী কালীঘাটে। ইন্দুমতী ভাবিয়া আকুল। অল্পদিনের মধ্যেই বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইবে।

তিনি এখন অনুতপ্ত হৃদয়ে ভাবেন,—"কেন কাকার পরামর্শে স্বামীর নিকট দানপত্র লইয়াছিলাম। যদি তাহা না করিতাম, তাহা হইলে কি সুখের সংসার হইত! সুধীর হয় তো এতদিনে উপায় করিতেছে। কেন কাকার কথা শুনিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছিলাম! হায় হায়, সুধীরের মত এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের সহিত একসঙ্গে থাকিলে আজ আমার এ দুর্দ্দশা কেন হইবে?"

ইন্দুমতীর এতদিনে সন্দেহ হইল—"কাকা বোধ হয় নিজের স্বার্থের জন্য বাড়ী বন্ধক দেওয়াইয়াছিলেন।" কারবারীর দোকান

ফেল হওয়ার কথায় তাঁহার সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। এখন ইন্দুমতী পুত্র লইয়া কাহার দুয়ারে আশ্রয় লইবেন?

ইন্দুমতীর বাটীর পার্শ্বে সম্প্রতি একঘর প্রবীণ ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করিতেছেন। ইন্দুমতী একদিন তাঁহার প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণ-পত্নীর নিকট নিজের দুঃখের কথা কহিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী বলিলেন,—"মা, আমি শুনিয়াছি, কালীঘাটের অতুল বাবু নাকি তোমাদের বাড়ী কিনিয়াছেন। তিনি আমার ভ্রাতার শিষ্য। তাঁহার স্ত্রী বড় দয়ালু। তুমি কেন এক দিন আমার সঙ্গে শরতকে নিয়ে চল-না! আমরা কালী দর্শন করিয়া তাঁহার বাড়ীতে উঠিব। তাঁহার পরিবারের নিকট তোমার সমস্ত দুঃখের কথা বলিলে তাঁহার দয়া হইতে পারে। যদি কোনও উপকার হয়, চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?"

ইন্দুমতী এখন জলমগ্ন ব্যক্তির তৃণ অবলম্বনের দশা প্রাপ্ত। কাজেই সে প্রস্তাবে তিনি রাজী হইলেন।

(১৩)

ইহার দুই তিন দিন পরে প্রতিবেশিনীর সহিত ইন্দুমতী ও শরৎ কালীঘাটে কালী দর্শন করিতে গেলেন। কালী দর্শন করিবার পর তাঁহারা অতুল বাবুর বাড়ীতে উঠিলেন। ইন্দুমতী প্রতিবেশিনী সঙ্গ বরাবর অন্দরে যাইলেন। শরৎ বাহিরের এক ঘরের বারান্দায় বেঞ্চির উপর বসিয়া রহিল।

অতুল বাবুর বাড়ীতে আজ সকলেরই বড় আনন্দ। তাঁহার জামাতা প্রশংসার সহিত এম-এ পাশ করিয়াছেন বলিয়া ভাইস-চ্যানসলার মহাশয়ের নিকট ও গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি হাবড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অদ্য গেজেট হইয়াছে। আগামী পরশ্ব তিনি কার্য্যে যোগদান করিবেন।

মা-ঠাকুরাণী আসিলে অতুল বাবুর স্ত্রী তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইলেন।

ইন্দুমতী অতুল বাবুর স্ত্রীর পা দুইটি ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অতুল বাবুর স্ত্রী তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন,—“আপনারা ভুল শুনিয়াছেন। এ বাড়ী আমরা খরিদ করি নাই। আমার জামাতা খরিদ করিয়াছে। আমার জামাতা বৃত্তির টাকা ও কলেজে অধ্যাপনা করিয়া যে টাকা জমাইয়াছিল, তাহাতে নিজ বাসের জন্য ঐ বাড়ী কিনিয়াছে। টাকা কিছু কম থাকায় আমরা তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ কর্জ দিয়াছি মাত্র। সম্প্রতি সে হাবড়ার হাকিম হইয়াছে। সে ঐ বাড়ীতে আমার কন্যাকে লইয়া গিয়া বাস করিবে, এইরূপ কথা আছে। আমি আগে জানিলে এই বাড়ী কিনিতে দিতাম না। কাহাকেও বাস্তুচ্যুত করিয়া সেই বাড়ীতে বাস করিলে তাহা কি কখনও ভোগ হয়?”

যখন ভিতর বাড়ীতে এইরূপ কথা হইতেছিল, তখন বাহিরের ঘরে অতুল বাবুর জামাতা কতিপয় লোকের

সহিত কথা কহিতেছিলেন। সেই ঘরের বারান্দাতেই শরৎ বসিয়া ছিল। তিনি দেখিলেন,—বারান্দার বেঞ্চের উপর একটি ১১।১২ বৎসরের বালক শুধু পায় উড়ানি গলায় বসিয়া আছে। শরতের বড় বড় চক্ষু দেখিয়া অতুল বাবুর জামাতার মনের মধ্যে কি যেন একটা পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল।

তিনি বালককে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমার নাম কি ?"

শরৎ উত্তর করিল,—"শ্রীশরৎচন্দ্র বসু।"

"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

"বাঁটরা।"

তিনি বালকের নিকট আনুপূর্ব্বি [illegible] য়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর আসিলেন এব [illegible] ড়ী ঠাকুরাণীর নিকট দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন দেখিয়া বলিলেন,—"কৈ, মা কোথায় ?" পরে অর্দ্ধঅবগুণ্ঠনবতী ইন্দুমতীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন।

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ; কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

তখন জামাতা শাশুড়ীকে বলিলেন—"মা, আমি এতদিন আপনাদের বলি নাই যে, যে বাড়ী আমি খরিদ করিয়াছি, উহা আমার পৈত্রিক বাড়ী। আমি হঠাৎ একদিন উহা খবরের কাগজে নিলাম হইবে দেখিয়া নিলামে খরিদ করিয়াছি। আমার পৈত্রিক বাড়ী না হইলে আমি এত তাড়াতাড়ি বাড়ী কিনিতাম

না।" পরে শরৎকে দেখাইয়া বলিলেন—"এই আমার ছোট ভাই শরৎ। আমাকে আগামী পরশ্ব কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। আমি কাল ব্যাঁটরা গিয়া উঠিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু যখন মা আসিয়াছেন, তখন অদ্যই আমি তাঁহার সঙ্গে ব্যাঁটরা যাইব।"

এই বলিয়া সুধীর মাতাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের এমন অবস্থা হইয়াছিল, তাহা তিনি কিছুই শুনেন নাই। হঠাৎ খবরের কাগজে নিলামের ইস্তাহার দেখিয়া তিনি সমস্তই অনুমান করিয়াছিলেন। সেই অবধি বাড়ী যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আপন চাকরী সংক্রান্ত কার্য্যে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, এতদিন অবসর পান নাই। আগামী কল্য যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

দুঃখে আনন্দে লজ্জায় অনুতাপে ইন্দুমতীর মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। শরৎ দাদাকে প্রণাম করিল। সে এতদিনেও দাদাকে ভুলে নাই। আজ আনন্দে তাহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। সুধীর মা-ঠাকুরাণীর পরিচয় পাইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তিনিও সুধীরের চরিত্রে মুগ্ধ। তাহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অতুল বাবুর স্ত্রীর জেদে সেদিন তাঁহারা সকলেই কালীঘাটে থাকিলেন। পর দিন প্রত্যুষে সুধীর সস্ত্রীক, মাতা ও ভ্রাতার সহিত, সাত বৎসর পরে পিতৃগৃহে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

আজ এ মিলনের আনন্দের তুলনা কোথায়!

বাঁশরী।

———৩০‡ * ‡৩০———

(১)

বাঁশরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"তবে চল দিদি-মা, পুরী যাই।"

দিদি-মা কহিলেন,—"সেখানে এখন ক্ষেপাহাতীর ভয় হয়েছে, শুনেছিস্ তো!"

বাঁশরী কহিল,—"তবে এখন উপায়?"

দিদি-মা কহিলেন,—"আমিও ভাব্‌ছি, এখন উপায় কি?"

বাঁশরী অধোবদনে নীরব রহিল। দিদি-মার কথার কোনও উত্তর করিল না। তাহার ক্ষীণ নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল।

দিদি-মা কহিলেন,—"ভাবনাই বা কি? খোরপোষের দাবী দিয়া নালিশ করিব। উমাচরণ মোক্তার বলে,—নালিশ

করিলেই ডিগ্রি হইবে; মাসে মাসে খোরাকির টাকা পাওয়া যাইবে।"

বাঁশরী ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—"প্রাণ থাকিতে তাহা পারিব না।"

দিদি-মা কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—"তবে কি খাইবে?"

বাঁশরী দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"অনাহারে মরিব।"

দিদি-মা।—কেন? দরকার? যে স্বামী ভুলেও স্ত্রীর মুখপানে চায় না, তার খাতিরের দরকার?

বাঁশরী কাঁদিয়া কহিল,—"তাঁহার কোনও দোষ নাই।"

দিদি-মা উচ্চৈঃস্বরে কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন,—"না; দোষ কাহারও নয়; যত দোষ—আমার!"

বাঁশরী ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—"দোষ কাহারও নয়। দোষ—আমার কপালের।"

নাতিনীর সঙ্গে দিদি-মা কাঁদিয়া কহিলেন,—"আমি তোর এই দশা দেখিতে কেন বাঁচিয়া রহিলাম? আমার কি মরণ নাই? পোড়া যম কি আমায় দেখ্‌তে পায় না!"

বাঁশরী গভীরকণ্ঠে কহিল,—"আমায় কার কাছে ফেলে যাবে? আমার কি গতি হবে।"

দিদি-মা কহিলেন,—"রায়েরা বল্‌ছিলো দুটো দুটো রেঁধে দিলে টাকা দেবে, খেতে-পর্‌তে দেবে।"

বাঁশরী আহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিল,—"ছি! দিদি মা, তোমার মুখে এমন কথা!"

দিদি-মা।—"খেতে না পেলে, মানুষে চুরি করে, ছেলের মুখের ভাত কেড়ে খায়।"

বাঁশরী কহিল,—"আমি নিজে একবার যাই! দেখি, তিনি নিজে কি বলেন।"

দিদি-মা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"তোমার এখনও সে আশা আছে! এখনও তোমার অপমানের শেষ হয়-নি!"

বাঁশরী কহিল,—"স্বামীর কাছে স্ত্রীর আবার মান-অপমান কি? আমি তো পরের দুয়ারে যাচ্ছি না!"

দিদি-মা কহিলেন,—"মনে নাই, তোমার শ্বাশুড়ীর কথা? এবারে তোমায় সতীন দিয়ে ঝাঁটা মেরে তাড়াবে।"

'সতীন' শব্দটা রমণী-হৃদয়ের বিষম বিষকণ্টক। সেই বিষ-কণ্টক বাঁশরীর হৃদয়ে নিদারুণরূপে বিদ্ধ হইল। বাঁশরীর মুখে আর কথা সরিল না। সে নীরবে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

দিদি-মা কহিলেন,—"সে সব আশা ছাড়িয়া দাও। চল, দেশ ছেড়ে ভিক্ষা ক'রে খাব।"

এই বলিয়া দিদি-মা কিছুক্ষণ কাঁদিয়া কহিলেন,—"মা বাপের বড় আদরের মেয়ে ছিলে তুমি। তোমার মুখের আধো আধো মিষ্ট কথা শুনে তারা তোমার নাম রেখেছিল—বাঁশরী। নামেও

বাঁশরী, কাজেও ছিলে তুমি বাঁশরী। তোমার রূপগুণে মুগ্ধ হ'য়ে পথের লোকে তোমায় কোলে নিয়ে বেড়াতো। অল্প বয়সে তারা ম'রে গেলো! সকল পুঁজি-পাটা ঘুচিয়ে আমি কত খুঁজে ভাল জামাই এনেছিলাম! তার খুব ফল পেলাম।"

বাঁশরী কহিল,—"তাঁর দোষ কি?"

দিদি-মা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—"তুই আর বকিস্-নে! তার দোষ নয়, কার দোষ? সে তো এখন কচি খোকাটি নয় যে, মা যা বল্‌বে তাই শুন্‌তে হবে!"

বাঁশরী কহিল,—"তিনি যে মার আজ্ঞা ভিন্ন জল খান না। যে এমন মাতৃভক্ত পুণ্যবান, সে স্ত্রীকে ত্যাগ করে? সে স্ত্রীর মহাপাপ—স্ত্রীর কপাল পোড়া!"

"তোর ঐ কথাগুলো শুন্‌লে, আমার প্রাণটা জ্বলে যায়!"

এই বলিয়া ক্রুদ্ধা দিদি-মা উঠিয়া তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন।

বাঁশরী আপন মনে কহিল,—"যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আমি নিজে যাইয়া আর একবার তাঁর পায়ে পড়িব। শ্বাশুড়ীর পায়ে ধরিব। দেখি তাঁরা কি বলেন।"

(২)

দুখে গোয়ালা বাঁশরীর পিতার আমল হইতে তাহাদের বিশেষ অনুগত। দুখে গাড়োয়ান। গরুর গাড়ি চালাইয়া দুখে দিন-

যাপন করে। দুখে মিষ্ট কথায় আকাশের নক্ষত্র পাড়িয়া আনে, তীব্র তাড়নার কথায় লাঠি লইয়া লাফাইয়া উঠে।

বাঁশরী দুখে গাড়োয়ানকে 'দুখে দাদা' বলিয়া ডাকে। বুধবারে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বাঁশরী দুখে গাড়োয়ানকে ডাকিল।

দুখে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিল। কহিল,—"কি বল্‌ছো দিদি ?"

বাঁশরী কহিল,—"আমায় গাড়ী করে নিয়ে চল।"

দুখে নির্ব্বোধ গোয়ালা। অতি স্থূল রহস্য ভাবে কহিল,—"কোথা গো ? যমের বাড়ী ?"

অন্যে বলিলে কথাটা বাঁশরীর প্রাণে বড় বাজিত। দুখেকে বাঁশরী ভাল জানিত। বাঁশরী হাসিয়া কহিল,—"হাঁ দাদা, এবারে শ্বশুর বাড়ী হ'য়ে যমের বাড়ী যাইব।"

দুখে আহ্লাদে আটখানা হইয়া কহিল,—"শ্বশুর বাড়ী যাবে! বেশ কথা! তারা লোক পাঠিয়েছে; গাড়ী পাঠায় নি? তোমাদের কুলীন ঘরের কাজই অম্‌নিধারা। তা চলো।"

বাঁশরী কহিল—"তবে তুমি গাড়ী ঠিক ক'রে নেও।"

দুখে কহিল,—"গাড়ী আমার ঠিকই আছে। তোমার যে শ্বশুরবাড়ী! যমের বাড়ী বল্লেই হয়। হয় তো তাড়িয়ে দেবে এখন। দিন ক্ষণ বেশ ক'রে দেখেছ তো ?"

বাঁশরী মনে মনে কহিল,—"আমার আবার দিন ক্ষণ! আমার

সকল দিন—সকল ক্ষণই সমান।" প্রকাশ্যে কহিল,—"সব দেখেছি। তুমি শীগ্‌গির ঠিক-ঠাক করে নেও। আমি আসি।"

দুখের গাড়ী তৈয়ার হইল। বাঁশরী গাড়ীতে উঠিল। বেলা দুই প্রহরের সময় পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার একটু আগে বাঁশরীর গাড়ী শ্বশুরবাড়ী পৌছিল।

বাঁশরী গাড়ী হইতে নামিল; কম্পিত কলেবরে শুষ্কমুখে সভয়হৃদয়ে বাশরী শ্বশুর-গৃহের খিড়কির দুয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—তাহার চখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁধারময় বোধ হইল।

(৩)

এক প্রতিবেশিনী সেই বাটি হইতে খিড়কির পথে বাহির হইলেন। বাঁশরীকে দেখিয়া কহিলেন,--"কে গা তুমি?"

বাঁশরী কথা কহিতে পারিল না। অতি দীননয়নে প্রতি-বেশিনীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

প্রতিবেশিনী স্থিরদৃষ্টিতে একটু বাঁশরীর মুখপানে চাহিয়া কহিলেন,—"কে, বৌ মা!" পরক্ষণেই ডাকিয়া কহিলেন,— "ওগো রমুর মা, তোমাদের বৌ এয়েছে।"

রমুর মা বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। বাশরীকে দেখিয়া একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন,—"ওঃ! বেটাদের কি লজ্জা নাই! এমন

ছোটলোকেদের সঙ্গেও ভগবান আমার কুটুম্বিতা জুটিয়ে দিয়ে-ছিলেন! হায় রে আমার কপাল! এ পোড়াকপাল হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে দিতে হয়!"

এই বলিয়া ক্রোধোদ্দীপ্তা রমুর মা সজোরে স্বীয় কপালে করাঘাত করিলেন। বাঁশরীর ভীত চকিত প্রাণ থর থর কাঁপিয়া উঠিল। বাঁশরীর অন্তরের কথা অন্তরাত্মার অন্তঃস্থলে নিমজ্জিত হইল। বাঁশরী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিল।

শ্বাশুড়ী সজোরে পদদ্বয় ছাড়াইয়া লইয়া কঠোর কণ্ঠে কহিলেন,—"আচ্ছা বাপু, তোরা কেমন জাতের জাত! তোদের কি এতোতেও লজ্জা হয় না! সে দিন শিয়াল-কুকুরের মত দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলাম, তাতেও মনে একটু ঘৃণা হয়-নি! আবার কোন্ মুখে এলি! বার বার বলে দিয়েছি, আর এ মুখো আসিস্‌নে, তা কিছুতেই শুন্‌বি না! খ্যাঙ্‌ড়া না খেয়ে কিছুতেই ছাড়্‌বি না।"

বাঁশরী বাণবিদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় উত্তেজিতা হইয়া উঠিল। কঠোর-কণ্ঠে কহিল,—"হাঁ এইখানেই মরব। এইখানেই ঝাঁটা খেয়ে মরিব। এই তো আমার মরণের স্থান! এই পুণ্যতীর্থে মরিতেই তো আমি এসেছি!"

"বটেরে বেটী—ছোটলোকের মেয়ে! এত বড় আস্পর্দ্ধা?

আমায় থানা-ফৌজদারীর ভয় দেখাতে এসেছিস্। আয়, তোর আস্পর্দ্ধা ঘুচিয়ে দি!"

এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে যাইয়া গৃহ হইতে সত্যসত্যই একগাছি ঝাঁটা লইয়া আসিলেন।

এমন রমানন্দ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মাতা-পত্নীর সে ভাব-দৃশ্য দেখিয়া রমানন্দ স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

রমুর মা পুত্রের প্রতি গর্জ্জিয়া কহিলেন,—"যদি তুই যথার্থ আমার পেটের সন্তান হ'স, তবে খ্যাংড়া মেরে এই দণ্ডেই ডাইনী বেটিকে এ বাড়ী থেকে দূর করে দে। আর না হয়, আমায় ঝাঁটা মেরে দূর কর!"

রমানন্দ বড় শান্ত শিষ্ট বুদ্ধিমান বিবেচক। রমানন্দ বড় মাতৃভক্ত। সতী সাধ্বী পত্নী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহাও সে বিশেষরূপ অবগত। রমানন্দ ঘোর উভয় সঙ্কটের আবর্ত্তে পড়িল। রমানন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জড়পুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন তাহার জননী অধীরা হইয়া স্বয়ং বধূকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। পাড়ার অনেক স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকেরা ধরাধরি করিয়া রমুর মাতাকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। বাঁশরী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে লুটাইতে লাগিল। কয়জন প্রতিবেশিনীর শুশ্রূষায় তাহার চৈতন্য-সম্পাদন হইল।

সেখানে যে সকল রমণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রমুর মার উপর বড় বিরূপ। রমুর মার কর্কশ ও উদ্ধত ব্যবহারে, বহু প্রতিবেশিনী তাঁহার বিশেষ বিদ্বেষ্টা হইয়াছিলেন। কেবল রমানন্দের সদ্ব্যবহারে, তাহার মুখপানে চাহিয়া, তাঁহারা তাহার জননীর সকল দোষ উপেক্ষা মার্জ্জনা করিতেন। আজি তাঁহাদের অনেকে সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহাকে বেশ কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বাঁশরার হাত ধরিয়া লইয়া নিজ গৃহে আসিলেন। বাঁশরী কিছুতেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিতে চাহে নাই। অনেকের বিশেষ যত্ন, অনুরোধ, অবশেষে সেই বর্ষীয়সী রমণীর হস্তধারণে সে অগত্যা উঠিয়া আসিল।

(৪)

যে বর্ষীয়সী বাঁশরীকে নিজ গৃহে আনিলেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মময়ী বা ব্রহ্ম-ঠাকুরুণ। ব্রহ্ম-ঠাকুরুণ মেয়ে-মহলের মস্তক। তিনি সকলের সকল কথায় থাকেন, সকল কথার মধ্যস্থতা-মীমাংসা করিয়া দেন। উচিত কথা বড় কড়া হইলেও তিনি কাহাকেও বলিতে ছাড়েন না। মুখের উপর তিনি স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দেন। তিনি সকলের সুখে-সম্পদে দুঃখে-বিপদে বুক পাতিয়া দাঁড়ান।

ব্রহ্ম-ঠাকুরুণ বাঁশরীকে গৃহে আনিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। বাঁশরী নীরবে স্তম্ভিতভাবে

উন্মাদিনার ন্যায় শূন্য আকাশের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ব্রহ্মময়ীর হৃদয় বাঁশরীর সে দশা দেখিয়া দ্রবীভূত হইল। ব্রহ্মময়ী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দ্রুতপদে রমানন্দের গৃহে আসিলেন। গর্জ্জিয়া কহিলেন,—"হাঁ গা রমুর মা, এ তোমার কেমন কাজ! এমন সতী সাধ্বী এমন সুন্দরী বৌকে তুমি কোন্ প্রাণে ত্যাগ করলে?"

রমুর মা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"আমার ঘরের কথায় পরের এত মাথা ব্যথা কেন? মেয়ে শুধু সুন্দরী সতী হলে কি হয়; এমন অলক্ষণে বৌ নিয়ে কে সংসার করতে পারে? যার ভোগ, সেই জানে!"

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"কেন? কিসে বৌ অলক্ষণে হ'লো?

রমুর মা কহিলেন,—"কেন, জান না? যেবার ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আন্‌লেম, সেই বারই কর্ত্তা মলেন! তার পর আবার যেমন আন্‌লেম, অমনি গোয়ালের গরু দুটা ধড়ফড় করে মরে গেল। আরও বল্‌তে চাও—বৌ অলক্ষুণে কিসে?"

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"হাঁ হাজার বার বল্‌বো। সে বৌ ত' নয়, রূপে গুণে লক্ষ্মীঠাকরুণ। কর্ত্তা মলেন;—বয়েস হয়েছিলো নব্বার, তাই মলেন। গরু ত' সেবারে অনেকের গোয়াল শূন্য করে মরেছিলো। তা ব'লে বৌকে ত্যাগ করেছ কেন?"

রমুর মা কহিলেন,—"শুধু তাই! এম্‌নি ছোট লোকের গোষ্ঠী যে, একবার তত্ত্ব-তাবাস করে না!"

ব্রহ্মময়ী চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া কহিলেন,—"হাঁ, তাই বল। তত্ত্ব-তাবাস কর্‌তে পারে না, সেইটাই আসল কথা। তা গরীব মানুষ—এক মাতামহী সংসারে। কোনও রকমে অতি কষ্টে মেয়েটিকে পার করেছে। তত্ত্বতাবাস কর্‌বে কোথা থেকে? এ তোমার ভারি অন্যায়। এত অন্যায় সইবে কেন?"

রমুর মা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন,—"দেখ, মিছে শাপ-মন্যি করো না। আমি কারও কোনও তোয়াক্কা রাখি না। আমার কথায় লোকে কথা কইতে আসে কেন?"

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"বটে! তুমি কারও তোয়াক্কা রাখ না! সমাজে বিচার আচার কি নেই? মাথার উপর ভগবান কি এখনও দিন-রাত কর্‌ছেন না? দেখা যাবে!"

এই বলিয়া ব্রহ্মময়ী ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, রমানন্দ বাহির বাটীতে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মময়ী রমানন্দের হস্তধারণ করিলেন, কহিলেন,—"এসো তো বাছা, একবার আমার সঙ্গে!"

রমানন্দ কলের পুতুলের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—বাঁশরী সেই

একই ভাবে—উদ্ভ্রান্তা উন্মাদিনীর ভাবে—একই স্থানে জড়-পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্টা রহিয়াছে।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"রমু, দেখ এই তোমার বিবাহিতা স্ত্রী—সতী সাধ্বী স্ত্রী। এমন স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে তোমার ইহকাল-পরকাল নষ্ট—তোমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই পণ্ড—তোমার মানব-জন্ম বিফল। তুমি স্ত্রীকে ঘরে লইয়া যাও।"

রমানন্দ হতাশ-কণ্ঠে কহিল,—"আমার আর ঘর-সংসার নাই। আমি এখন সন্ন্যাসী। পথের ভিখারী। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইব। পথেই এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

বাঁশরী গভীর কণ্ঠে কহিল,—"আমিও সন্ন্যাসিনী। স্বামীর সহিত আমিও ভিখারিণী। যেখানে পতি, ছায়ার ন্যায় আমিও সেইখানে তাঁহার সঙ্গিনী।"

রমানন্দ কহিল,—"আমার প্রাণ বড় জ্বালাতন হইয়াছে। আর আমি সহ্য করিতে পারি না। আমায় সংসার থেকে পালাতে দাও। যদি তুমি যথার্থ সতী স্ত্রী হও, তবে আমার কথা রাখ—আপন ঘরে ফিরিয়া যাও।"

বাঁশরী আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া রমানন্দের পদযুগল জড়াইয়া ধরিল; কহিল,—"এই পা-দু'খানি আমার ঘর, এই পা-দু'খানি আমার সংসার। এ ঘর সংসার ছেড়ে আমি কোথায় যাইব—কাহার আশ্রয় লইব?"

"ভগবান তোমার আশ্রয়।" এই বলিয়া রমানন্দ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

বাঁশরী মূর্চ্ছিতা হইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। তাহার সংজ্ঞালাভ হইলে দুখে গাড়োয়ান আসিয়া কহিল,—"দিদি ঘরে চল। আমি ভিক্ষে করে এনে তোমায় খাওয়াব। এমন লোকের সংসারে কি মানুষের থাকতে আছে? তুমি ওঠ।"

বাঁশরী অনেকক্ষণ নীরবে পড়িয়া রহিল; অনেকক্ষণ পরে দুখে গাড়োয়ানকে ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল,—"তুমি ঘরে যাও। দিদি-মাকে বলিও, আমি মরিয়াছি।"

দুখে অনেক চেষ্টা করিয়া, অনেক বুঝাইয়া বাঁশরীর মন ফিরাইতে পারিল না। বাঁশরী কোনমতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে স্বীকার করিল না। দুখে বাঁশরীর দিদিমাকে আনিবার জন্য, অগত্যা অতি অনিচ্ছায় বাঁশরীকে রাখিয়া গাড়ি জুড়িল।

(৫)

প্রভাতে জননী দেখিলেন, রমানন্দ গৃহে নাই। রামানন্দ কোথায়? তবে কি সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল? জননী বড় দুর্ভাবনায় পড়িলেন। ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। তবুও রমানন্দ গৃহে আসিল না।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গত হইল। জননীর প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কৈ রমানন্দ? কোথায় রমানন্দ?

জননী অস্থির হইয়া ঘর বাহির করিতে লাগিলেন। কাহারও কাছে মুখ নাই; কাহাকেও কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। যে যন্ত্রণা বুঝিবার লোক নাই—যে ব্যথা শুনিবার কেহ নাই, সে কি ভীষণ যন্ত্রণা—সে কি ভীষণ ব্যথা!

ব্রহ্মময়ী আসিয়া উচ্চকণ্ঠে রমানন্দের গৃহের পার্শ্বে কহিলেন,—"কেমন! ভগবানের রাজ্য! পাপের ফল হাতে হাতে ফলে!"

রমানন্দের জননী আর সহ্য করিতে পারিল না। একে প্রাণে দারুণ বেদনা, তদুপরি লোকের গঞ্জনা। নিদারুণ মনের আবেগে গৃহের বাহির হইলেন। পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় গমন করিয়াছে; সুতরাং তিনিও পুত্রের অন্বেষণে যাত্রা করিলেন। যাহার নিকট যেমন সংবাদ পাইলেন, তদনুসারে তিনি পাগলিনীর ন্যায় দেশে দেশে ঘুরিতে লাগিলেন।

বাঁশরী, ব্রহ্মময়ীর যত্নে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। তবে গাড়োয়ান বাঁশরীর দিদিমাকে ডাকিয়া আনিল। দিদিমা বাঁশরীকে অনেক বুঝাইলেন। বাঁশরী আর গৃহে ফিরিতে কিছুতেই সম্মত হইল না।

দিদিমা কহিলেন,—"আর কি করিবে এখানে?"

বাঁশরী কহিল,—"এইখানে অনাহারে মরিব।"

ব্রহ্মময়ী আসিয়া কহিলেন,—"ও কি! অমন কথা মুখে আনিও না। তুমি সতী-সাধ্বী। তুমি কোন্ দুঃখে আত্মহত্যা করিবে?"

বাঁশরী করুণকণ্ঠে কহিল,—"এ জীবনে ফল কি?"

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—"সতী কখনও পতিহারা হয় না। তুমি হতাশ হইও না।"

ব্রহ্মময়ীর কথাগুলি, দৈববাণীর ন্যায় বাঁশরীর কর্ণে প্রবেশ করিল। বাঁশরী উৎসাহ-ভরে উঠিয়া বসিল; দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"দিদি-মা, তবে চল পুরী যাই! সেইখানে জগন্নাথের পদে প্রাণ সমর্পণ করিব।"

স্বামীর গৃহে আসিবার পূর্ব্বে দিদিমার সহিত বাঁশরীর এইরূপ পরামর্শ হইয়াছিল। যখন কোথাও আশ্রয় মিলিল না, তখন জগবন্ধুর চরণ ভিন্ন আর কোন্ আশ্রয় আছে? যখন সংসারে কোথাও স্থান নাই, তখন অনাথের আশ্রয় জগন্নাথ ভিন্ন কে আর আশ্রয় দিবে?

বাঁশরী এবার যেই পুরী যাইবার কথা তুলিল, অমনি দিদি-মা কহিলেন,—"আমিও তো তাই বল্‌ছি! সেই তো উত্তম পরামর্শ!"

ব্রহ্মময়ী কহিলেন,—হাঁ, তাহাই তো কর্ত্তব্য। দুই এক দিন তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সঙ্গে ঠাকুর-বাড়ী যাইব।"

পুরী-যাত্রার পরামর্শ স্থির হইল। তিন জনেই পুরীধামে যাত্রা করিলেন।

(৬)

পুরীধামে আজি মহা-মহোৎসব—মহা ধুম পড়িয়াছে। আজি জগন্নাথদেবের পদ্ম-মুখ দর্শনের শুভযোগ সংঘটিত হইয়াছে। পুরীধামের সর্ব্বত্র লোকে লোকারণ্য। পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে সর্ব্বত্র লোকের ভয়ঙ্কর ভিড়। শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানের তো কথাই নাই! সেখানে মক্ষিকা প্রবেশের স্থানও তিলমাত্র নাই। যে দিকে যাও—যে দিকে চাও, কেবল লোকের সমুদ্র—লোকের তরঙ্গ।

এ শুভযোগ সর্ব্বদা ঘটে না। পঞ্জিকায় এ পর্ব্বের উল্লেখ থাকে না। কেবল জগন্নাথদেবের ভক্ত সাধু পাণ্ডাগণ সে শুভ-সংবাদ জানিতে পারেন। তাঁহারাই সে সংবাদ সাধারণ্যে প্রচার করিয়া থাকেন।

আজি সেই শুভ-সংবাদ পাইয়া বহু ভক্ত দর্শকের সমাগম হইয়াছে। এই জনতার মধ্যে একটী যুবক, সন্ন্যাসীর বেশে গেরুয়া বসন গেরুয়া উত্তরীয় ধারণ করিয়া, উচ্চ-কণ্ঠে 'হরিধ্বনি' করিয়া বেড়াইতেছে।

পশ্চাৎ হইতে জনৈক বৃদ্ধা রমণী তাহার উত্তরীয় ধারণ করিলেন। যুবক সন্ন্যাসী পশ্চাৎ ফিরিয়া চমকিত হইল; কহিল,—"মা, আবার আমার কাছে? আমি তো চিরবিদায় লইয়া আসিয়াছি।"

বৃদ্ধা কহিলেন,—"তুমি বিদায় লইলে কি হয়? আমি তো তোমায় বিদায় দেই নাই!"

সন্ন্যাসী কাতরকণ্ঠে কহিল,—"আর আমায় মিছা বন্ধনে কেন বন্ধন কর মা! আর আমার সংসারে সুখ কি?"

জননী কহিলেন,—"তোমার সুখ নাই বলিয়া তোমার সংসারে প্রয়োজন নাই! আমি যে দশ মাস দশ দিন তোমায় গর্ভে ধারণ করেছি—এত কষ্টে তোমায় মানুষ করেছি, আমার দুঃখ তুমি দেখ্‌বে না? তোমার মাতৃঋণ তো পরিশোধ হয় নাই। তোমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম তো সকলই পণ্ড হইবে!"

সন্ন্যাসী কহিল,—"মা, আশীর্ব্বাদ কর। মাতৃ-আশীর্ব্বাদে কিছুই পণ্ড হয় না।"

জননী কাঁদিয়া কহিলেন,—"চক্ষের জল লইয়া মুখে কি আশীর্ব্বাদ করিব! এস, নির্জ্জনে আমার দুটো কথা শোন।"

জননী পুত্রকে লইয়া ভিড়ের বাহিরে আসিলেন। একটু দূরে আসিয়া এক ফাঁকা স্থানে উভয়ে উপবেশন করিলেন। জননী ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন,—"চল, ঘরে চল।"

পুত্র আবার কহিলেন,—"আর ঘর কি মা? আমি আর বিবাহ করিব না। আর অন্য পত্নী লইয়া সংসার করিব না।"

জননী কহিলেন,—"আর বিবাহ করিতে তোমায় বলি না। সেই স্ত্রী লইয়াই সংসার কর। মাতৃ-আজ্ঞা পালন কর।"

পুত্র কহিল,—"সে স্ত্রী কোথায় ?"

জননী কহিলেন—"তাহারা এখনও আমাদের গ্রামেই আছে। আমি না বুঝিয়া কি কাজই ক'রেছি! আমার দুর্ভাগ্য। তুমি সুপুত্র। সুপুত্রের কার্য্য কর। ঘরে ফিরিয়া চল। সেই স্ত্রী লইয়া সংসার করিয়া আমায় সুখী কর। আমি সামান্য পাগলার লোভে তোমাকে ত্যাগ করিয়াছি।"

পুত্র কহিল,—"তাহারা আর সেখানে নাই। শুনিয়াছি,—তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

জননী কহিলেন,—"তাহারা যেখানেই যাউক, আমি আবার তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিব।"

(৭)

উভয়ে উৎকর্ণে শুনিলেন—কিছু দূরে ভয়ঙ্কর গোলমাল শব্দ! যে যে দিকে পারিতেছে,—সকলেই উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে, আর বলিতেছে,—'পালারে, হাতী ক্ষেপেছে। পালারে, মেরে ফেল্লরে।"

ক্রমে প্রকাশ পাইল,—নীলগিরির মহারাজ এক প্রকাণ্ড হস্তী লইয়া পুরীধামে আসিয়াছেন। তেমন পর্ব্বত-প্রমাণ প্রকাণ্ড হস্তী কেহ কখনও দেখে নাই। মহারাজ সেই হস্তী দেখিয়া বলিয়াছেন,—"এ হস্তীতে আরোহণ করে, মনুষ্য-লোকে এমন ব্যক্তি কে ? এ হস্তী জগন্নাথের!" জগন্নাথের হস্তী তিনি জগন্নাথকে প্রদান করিয়াছেন। হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া দুইটা মানুষকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

পুত্র জননীর হস্তধারণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা একটু ফাঁকা জায়গায় পড়িয়াছিলেন। সেখান হইতে লোকালয় একটু দূরে।

উভয়ে দ্রুতপদে যাইতে যাইতে তাঁহাদের সম্মুখে কিছু দূরে সেই বিপত্তিটা দেখিতে পাইলেন। প্রকাণ্ড হস্তী প্রকাণ্ড শুঁড়ে একটি মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া মধ্যে মধ্যে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে, মধ্যে মধ্যে ভূমিতে আছাড় মারিতেছে!

তাঁহাদিগকে দেখিয়া, হস্তী শুঁড়ে আবদ্ধ মৃতদেহ ছুড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাদিগের দিকে প্রধাবিত হইল। রমানন্দ জননীকে অগ্রে লইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। কি হইল! আবার একটি প্রাণিহত্যা হইবে! উপায় কি!

হস্তী দৌড়িয়া রমানন্দের নিকট আসিল। তাহাকে শুঁড় দিয়া ধরিবার উপক্রম করিল। রমানন্দ পাশ কাটাইল। হস্তী রমানন্দের জননীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা পাইল। জননী ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রমানন্দ তাঁহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইল। সকলে উচ্চৈঃস্বরে 'হায় কি হইল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সহসা একটা রমণী সাহসভরে হস্তীর সম্মুখে আসিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। এ কি! এ কি উন্মাদিনী! রমণী কহিল,—"হাতি, তুমি ভগবানের হাতী—স্বয়ং জগন্নাথের হাতী তুমি। তোমার
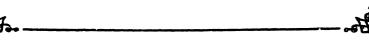
পদতলে পড়িয়া এ দেহ পতন হইলে, পাপীর প্রাণ উদ্ধার লাভ করিবে। আমি মহাপাপী। আমায় তুমি পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া হত্যা কর। দোহাই তোমার—আমায় নেও!”

হস্তী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। শুণ্ড দ্বারা রমণীর মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিল। জনসঙ্ঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল। সকলের মুখে একই কথা,—“কে এ রমণী! রমণী দেবী, কি মানবী!’

ইত্যবসরে মাহুতগণ আসিয়া হস্তীকে দৃঢ়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। হস্তী একবারও নড়িল না—অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

রমানন্দের মাতা সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন,—পুত্রবধূ বাঁশরী—তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের জীবনদাত্রী!

বধূর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া শ্বশ্রূ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—“মা, আমি কি ঘোর অপরাধ করেছি। আমি ঘরের লক্ষ্মী চিনতে না পেরে দূর করেছি। আমার সকল দোষ মার্জ্জনা করে ঘরে চল মা!”

বধূ শ্বশ্রূর পদতলে পতিতা হইলেন।

শীতলের বিবাহ।

(১)

হাওড়ার অন্তর্গত আমতার সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে শীতলের পৈত্রিক বাস। গ্রামটী ক্ষুদ্র হইলেও কতিপয় ভদ্র-লোকের বসতি আছে। গ্রামের মধ্যে একটী পুরাতন দ্বিতল অট্টালিকা শীতলের বাড়ী। শীতল বাল্যকাল হইতেই পিতৃহীন; বৃদ্ধা মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশব, ভ্রাতৃজায়া ও এক ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীর ভিন্ন শীতলদের সংসারে আর কেহ নাই। গ্রামে পড়িবার ভাল স্কুল ছিল না; সুতরাং এক ক্রোশ দূরে আমতায় শীতলকে প্রত্যহ পড়িতে যাইতে হইত। শীতল আমতার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িত। প্রত্যহ প্রাতে আহার করিয়া ট্রেনে চড়িয়া স্কুলে যাইত; কিন্তু বৈকালে স্কুলের ছুটির পর কোনও ট্রেন ছিল না বলিয়া ফিরিবার সময় প্রত্যহ এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া শীতলকে বাড়ী আসিতে হইত।

আমতা হইতে শীতলের গ্রামে আসিতে হইলে একটি মাঠ পার হইয়া আসিতে হয়। মাঠের একধারে বাঁধের উপর দিয়া পথ। শীতল প্রত্যহ একা বাড়ী ফিরিত, অন্য ছেলের সঙ্গে মিশিত না। শীতল ছেলেটী বড় ভাল, বদ ছেলেদের সংস্রবে থাকিত না।

বাড়ী আসিবার সময় শীতল দেখিত,—অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণ মাঠের উপর পড়িয়াছে। কৃষকেরা মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। তাহাদের অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি কর্ণগোচর হইতেছে। গাভীগণের হাম্বা রব দূর হইতে শুনা যাইতেছে। মাঝে মাঝে অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ, তদুপরি পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। মাঠের এক পার্শ্ব দিয়া একটী সরু খাল চলিয়াছে, খালের উপর একখানি শালতি ভাসিতেছে। মাঠের অপর পার্শ্বের গাছগুলি অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। শীতল এই সব দেখিতে দেখিতে প্রত্যহ বাড়ী ফিরিত।

কেহ যেন না মনে করেন যে, শীতল কবি ছিল; কবিতার কণামাত্রও তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই, তাহার প্রাণটা একেবারে কাব্যরসে বঞ্চিত। "কি ক'রে ভাল করিয়া পাশ করিব, আজ কত রাত পর্যান্ত পড়িব, দাদার কাছে কি কি পড়া বলিয়া লইব, পরীক্ষার আর কত দিন বাকি",—এই সব তাহার চিন্তা।

শীতল বড় মাতৃভক্ত ছিল এবং দাদাকেও বেশ সম্মান ও ভক্তি করিত। দাদা কেশবচন্দ্র তাহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ও সুশিক্ষিত ছিলেন। তবে তিনি কোনও কাজকর্ম্ম করিতেন না; গ্রামে থাকিয়া বিষয়াদি দেখিতেন। পৈত্রিক বিষয় যাহা কিঞ্চিৎ ছিল, তাহার আয়ে সংসার এক প্রকার চলিয়া যাইত। মায়ের ও দাদার বড় আশা ছিল—শীতলের উপর। শীতল লেখা পড়া শিখিবে, বড় লোক হইবে, বড় ঘরে বিবাহ করিবে, বংশের সম্মান বৃদ্ধি করিবে। শীতলেরও অহোরাত্র চিন্তা—কিসে মাকে ও দাদাকে সন্তুষ্ট রাখিব, কিসে তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিতে পারিব।

সন্ধ্যার পর শীতল বাড়ী আসিয়া, এক থালা ভাত খাইয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত দাদার কাছে পড়িত, আবার প্রত্যুষে উঠিয়া পাঠ সমাপন করিয়া সকাল সকাল স্নানাহার করিয়া ট্রেণ ধরিত। ছুটির দিন গ্রামে সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোকের সমাবেশ হইত; ছোকরার দল তথায় গল্প করিত, তাস খেলিত, নভেল পড়িত। শীতল কিন্তু কখনও সেখানে যাইত না। অবসর পাইলেই মায়ের নিকট পা ছড়াইয়া বসিয়া কত গল্প করিত—কত কথা বলিত। গ্রামের সকলেই শীতলকে ভালবাসিত; সকলেই বলিত,—এমন নির্ম্মল-চরিত্রের বালক আর দেখা যায় না! কি মাতৃভক্তি!

ভূগোল পড়া থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের আয়তন সম্বন্ধে শীতলের ধারণা বড় গোলমেলে রকমের ছিল। সে বাঙ্গালা দেশটাকে বড় ছোট ভাবিত। শীতলের জ্ঞান ছিল,—কালিকাতা বাঙ্গালার একটী বড় সহর, তাহার নীচেই আমতা; বাঙ্গালার সমাজ বলিলে, কলিকাতা, হাওড়া, আমতা ও তন্নিকটস্থ গ্রামসমূহ বুঝিত। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালাতে কোনও উল্লেখযোগ্য স্থান আছে কি না, শীতল তাহা জানিত না। বর্দ্ধমানে রাজা আছে, মুরশিদাবাদে নবাব আছে; কিন্তু সে সব জায়গা আমতার কাছে লাগে না, আর সেগুলি ঠিক কোথায় অবস্থিত, তাহা সে ধারণা করিতে পারিত না। শীতল ভাবিত,—নবদ্বীপ নারীটের অপর নাম। শুনিয়াছিল,—ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত। কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ী জাঁইপাড়া কি থানাকুল, শীতল ঠিক জানিত না। তবে ঐ দুইটী জায়গার মধ্যে একটী যে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহই ছিল না। শীতল কেবল জানিত,— মা আর দাদা; আর জানিত যে, কোনও কাজ তাঁহাদের আদেশ ব্যতীত করিতে নাই।

(২)

শীতল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এল্-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় রিপন কলেজে ভর্ত্তি হইবে ও জানবাজারে দূর-সম্পর্কীয় মাধব দাদার বাসায় থাকিবে। শীতলের দাদা শীতলকে

মেসে রাখিবেন না স্থির করিয়াছিলেন ; মেসে থাকিলে ছেলে কুসঙ্গে মেশে, ফাজিল হইয়া যায়, সিগারেট খাইতে শিখে ও শেষে হাতছাড়া হইয়া যায়। শীতলের উপর তাঁহাদের বড় আশা-ভরসা ; সুতরাং মাধব দাদা যখন আপন বাসায় শীতলকে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন তাঁহারা শীতলের সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন।

শীতল মায়ের পদধূলি লইয়া পড়িবার জন্য দাদার সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইল।

কলিকাতায় আসিয়া শীতলের যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল ; এ কি ! এ যে অনর্গল মনুষ্যের স্রোত ! পৃথিবীতে যে এত মানুষ থাকিতে পারে, শীতলের তাহা ধারণা ছিল না। এত বড় বড় বাড়ী কি মানুষের তৈয়ারী—না বিশ্বকর্ম্মা তৈয়ার করিয়াছে ! বড় বড় রাস্তা, গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, জাহাজ প্রভৃতি দেখিয়া শীতলের মাথা ঘুরিয়া গেল।

মাধব দাদাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া শীতলকে জান-বাজারে রাখিয়া কেশব বাড়ী ফিরিলেন। দাদা যাইবার পূর্ব্বে শীতল তাহার পদধূলি লইয়া ছল ছল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

শীতলের প্রথম প্রথম রাস্তা হাঁটা একটা বিপদের ব্যাপার বলিয়া বোধ হইত ; দু'পা গেলেই মনে হইত, যেন হারাইয়া গিয়াছে। মাধব দাদা শীতলকে নিজের বাড়ীর নম্বর ও রাস্তার নাম

মুখস্থ করাইয়াছিলেন, নিজে দুই দিন সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কলেজে রাখিয়া আসিয়াছিলেন; কলেজে যাইতে হইলে যে যে রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে, কোথায় এক রাস্তা ছাড়িয়া অন্য রাস্তা ধরিতে হইবে, ঠিক ম্যাপের মত আঁকিয়া তাহার হাতে দিয়াছিলেন। তবুও শীতল দুই তিন দিন হারাইয়া গিয়াছিল।

শীতলের কলিকাতা ভাল লাগিত না; দেশের গাছপালা, পথ, ঘাট, মাঠ, আমতার স্কুল, বাজার, ষ্টেশন, সর্ব্বদাই যেন মনে হইত!

মাধব দাদা শীতলের পাঠে মনোযোগ ও নির্ম্মল চরিত্র দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। প্রত্যহ কলেজ হইতে আসিয়া বৈকালে শীতল দোতালার ছাতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া পড়িত; সন্ধ্যার পূর্ব্বে নীচে আপন নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিত।

একদিন বৈকালে শীতল ছাতে বসিয়া আছে, এমন সময়ে নিকটস্থ একটা পুরাতন বাটীর ছাতের উচ্চ আলিসায় বসিয়া একটী ছোট পাখী গান করিতেছিল। শীতল অনেক দিন পরে পাখীর গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া এক মনে গান শুনিতে লাগিল ও গান শুনিতে শুনিতে বিভোর হইয়া গেল। ক্রমে শীতলের চক্ষুতে জানবাজারের সৌধমালা একটী একটী করিয়া কোথায় মিশিয়া গেল; তৎপরিবর্ত্তে তথায় যেন এক বিস্তৃত প্রান্তর আসিয়া পড়িল।
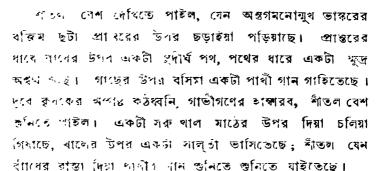
শীতল বেশ দেখিতে পাইল, যেন অস্তগমনোন্মুখ ভাস্করের রক্তিম ছটা প্রান্তরের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রান্তরের মাঝে মাঠের উপর একটী সুদীর্ঘ পথ, পথের ধারে একটী ক্ষুদ্র অশ্বত্থ গাছ। গাছের উপর বসিয়া একটী পাখী গান গাহিতেছে। দূরে কৃষকের অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি, গাভীগণের হাম্বারব, শীতল বেশ শুনিতে পাইল। একটী সরু খাল মাঠের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, খালের উপর একটা সালতী ভাসিতেছে; শীতল যেন বাঁধের রাস্তা দিয়া পাখীর গান শুনিতে শুনিতে যাইতেছে।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, পাখীর গান হঠাৎ থামিয়া গেল, প্রদোষ তিমির আসিয়া ছাতের উপর পড়িল, মাঠ খাল গাছ-পালা কোথায় মিলাইয়া গেল! কৃষকের অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি, গাভীর হাম্বারব আর শুনা যাইতেছে না। তৎপরিবর্ত্তে সহরের কলরব কাণে প্রবেশ করিল, আবার একটী একটী করিয়া সৌধমালা দৃষ্টিগোচর হইল; সারি সারি মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া ঘরের আলো দেখা যাইতে লাগিল।

শীতলের [illegible] না হইল, সে ভাবিল—আজ অনেকক্ষণ ছাতে থাকা হইয়াছে।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, অন্ধকার সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া, নীচের ঘরে আসিয়া শীতল আলো জ্বালিল। দেখা গেল, শীতলের চক্ষে এক বিন্দু জল আসিয়াছে।

(৩)

এই রকমে ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। শীতল নিয়মিতরূপে বাড়ীতে পত্র লেখে; মাঝে মাঝে মাধব দাদাও শীতলের দাদাকে লিখিয়া জানান যে, শীতল বেশ পাড়া-শুনা করিতেছে ও ভাল আছে।

এক দিন বেলা ১১টায় সময় শীতলের দাদা বাহিরের ঘরে গ্রামের সমবয়স্ক দুই চারি জন লোকের সহিত গল্প করিতেছিলেন; এমন সময়ে ডাকপিয়ন একখানা পত্র দিয়া গেল। কেশব পত্র পাইয়া দেখিলেন—শীতলের লেখা। কাল বৈকালে শীতলের চিঠি পাইয়াছেন, আজ আবার প্রাতে তাহার পত্র পাইয়া একটু চিন্তিত হইয়া ব্যগ্রভাবে পত্র খুলিয়া পড়িলেন; পত্র পড়িয়া আনন্দে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল; চক্ষে জল আসিল।

যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, কেশবের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার চিঠি?"

কেশব কহিলেন,—"শীতলের। তা'র মত ভাই পাওয়া অনেক তপস্যার ফল। শুনিবে, শীতল কি লিখিয়াছে?"

এই বলিয়া কেশব পত্র পড়িয়া তাঁহাদিগকে শুনাইলেন।

"শ্রীচরণকমলেষু—

"দাদা, আমার শতকোটি প্রণাম জানিবেন। মাতাঠাকুরাণীকে আমার শতকোটি প্রণাম দিবেন। গত কল্য আপনাকে যে পত্র দিয়াছি, তাহা আপনি আজ পাইয়াছেন; আমি ভাল আছি,

আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। আজ একটি বিষয়ে আপনার অনুমতির জন্য পত্র লিখিতেছি।

"আগামী রবিবার আমার দুইটী সহপাঠী আলিপুরের বাগান দেখিতে যাইবে; তাহারা আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছে। দাদা, আপনার অনুমতি না পাইলে আমি তো যাইতে পারি না! রবিবারে আলিপুরের বাগানে তাহাদের সঙ্গে যাইতে আপনার কি কোনও আপত্তি আছে?

"যে দুইটী ছেলে যাইবে, তাহারা ভাল ছেলে ও সচ্চরিত্র। ক্লাসে আমরা এক জায়গায় বসি। শুনিয়াছি, আলিপুরের বাগানে দেখিবার অনেক জিনিস আছে। আমি আপনাদের আদেশ মত কাহারও সহিত মিশি না। তবে ইহারা ভাল ছেলে বলিয়া ইহাদের সহিত যাইব কি না, লিখিতে সাহসী হইলাম। রবিবারে ৪।৫ ঘণ্টা পড়ার ক্ষতি হইবে বটে; কিন্তু আমি রাত জাগিয়া দুই তিন দিনে উহা পূরণ করিয়া লইব।

"আপনারা কেমন আছেন? মা, সুধীর, বৌ-দিদি কেমন আছেন! মাকে ও বৌ-দিদিকে আমার প্রণাম জানাইবেন। সুধীরকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবেন। আপনার পত্রের উত্তর শনিবারে পাইলে, আমি যাইব কি না স্থির করিব। মাধব দাদার মত আছে। ইতি—

প্রণতঃ—শ্রীশীতলচন্দ্র দত্ত।"

সকলে শুনিয়া বলিলেন, বাস্তবিক কলিকালে শীতলের মত ছেলে দেখা যায় না। কেশব পত্র লইয়া মাকে পড়িয়া শুনাইতে গেলেন। আনন্দে মায়ের চক্ষু দিয়া দর দর অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। যথাসময়ে কেশব পত্রের উত্তর দিলেন,—

"পরম কল্যাণবরেষু—

"শীতল, তুমি আগামী রবিবারে আলিপুরের বাগান দেখিতে যাইও। অনুমতির জন্য আমাকে লেখার বিশেষ আবশ্যক ছিল না। তোমার উপর আমার বেশ বিশ্বাস আছে। তুমি কখনও অন্যায় কাজ করিবে না, তাহা আমি জানি। যদি কোনও বিষয়ে সন্দেহ হয় ও ভাল মন্দ স্থির করিতে না পার, তোমার মাধব দাদাকে জিজ্ঞাসা করিও। তাঁহার মত থাকিলে আর আমাদের কোনও কথা লিখিবার আবশ্যক হইবে না।

"আমরা ভাল আছি ; তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার দাদা।"

(৪)

মাধব বাবুর সহিত রাজেন্দ্র বাবুর আলাপ ছিল। রাজেন বাবু মধ্যে মধ্যে মাধব বাবুর বাটীতে আসিতেন। সেখানে শীতলকে দেখিয়া রাজেন বাবু শীতলের প্রথম পরিচয় পান। রাজেন বাবু যখনই মাধব বাবুর বাটী যাইতেন, শীতলের সহিত

খানিকক্ষণ গল্প সল্প করিতেন ; শীতলও রাজেন বাবুকে ভক্তি ও সম্মান করিত।

এক দিন মাধব বাবু ও রাজেন বাবু ষ্টার থিয়েটারে "চন্দ্রশেখর" দেখিতে যাইবেন। রাজেন বাবু শীতলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শীতল, তুমি কি চন্দ্রশেখর পড়িয়াছ?"

শীতল বলিল,—"এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর ছুটীতে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর পড়িয়াছিলাম।"

রাজেন বাবু মাধব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাল তো শীতলের ছুটি আছে! ও আমাদের সঙ্গে থিয়েটার দেখ্‌তে চলুক না কেন?"

মাধব বাবু বলিলেন,—"কেশবের থিয়েটার দেখা সম্বন্ধে কিরূপ মত, তাহা জানি না। দুই এক বার থিয়েটার দেখা আমি আপত্তিজনক মনে করি না। তবে পড়াশুনার সময় বেশী দেখা ভাল নয়।"

এই বলিয়া মাধব বাবু শীতলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যাইবে?"

শীতল ভাল মন্দ কিছুই বিচার করিতে পারিল না। তবে মাধব দাদার যখন মত আছে, দাদার আপত্তি হইবে না। শীতল যাইতে স্বীকৃত হইল।

থিয়েটার দেখিয়া শীতলের তাক্ লাগিয়া গেল। কি মধুর

গান! কি সুন্দর দৃশ্যাবলী পটে আঁকা রহিয়াছে! স্বর্গের পরীরা কি থিয়েটার করে!

গ্রামে শীতল একবার যাত্রা শুনিয়াছিল; ভাবিয়াছিল,—থিয়েটার বুঝি ঐ রকম একটা কিছু হইবে। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। ইহার পর রাজেন বাবুর সুপারিশে শীতল আরও দুইবার সহপাঠীদের সহিত থিয়েটার শুনিতে গিয়াছিল। রোগা পেটে অত গুরুতর আহার শীতলের সহ্য হইল না; বদ্হজম হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাতে বসিয়া শীতল কখনও ভাবে,—'আমি নগেন্দ্র, আমার সূর্য্যমুখী ভাল—না, কুন্দ ভাল।' কখনও শৈবলিনীকে লইয়া নদীতীরে নৌকা দেখে, আকাশের তারা গণে, কখনও বা অগাধ জলে সাঁতার দেয়; কখনও রোহিণীকে কলসী কক্ষে বারুণী পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে দেখে; কখনও ভ্রমরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। মাধব দাদা আর থিয়েটার দেখিতে বারণ করিয়াছেন। সুতরাং এখন হৃদয়ের উল্লাস ফুটিয়া উঠিলে শীতল সহপাঠী নরেনের নিকট হইতে মাঝে মাঝে নাটক নভেল ও কবিতা পুস্তক আনিয়া লুকাইয়া পড়ে।

এক দিন ভাদ্র মাসে কলেজ হইতে তিনটার সময় শীতল বাড়ী ফিরিতেছিল। প্রখর রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া শীতল পথ হাঁটিতেছে, ক্ষুদ্র ছাতায় রৌদ্র আটকাইতেছে না;

দেখিলে বোধ হইতেছে, শীতল বড় ক্লান্ত হইয়াছে। কিন্তু শীতল মিন্ মিন্ করিয়া কি বলিতে বলিতে যাইতেছে? শুনিবে, শীতল কি বলিতেছিল?

"আজি কে যেন গো নাই
এ প্রভাতে তাই, জীবন বিফল হয় গো।
তাই চারি দিকে চাই, মন কেঁদে গায়
এ নহে, এ নহে, এ নয় গো!"

বাঃ শীতল বেশ! প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আবাল্য দেখিয়াও তোমার প্রাণে কবিতার কণামাত্র প্রবেশ করে নাই? আজ দারুণ রৌদ্রে কলিকাতার ধূলাময় ফুটপাথে তোমার হৃদয়ে কবিতার ফোয়ারা ছুটিয়া উঠিল!

(৫)

রাজেন বাবুর শ্বশুরালয় বহুবাজারে। তাঁহার শ্বশুর মহাশয় ৺রামগোবিন্দ মিত্র, প্রায় এক বৎসর হইল, চারি কন্যা, দুইটী নাবালক পুত্র ও বিধবা পত্নী রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনটী কন্যার বিবাহ হইয়াছে, চতুর্থ মনোরমা—অবিবাহিতা। রাজেন বাবুই শাশুড়ীর একমাত্র আশা-ভরসা। মনোরমার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সুপাত্রের অভাবে বিবাহ হইতেছে না। এখন আর বেশী খরচ করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ ভাল পাত্রে মনোরমাকে দিবার ইচ্ছা। যেখানে পাত্র পছন্দ হয়,

তাহারা পাত্রী পছন্দ করে না, নয়—দেনা পাওনায় বনে না। আবার যাহারা পাত্রী পছন্দ করিয়া অল্প টাকায় রাজী হয়, সে পাত্র মনোরমার মায়ের পছন্দ হয় না! কি করিবেন, রাজেন বাবু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

একদিন সন্ধ্যার সময় রাজেন বাবু মনোরমার বিবাহের বিষয় শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

রাজেন বাবু বলিলেন,—"একটি ভাল পাত্র আছে; কিন্তু সেখানে মনোরমার বিবাহ হওয়া কঠিন। পাত্রটী মাধবের আত্মীয়, অবস্থা মন্দ নয়, মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে, বংশ ভাল, সর্ব্বাপেক্ষা পাত্রটি নির্ম্মল-চরিত্র ও পড়াশুনায় বেশ ভাল। সে মাধবের বাসায় থাকিয়া পড়ে; মাধবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; সে বলে, তা'র দাদার ইচ্ছা—বি-এ পাশ না করিলে তাহার বিবাহ দিবে না। টাকা-কড়ির বেশ খাঁই আছে; চাকুরি-বাকুরি করিয়া দিতে পারে, এমন শ্বশুর খোঁজে।"

রাজেন বাবুর শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ছেলেটি কি পড়ে?"

রাজেন বাবু বলিলেন—"এইবার এল্ এ একজামিন্ দেবে; আর দুই মাস মাত্র বাকী আছে। ছেলেটি রিপন কলেজে পড়ে।"

যখন এই কথা হইতেছিল, তখন সেখানে রাজেন বাবুর এক

দূর-সম্পর্কীয় শ্যালক নরেন উপস্থিত ছিল। নরেনের বাড়ী চাঁপাতলায়। সে মধ্যে মধ্যে রাজেন বাবুদের বাড়ী আসিত।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল,—"ছেলেটির নাম কি?"

রাজেন বাবু বলিলেন,—"শীতলচন্দ্র দত্ত।"

নরেন বলিল,—"ওঃ শীতল! সে যে আমাদের সঙ্গে পড়ে! আমরা এক জায়গায় বসি, আমার সঙ্গে বেশ আলাপ আছে। গত বৎসর আমরা এক সঙ্গে আলিপুরের বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম ও কয়েক বার এক সঙ্গে থিয়েটার দেখি। তা'র ভাব-গতিক দেখিয়া বোধ হয়, তা'র বিবাহ করিবাব বেশ ইচ্ছা আছে। আমি একদিন কলেজেব ছুটির পর তাহাকে এখানে লইয়া আসিব। এই তো তার বাড়ী যাইবার পথ!"

(৬)

শীতলের পরীক্ষার আর কুড়ি দিন বাকী আছে। কেশব আজ ৮।১০ দিন হইল শীতলের কোনও চিঠি পান নাই। তবে ৫।৬ দিন পূর্ব্বে মাধব দাদার পত্র পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—শীতল বেশ ভাল আছে ও বেশ পড়া-শুনা করিতেছে।

সম্প্রতি কেশবেব এক মাতুল-কন্যা তাঁহাদের বাড়ীতে কিছু-দিনের জন্য আসিয়াছেন। তিনি, কেশব ও কেশবের মাতা তিন জনে বসিয়া কথা কহিতেছেন।

মা বলিলেন,—"কেশব, আমার মনটা বড় অস্থির হইয়াছে।

৮।১০ দিন শীতলের পত্র আসে নাই; তুই নয় একবার কলিকাতায় যা।"

কেশব উত্তর করিল,—"মা, আমার কোনও ভাবনা হইতেছে না; পরীক্ষার সময়, শীতল পত্র লিখিতে সময় পায় নাই, তাই লেখে নাই। যখন মাধব দাদার কাছে আছে, তখন চিন্তা কি? আমি তা'র একৃজামিনের ৩৭ দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় যাইব; আর তা'র একৃজামিন হইয়া গেলে এক সঙ্গে বাড়ী আসিব।"

শীতলের মা বলিলেন,—"এই বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতলের বিবাহ দিতে হইবে। আমি ক'বে আছি, কবে নাই!"

কেশব বলিল,—"বি-এ পাশ হইলে বিবাহ দিলেই ভাল হয়। তবে যদি আপনার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, এইবার পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই শীতলের বিবাহ দেওয়া যাইবে।"

মা।—তো'র মামী যে সম্বন্ধ করিয়াছেন, আমার বড় ইচ্ছা—সেইখানে হয়। মেয়ের বাপ সবজজ, কলিকাতায় বাড়ী আছে, মেয়েও ভাল, ৩০০০৲ টাকা দিতে পারে।

কেশব।—মা, আপনি যদি একান্তই শীতলের বে এই বৎসর দেন, তবে তাহাই হইবে; এইবার কলিকাতা হইতে আসিবার সময় আমি মেয়েটিকে দেখিয়া আসিব।

কেশবের মাতুল-কন্যাই এই সম্বন্ধের কথা পিসীমার কাছে উত্থাপন করিয়াছিলেন।

তিনি কেশবকে বলিলেন,—"দাদা, শীতল তো তোমার সঙ্গে থাকিবে, তা'কেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেও না কেন! সেও মেয়ে দেখিয়া আসিবে!"

কেশব বলিলেন,—"শীতল কি কলিকাতার ছেলেদের মত ছেলে যে, সে দাদার সঙ্গে মেয়ে দেখ্‌তে যাবে! সে দাদার উপর কথা বলিতে জানে না।"

মা বলিলেন,—"শীতল আমার কেমন ছেলে, তোরা জানিস্ না; তাই ও কথা বল্‌ছিস্!"

কেশব বাবু বাহিরে আসিলেন; ডাকপিয়ন দুইখানি পত্র দিয়া গেল। কেশব হাতের লেখা দেখিয়া বুঝিলেন,—একটি শীতলের চিঠি, অপরটি মাধব দাদার। কেশব প্রথমে শীতলের চিঠি পড়িবার জন্য তাড়াতাড়ি খামটি ছিঁড়িতে লাগিলেন।

কেশব, একটু স্থির হও, অত ব্যস্ত হইও না; বরং ও চিঠি না পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেল!

কেশব শীতলের চিঠি পড়িতে লাগিলেন; দুই এক ছত্র পড়িয়াই মুখ গম্ভীর হইল। শীতল লিখিয়াছে—

"শ্রীচরণেষু,—

"দাদা আজ ৮।১০ দিন হইল সময়াভাবে আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আশা করি, আপনারা ভাল আছেন।

"আমি আমার এক সহপাঠীর আত্মীয়ার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। আমার স্থির বিশ্বাস, আপনি ও মাতাঠাকুরাণী আমার এই সৎসঙ্কল্প অনুমোদন করিবেন।

"বিবাহের অন্য দিন না থাকায় রবিবারে অর্থাৎ আগামী কল্য বিবাহ হইবে; অবশ্য এ বিষয়ে পূর্ব্বে আপনাদের অনুমতি লওয়া উচিত ছিল; কিন্তু গত কল্য মাত্র বিবাহের দিন স্থির হওয়ায় আজ পত্রের দ্বারা আপনাদের সম্মতি চাহিতেছি। আমার একান্ত প্রার্থনা,—আপনি আমার বিবাহে আসিয়া উপস্থিত হন। কাল ১১টায় আমার চিঠি পাইবেন, ১২টার ট্রেণে ৪টার মধ্যেই কলিকাতায় পৌছিবেন; রাত্রি ১০টার সময় বিবাহ, ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে পৌঁছিবেন। আপনি না আসিলে আমি বিশেষ দুঃখিত হইব।

"আমার মিনতি,—আপনি এ বিষয়ে অমত না করেন। আমার প্রণাম জানিবেন ও মাতাঠাকুরাণীকে ও বৌদিদিকে জানাইবেন। ইতি—

প্রণতঃ—শ্রীশীতলচন্দ্র দত্ত।

"পুনশ্চ,—মাধব দাদার বাটী হইতে এই বিবাহ হওয়ায় তাঁহার আপত্তি থাকায় আমার সহপাঠী শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী হইতেই বিবাহ হইবে। তাহার ঠিকানা,—নং চাঁপাতলা। আপনি বরাবর সেইখানেই আসিবেন।"

কেশব বাবু চিঠি পড়িয়া অবাক হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এ কি প্রকৃতই শীতলের চিঠি?—না, কেহ উপহাস করিতেছে! কিন্তু সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই;—এ যে স্পষ্ট শীতলের লেখা।

কেশব খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পরে মাধব দাদার চিঠি খুলিয়া পড়িলেন।

তিনি এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন—"আমি ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতাম না। শীতল যেরূপ অগ্রসর, আমি কি করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না! তুমি পত্র পাঠ আসিও; উপস্থিতে পরামর্শ করা যাইবে।"

কেশব মাতার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"মা আমাকে এখনই কলিকাতা রওনা হইতে হইবে। মাধব দাদার পুত্রের বড় অসুখ। আর সময় নাই, এখনই ট্রেণ ধরিতে হইবে।"

মা মাধবের বিপদে কাতর হইয়া কেশবের যাইবার উদ্যোগ করিয়া দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে কেশব ট্রেণে চড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিলেন।

বেলা ৩টার সময় ট্রেণ হাওড়ায় পৌঁছিল। হাওড়ার উকিল রামমোহন বাবুর সহিত কেশবের পরিচয় ছিল। কেশব বরাবর তাঁহার বাসায় গিয়া উঠিলেন।

রামমোহন বাবু প্রাচীন উকিল; শ্যামবর্ণ দোহারা চোহারা।

কেশব তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘রামমোহন বাবু, এখন বিবাহ বন্ধ করিবার কোনও উপায় আছে কি!’

রামমোহন বাবু তৎক্ষণাৎ এক দীর্ঘ দরখাস্ত লিখিয়া বলিলেন,—“একটি গাড়ী আন, আমি তোমাকে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে লইয়া গিয়া তোমায় এজাহার করাইয়া ওয়ারেণ্ট দ্বারা শীতলকে ধরিয়া আনাইব।”

কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সত্যই কি এমন আইন আছে?”

রামমোহন বাবু বলিলেন,—“কি বলিলে?—কি বলিলে—আইন নাই? কার্য্যবিধি আইনের ৫৫২ ধারা দেখিবে?”

এই বলিয়া রামমোহন তখনই এক জীর্ণ কেতাব খুলিয়া ৫৫২ ধারা কেশবকে পড়িয়া শুনাইলেন।

কেশব শুনিয়া বলিলেন,—“উহাতে Woman আর female child এর কথা লেখা রহিয়াছে নয়?”

রামমোহন বাবু তখন থতমত খাইয়া বলিলেন,—“তাও তো বটে! শীতল যে বেটাছেলে! তবে তো এ আইন খাটিল না!”

কেশব তখন কাতরভাবে রামমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আর অন্য উপায় কি কিছুই নাই?”

রামমোহন বাবু বলিলেন,—“শীতল কি সাবালক হইয়াছে?”

কেশব উত্তর করিলেন,—“গত বৈশাখ মাসে শীতল ১৮ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ১৯ বৎসরে পড়িয়াছে।”

রামমোহন বাবু বলিলেন,—"তবে তো Kidnapping হইবে না; আচ্ছা আজ তুমি যাও, আমি পরশু নাগাইদ আর্জ্জী লিখিয়া মুনসেফ কোর্ট হইতে Injunction বাহির করিয়া দিব; তাহা হইলে আর বিবাহ হইতে পারিবে না।"

কেশব বলিলেন,—"বিবাহ আজ রাত্রে, পরশু হুকুম হইলে কি হইল!"

রামমোহন বাবু বলিলেন,—"তবে তো ভারি মুস্কিল দেখিতেছি! ও সব আইন-কানুনে কিছু হবে না; তুমি এক কাজ কর; এখনই কলিকাতার বড়বাজার থেকে জন আষ্টেক গুণ্ডা লইয়া যাও, আর বেটাদের বাড়ী থেকে লাঠির চোটে শীতলকে কেড়ে নিয়ে এস।"

কেশব বুঝিলেন, কোনও উপায়ই নাই।

অপরাহ্ণ ৬টার সময় কেশব জানবাজারে পৌঁছিলেন। দেখিলেন,—বাহিরের ঘরে মাধব দাদা ও রাজেন বাবু বসিয়া আছেন।

কেশবের মুখের ভাব দেখিয়া মাধব দাদা ভীত হইলেন; বলিলেন—"কেশব, তুমি বোধ হয় আমার উপর দোষারোপ করিতেছ! কিন্তু আমি ইহার বিন্দুবিসর্গ পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতাম না। কাল যখন প্রথম শুনি, আমি বলিলাম—'শীতল, আমি তোমাকে কখনই এ কাজ করিতে দিব না; তোমাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিব।' সে উত্তর করিল,—'আমি আত্মহত্যা করিব।'

তখন আমি বুঝিলাম যে, এখন ফিরান দুষ্কর। সেই জন্য তোমাকে টেলিগ্রাম না করিয়া পত্র লিখিলাম; কারণ, তুমি আসিয়া যে কোনও প্রতিকার করিতে পারিবে, এমন বিশ্বাস আমার ছিল না ও এখনও নাই। বোধ হয় তুমি জান যে, আমার মত না থাকায় আমার বাড়ী হইতে এ বিবাহ হইতেছে না। যাহা হউক, বিশেষ দুঃখিত হইবার কারণ নাই। কেন-না, সদ্বংশে বিবাহ হইতেছে, কুটুম্ব ভাল হইবে; মেয়েটি, যতদূর শুনিয়াছি, লক্ষ্মীমন্ত। রাজেনের ছোট শালীর সঙ্গে বিবাহ হইতেছে। রাজেন বড় লজ্জিত ও চিন্তিত। পাছে তুমি ভাব যে, এও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে! কিন্তু বাস্তবিকই রাজেনের কোনও দোষ নাই। রাজেনের শাশুড়ী ঠাকুরাণীও চিন্তিত। তিনি বলেন,—'আমার মেয়েকে তাহার শাশুড়ী হয় তো স্থান দেবেন না।' শীতলের একজন সহপাঠী নরেন কি করে শীতলকে ক্ষেপিয়েছে, বুঝিতে পারিলাম না। কন্যাপক্ষে রাজেন মুরব্বি; কিন্তু রাজেন আমার কাছে বলিতে আসিয়াছে যে, সে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইবে না।"

কেশব সব শুনিলেন। কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন,—"দাদা, এত দিনে আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। এত দিনে বুঝিলাম—আমি শীতলের কেহ নই। আমি তাহার উপর অনেক আশা করিয়াছিলাম; সে যে আমাদের এমন করিয়া উপেক্ষা করিবে, তাহা কখনও ভাবি নাই।"

মাধব দাদা বলিলেন,—"কেশব, আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে, বিবাহে উপস্থিত হইব না। কিন্তু অনেক ভাবিয়া দেখিলাম,—আমাদের উভয়েরই যাওয়া উচিত। শীতল পড়াশুনায় অমনোযোগী নহে; আমার বেশ বিশ্বাস আছে যে, সে এ বৎসর পাশ করিবে। হঠাৎ মনের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া বিবাহ করিতেছে। এ সময়ে যদি আমরা তাহাকে ত্যাগ করি, তাহা হইলে সে হতাশ হইয়া পড়িবে। রাজেনকেও বলিতেছি,—রাজেন, তুমিও চল। তুমি কন্যাপক্ষের সর্দ্দার। কেশব, তুমি একটু জল খাও; তার পর চল সকলে একত্রে বিবাহ-স্থানে যাই।"

কেশব বলিলেন,—"দাদা, যাইতে হয়, তুমি যাও, আমি যাইব না, এখনও আটটার ট্রেণ পাইতে পারি, সময় আছে। আমি বাড়ী ফিরিতেছি। বুঝিলাম, এত দিন কি ভ্রান্তিতে ছিলাম! আজ আমার সকল আশা ফুরাইল! যদি কখনও সুধীরকে মানুষ করিতে পারি, তবে এ কষ্ট ভুলিব।"

এই বলিয়া কেশব ক্ষিপ্তের ন্যায় মাধব বাবুর বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অভিমানে।

[১]

বৈকালে বিলাস বাবুর গাড়ী যখন ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, বিনোদিনী তখন কেশ বিন্যাসে বিষম বিব্রত।

সুন্দর 'মেহগিনী' টেবিলের উপর সোণালী ফ্রেমে আঁটা প্রকাণ্ড দর্পণ, চারিদিকে নানাবিধ সুগন্ধি সম্ভার—পমেটম, আটো-ডি-রোজ, লেভেণ্ডার, খস্‌খস, কস্তুরী—নানা প্রকার শিশিতে টেবিল সজ্জিত। মিহি শান্তিপুরে শাড়ী পরিয়া, অঙ্গে সিল্কের সেমিজ আঁটিয়া, চেয়ারে পা দোলাইয়া বিনোদিনী বসিয়া আছে। জনৈক পরিচারিকা তাহার আলুলায়িত কৃষ্ণ-কুন্তলরাজি বিন্যস্ত করিয়া তাহাতে সুরভি সিঞ্চন করিতেছে। একজন পানের ডিবা হস্তে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বিনোদিনীর ওষ্ঠাধরের তাম্বুলরাগ সমান করিয়া রুমালে মুছাইয়া দিতেছে, কেহ বাতাস করিতেছে।

বিনোদিনীর রূপের প্রভা দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গর্ব্বিতা বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল—'হায় আমার রূপ! তুমিই আমায় মজাইলে!'

এমন সময় বিলাস বাবু উপরে উঠিয়া বিনোদিনীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বিলাস বাবু হাইকোর্টের উকিল, সুন্দর যুবা পুরুষ, 'উকিলের' গাউনে অঙ্গ আবৃত।

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, বিনোদিনীর বেশ-বিন্যাসের বাহার দেখিয়া, বিলাস বাবু কহিলেন,—"বাহবা, বাহবা! আজ যে বড় বাহার দেখ্‌চি। আজ আর ঘরে বিদ্যুতের আলোর আবশ্যক নাই।"

বিনোদিনী দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—"পোড়া কপাল আমার!"

বাবু।—"আমার কিন্তু আজ বড় ভাগ্য! চল, তোমাকে আজ গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবো।"

বিনোদিনী।—"কাজ কি আমার এত আদরে! এত আদর আমার সইবে না।"

বাবু।—"কেন, আমি কি তোমায় অনাদর করেছি?"

বিনোদিনী অভিমানভরে কহিলেন,—"আমি কি তা বল্‌চি!"

বাবু।—"তবে কেন যাবে না? বসন্তের নির্ম্মল বাতাসে তোমার রূপ যে আরও ফুটে উঠবে!"

বিনোদিনী—"কাজ নেই আমার রূপে।"

বাবু।—"তোমায় আজ এত বিষণ্ণ দেখ্‌চি কেন? চল, একটু বেড়ালে প্রফুল্ল হবে, শরীরও ভাল হবে! যাবে?"

বিনোদিনী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল,—"যাবো, খুব ভাল জায়গায় যাবো! সেখানে গেলে মন আরও ভাল হবে!"

বাবু।—"সে কোন্ জায়গা—বল?"

বিনোদিনী।—"যমের বাড়ী!"

বাবু।—"যায়গা খুবই ভাল, তা আমায় সঙ্গে নেবে না?"

বিনোদিনী।—"না, আমি একাই যাবো।"

বাবু।—"তাও কি হয়, আমিও সঙ্গে যাবো;—এই আমি শীঘ্র পোষাক ছেড়ে প্রস্তুত হয়ে আস্‌চি।"

এই বলিয়া বাবু পোষাক ছাড়িবার জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী মণিমুক্তা-জহরতাদি-খচিত নানা প্রকার স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত হইতে লাগিল।

[২]

পার্শ্বস্থ কক্ষে আরাম-কেদারায় শুইয়া বাবু গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন। কক্ষটি বিলাতি-ধরণে সজ্জিত, মস্তকোপরি বৈদ্যুতিক পাখা বন্ বন্ ঘুরিতেছে। এমন সময় বিনোদিনী রূপের লহর তুলিয়া সে কক্ষে প্রবেশ করিল। বাবুর হাতে একখানি চিঠি। বাবু নির্নিমেষ নয়নে যেন সেই রূপের সুধা পান করিবার জন্য বিনোদিনীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিনোদিনী কহিল,—"কৈ, যাবে না?"

বাবু।—"কোন্ দিকে যাব, তাই ভাব্‌চি।"

বিনোদিনী।—"সে ভাল যায়গা, তুমিই তো বলেছ!"

বাবু।—"রহস্য নয়। আমায় এখনই ভবানীপুর যেতে হবে। মিষ্টার রায়ের বাড়ীতে আজ রাত্রে বিশেষ এন্‌গেজমেণ্ট আছে; না গেলে চল্‌বে না। ফিরতে বিলম্ব হবে। বিনু, দুঃখিত হয়ো না! তোমাকে না হয় গড়ের মাঠে হাওয়া খাইয়ে, তবে যাব!"

বিনোদিনী।—"থাক, আর আমার অত আদরে কাজ নাই! আমার গন্তব্য স্থানে আমি একাই যেতে পার্‌বো।"

বিনোদিনীর হাতখানি ধরিয়া নিকটে লইয়া বিলাস বাবু কহিলেন,—"বিনু, রাগ কর্‌লে? রাগে অভিমানে তোমায় যে বড় সুন্দর দেখায়!"

বিনোদিনী।—"আর খোসামোদে কাজ কি? তোমার উপর রাগ করবার আমার অধিকার কি!"

বাবু।—"সম্পূর্ণ অধিকার তো তোমাকেই দিয়েছি! অভিমানিনী, সে অধিকারে পদাঘাত করো না।"

বিনোদিনী।—"তোমার কাব্য-কথা ঢের শুনেছি। এখন ছাড়, আমি যাই!"

বাবু, বিনোদিনীকে আর একটু নিকটে টানিয়া, বিনোদিনীর

হাত দুইখানি ধরিয়া ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন,—"বিনু, আমি তোমারি। আজ আমার নিতান্ত দরকার, তাই ভবানীপুরে যেতে হবে।"

বিনু।—"তা আমি কি বারণ করছি!"

বিনোদিনী পাণিবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। বায়ু-হিল্লোলে ঝরঝর কামিনী ফুলের ন্যায় তাহার শ্বেত-বসনাঞ্চল উড়িতে লাগিল। বাবু বিহ্বলচিত্তে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন—যেন একটা রূপের সৌরভ কক্ষ হইতে উড়িয়া গেল।

(৩)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সজ্জিত সুন্দর অট্টালিকায় কক্ষে কক্ষে যেন নানাবর্ণের বিদ্যুতালোকে মালা গাঁথা হইয়াছে। অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণের পুষ্পোদ্যানে বিবিধ পুষ্পের সৌরভ দিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। দক্ষিণ বারান্দায় বসিয়া বিনোদিনী আকাশ-পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল,—"আমার সুখ কোথায়? কৈ, স্বামী তো আমায় ভালবাসেন না! আমি অভাগিনী, এত করিয়াও আমি স্বামীর ভালবাসা পেলাম না! আমার মরণই মঙ্গল।"

সে সময় মলয়ানিল ঝির্‌ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। নক্ষত্রালোকে আকাশ উজ্জ্বল হইয়াছে। নিকটে কেহ নাই, বিনোদিনী একাকিনী। বিনোদিনী একবার কক্ষ মধ্যে গেল,

আবার বারান্দায় আসিল। কি যেন একটা দুর্ভাবনায় মন অস্থির হইয়াছে। কিছুই ভাল লাগে না। একবার ভাবিল—"স্বামী যদি আমায় ভালবাস্তেন, তা হ'লে এমন সময় আমায় ছেড়ে যাবেন কেন ?" আবার ভাবিল—"আমি মরিলেই বুঝি তাঁর সুখ হবে।"

নব-যৌবনোদ্ভিন্না বিনোদিনী, কাল্পনিক সুখ-দুঃখের চিন্তায়, মনকে পীড়িত করিয়া তুলিল। মনে মনে কল্পনা করিয়া লইল—তাহার যেন কোনও সুখই নাই ; মরণই একমাত্র সুখের !

এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমায় ডেকেছিলেন কেন ?"

বিনোদিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরিচাকিার হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া কহিল,—"চঞ্চলা, তোকে দশ টাকা বক্‌সিস দিলাম। তুই চুপি চুপি আমায় এক কৌটা বিষ এনে দে। সাবধান, কেউ যেন জান্‌তে না পারে !"

চঞ্চলা।—"তা কেউ জান্‌তে পার্‌বে না, আমি এখনই এনে দিচ্ছি ! বিষ কি হবে, দিদি'ঠাকৃরুণ ?"

বিনোদিনী।—"তোর সে খোঁজে দরকার কি ?"

চঞ্চলা দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। বিনোদিনী অপর পরিচারিকাকে ডাকিয়া কহিল,—"বাগান থেকে ভাল ভাল ফুল এনে আজ আমার ঘর ও বিছানা সাজিয়ে দে।"

বিনোদিনী একাকী বসিয়া মনে মনে ভাবিল,—"আজ দেখ্‌ব, কে আমায় বেশী ভালবাসে? যম আমায় বেশী ভালবাসে?—না, স্বামী আমায় বেশী ভালবাসেন!"

কিছুক্ষণ পরে চঞ্চলা ফিরিয়া আসিয়া একটি কৌটা বিনোদিনীর হাতে দিল। বিনোদিনী সেটিকে লইয়া টেবিলের উপর রাখিল। মনে ভাবিল—"এত দিনে আমার সকল জ্বালা জুড়াবে। অন্তিম সময়ে যদি তিনি আসেন, মনের কথা সব আজ খুলে বল্‌বো। দেখ্‌ব, তিনি আমার জন্য আক্ষেপ করেন কি না! দেখ্‌ব, তিনি আমায় কতখানি ভালবাসেন! আজ আমার বিষম পরীক্ষার দিন—আমার বড় সুখের দিন!"

বিনোদিনী চেয়ারে বসিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।

(৪)

রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকার সময় বিলাস বাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—পালঙ্কের উপর ফুলশয্যায় বিনোদিনীর স্বর্ণ-দেহ শোভা পাইতেছে।

বিনোদিনী নয়ন অৰ্দ্ধনিমিলিত করিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল,—"আজ আমার বড় সুখের দিন। তুমি আমার নিকটে বোস। এখনই আমি হাসতে হাসতে, তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে, তোমার সাম্‌নে বিদায় নিয়ে চলে যাব।"

বাবু,—"বিনু, এ সব কথা তুমি কি বল্‌ছ? কেন,

কি হয়েছে? তুমি কোথায় যাবে? তোমার কি অসুখ করেছে?"

বিনোদিনী,—"আমার অসুখ নয়, এই আমার পরম সুখ। আমি বেশী কথা বল্‌তে পার্‌বো না। আমার এই শেষ চিঠিখানি পড়।"

শয্যার পার্শ্বে একখানি চিঠি পড়িয়া ছিল। বিলাস বাবু দেখিলেন, বনোদিনীর হস্তাক্ষর। বিলাস বাবু চিঠিখানি পড়িলেন—"প্রিয়তম, আজ আমায় জন্মের মত বিদায় দাও। তুমিই আমার অভিমান বাড়িয়েছিলে। আজ সেই অভিমানে আমি আত্মহত্যা করেছি। আমার প্রাণের জ্বালা চিরকালের জন্য জুড়াব বলে, আমি বিষ খেয়েছি। আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করো না। আর আমার বাঁচ্‌তে সাধ নেই। তুমি এ অভাগিনীকে ভুলে যেয়ো। তুমি আবার বিবাহ করে সুখী হয়ো। আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো।—ইতি বিনু।"

ব্যাকুল আগ্রহের সহিত বিলাস বাবু কহিলেন,—"বিনু, কি সর্ব্বনাশ করেছ! তুমি বিষ খেয়েছ! তোমার কিসের দুঃখ, তোমার কিসের অভিমান? আমার পৈত্রিক এত সম্পত্তি, আমার এমন সুখের আলয়, আমার প্রাণভরা ভালবাসা—কিছুতেই তোমার মন পাইল না!"

এই বলিয়া বাবু তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলেন এবং ডাক্তার বটব্যালকে শীঘ্র আনাইবার জন্য হুকুম দিলেন।

বিনোদিনী কাতর কণ্ঠে কহিল,—"প্রাণেশ্বর! তোমার হাত-খানি একবার আমার বুকের উপর দাও! দেখ এ বুকে কত জ্বালা। আমার জন্য দুঃখ করো না। অভাগিনীকে জনমের মত ভুলে যেও। আমায় আর বাঁচাইবার চেষ্টা করো না। আমি বাঁচ্‌তে চাই না। তোমার কাছে আমার যে ফটোগ্রাফ আছে, তাহা পুড়িয়ে ফেলে দিও। তোমার বাক্সের ভিতর আমার যে কবিতা ও গান আছে, সেগুলি আমার চিতায় দিও। আর আমার সখের ময়না বুল্‌বুল্‌ পাপিয়া পাখীগুলিকে অনন্ত অনন্ত আকাশে উড়িয়ে দিও।"

বাবু।—"বিনু! বিনু! তুমি আমার উজ্জল ঘর আঁধার করো না! আমার এ সুখের সংসার ভাসিয়ে দিও না! আমার এ কুসুম-কোমল হৃদয়ে কেন বজ্র হানিলে? কেন বিষ খেলে? আমি কি অপরাধ করেছি?"

বিনোদিনী।—"প্রিয়তম্‌, আজ আমার সুখের দিনে তুমি দুঃখ করো না! তোমার কোলে মাথা রেখে আজ যে আমি বিদায় নিয়ে যাচ্ছি, এতে আমার কত সুখ!"

বাবু।—"বিনু, আমি তো এক দিনের জন্যও তোমায় উপেক্ষা করি-নি! তোমার মত পত্নী নিয়ে আমি স্বর্গ-সুখ কল্পনা কর্‌ছিলাম। তুমি আমার প্রাণে কেন এ আগুন জ্বেলে দিলে! হিন্দু স্ত্রী হয়ে এমন অপকর্ম্ম কেন কর্‌লে? আত্মহত্যা যে মহা পাপ!"

বিনোদিনী কহিল,—"আর কথা কইতে পার্‌ছি-নে! আর একটু কাছে এসে বোস! তোমার চোখ ছল্ ছল্ কর্‌ছে কেন? এই অভাগিনীর জন্য তুমি মনে কিছু দুঃখ করো না। আমি যাই! জন্মান্তরে আবার দেখা হবে।"

বিলাসের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিলাস উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"কে আছ? ডাক্তারকে জল্‌দি আন!"

(৫)

বাড়ীময় একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। চারিদিকে লোকজনের চাকর-নফরের দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি বাড়িল। কত জনে কত কাণ্ড-কারখানা করিতে লাগিল। বাড়ীর দাসী পরিচারিকা মহলে 'হা হুতাশ' পড়িয়া গেল। কুটুম্বিনী ও আত্মীয়-স্বজন, কেহ বিনোদিনীর নিন্দা করিয়া, কেহ বা সুখ্যাতি করিয়া, অন্দরে কলকণ্ঠ প্রকাশ করিল। বাহিরের ফটকে কড়া পাহারা পড়িয়া গেল। ডাক্তার ডাকিতে লোক দৌড়িল।

বিলাসের প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। একবার বিনোদিনীর শয্যা পার্শ্বে-আসিয়া 'হা হুতাশ' করেন, আবার ডাক্তার আসিল কিনা জানিবার জন্য ব্যাকুল হন। বিনোদিনীর চক্ষু ক্রমশঃই যেন মুদিত হইয়া আসিতেছে। বিলাস বাবু ভয় করিতেছেন,—এখনই বুঝি বিনোদিনীর জীবন-বায়ু শেষ হইয়া আসিবে!

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার অসিলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া তিনি

বিলাসবাবুকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। বাবু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"অবস্থা কেমন দেখ্‌লেন? বিনু আমার বাঁচবে তো? যেমন করে হোক, তাকে বাঁচাতে হবে, ভাই! সে অভিমান করে বিষ খেয়েছে।"

ডাক্তার।—"বিলাস! তুমি আমার বাল্যকালের বন্ধু। আমাকে আর অত করে বল্‌তে হবে কেন? ভয় করো না—আমি যেমন যেমন বলি, তেমনই করিয়া যাও। অন্য কোনও ডাক্তার এখন ডাক্‌তে হবে না। আমি একটা ঔষধ দিব। উহা দুই বার মাত্র খাওয়াবে।"

বিলাস—"তাই হবে ভাই! তুমি কিন্তু এখন যেতে পাবে না। তাহার অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তোমায় এখানে হাজির থাক্‌তে হবে।"

ডাক্তার—"আচ্ছা, তাই হবে। তবে আধ ঘণ্টা আমি ঘুরে আস্‌চি। দেখ, তুমি ছাড়া ঘরে আর কাউকে থাক্‌তে দিবে না। তার কাছে বসে সারারাত্রি তার সঙ্গে কথা কয়ে তাকে সুখী করো। প্রভাতে যখন তার চক্ষু মুদিত হয়ে আস্‌চে দেখ্‌বে, তখন ভাই আর তাকে জাগিও না। পাষাণে বুক বেঁধে রুমালে মুখ ঢেকে বাহিরে চলে এসো। আর সে দিকে ফিরে চেয়ো না—কাউকে কিছু বোল না, 'হা হুতাশ' করো না। এখন তবে আমি আসি।"

বিলাস।—"তুমি কি নিৰ্ম্মম! আমার প্রাণের ব্যাথা তুমি কি বুঝ্বে? আমার সোণার সংসার, আমার সোণার প্রতিমা আজ বিষৰ্জ্জন দিতে বসেছি, আর তুমি বল্‌ছো—'হা হুতাশ' করো না! তুমি নিশ্চয় পাষাণ!"

ডাক্তার,—"গালাগালি দেবার ঢের সময় পাবে। কিন্তু এখন যা বলে গেলাম, ঠিক সেই মত কাজ করো। অন্যথা না হয়।"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি "মটর" হাকাইয়া চলিয়া গেলেন।

বিলাস চিন্তাভারাক্রান্ত গম্ভীর হৃদয়ে আবার বিনোদিনীর শয্যা-পার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন। বিনোদিনীর নিদ্রালস চক্ষু একবার স্বামীর পানে চাহিল। স্বামীর চক্ষু ছলছল হইয়া আসিল।

(৬)

শায্যার চারিদিকে ইতস্ততঃ ফুলকুল হাসিয়া লুটাইতেছে। চন্দ্রকরোজ্জ্বলা ধরণী হাসিমুখে গবাক্ষ-পথে উঁকি মারিতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া বিনোদিনীর সাধের পাপিয়া কণ্ঠস্বরে মাতাইয়া তুলিতেছে।

বিলাস বিনোদিনীর মুখের পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছেন। ডাক্তারের কথা মত ঔষধ একবার খাওয়ান হইয়াছে। বিনোদিনী চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছে।

বিলাস কহিলেন—"তুমি এমন কাজ কেন কর্‌লে, বিনু?

আমার সংসার কি তোমার ভাল লাগ্‌লো না? কেন তুমি আমায় ছেড়ে যাচ্ছ, বিনু?”

বিনোদিনী।—তুমি আমার প্রাণের জ্বালা বুঝ্‌তে পারনি। আজ আর কেন? আজ আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও।”

বিলাস—“আমার হাসি মুখ দেখ্‌বার জন্যই কি তুমি বিষ খেলে? তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হলো? আমার হাসি-মুখ কি কখনও দেখ নাই! এখন যে বাস্তবিকই লোকের কাছে তুমি আমার মুখ হাসালে!”

বিনোদিনী।—“তুমি এখন আমায় তিরস্কার কর্‌চো? আমার অভিমান তো তুমিই বাড়িয়েছ! সেই অভিমানেই আমার এই পরিণাম!”

বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল। ক্ষীণকণ্ঠে বিনোদিনী কহিল—“প্রাণেশ্বর, তুমি আমায় বিদায় দাও—আমার বড় সুখ হবে! এই শেষ মুহূর্ত্তে একবার বিনু বলে আদর করো! তোমার পা-দু'খানি একবার আমার মাথায় দাও। বল—বল প্রিয়তম! আমার মত অভাগীকে তুমি ভুলে যাবে!”

বিলাস বাবু বুঝিলেন—এইবার সব ফুরাইল! তখন রজনী প্রভাত-প্রায়। বিনোদিনী আর কথা কহিল না। চক্ষু দুইটি মুদিত হইয়া আসিল। গবাক্ষপথে দেখিলেন—চন্দ্রালোকও ম্লান হইয়া আসিয়াছে। আকাশে নক্ষত্ররাজি একে একে নিবিয়া

যাইতেছে। কক্ষালোকও ক্রমশঃ ম্লান হইতেছে। আর সংসারে জাগরণের সাড়া পড়িতেছে। বাবু রুমালে অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিরাশ হৃদয়ে বাহিরে আসিলেন। কক্ষান্তরে ডাক্তার বন্ধুকে দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বিলাসের ভগ্নিও ভাইয়ের কান্নাস্বর শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। পুরনারী সকলেই কাঁদিতে লাগিল। "হতভাগিনী, আমাদের এই সুখের সংসারে কেন কলঙ্ক লেপন করে গেলি" এই বলিয়া বিলাসের ভগ্নী অমলাসুন্দরী কতই দুঃখ করিতে লাগিলন।

(৭)

বিলাসকে কাঁদিতে দেখিয়া ডাক্তার সাস্ত্বনাছলে কহিলেন,—"ভাই, দুঃখ কোরো না, শোক ত্যাগ কর। যা হবার হোল; কাঁদ্‌লে কোনও ফল হবে না! এখনও কর্ত্তব্য ভুলো না।"

বিলাস।—"তুমি কি বলচো ভাই? তোমায় না বল্‌লে এ দুঃখ আর কাকে বল্‌বো! প্রাণের ব্যথা আর কিসে যাবে! চল, ঐ ঘরে গিয়ে দেখ্‌বে, চল—সে কেমন হাসিমুখে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আহা-হা! মরণের কোলে শুয়েও তার সৌন্দর্য্য যে শত গুণে ফুটে উঠেছে! একবার দেখ্‌বে এস।"

ডাক্তার।—"ভাই, আর মায়া করে কি হবে! ঐ সৌন্দর্য্যই যে তোমার সর্ব্বনাশ করেছে! সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তুমি আপনাকে সামলাতে পারোনি। এখন দুঃখে ফল কি?"

বিলাস।—"তুমি কি নিষ্ঠুর! একবার দেখ্‌বে না—সে মূর্ত্তি! জগতে এনমটি যে আর মিলবে না!"

ডাক্তার।—"কিছুক্ষণ স্থির হও, আমি আর দেখ্‌তে চাই না। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে একবার গিয়ে দূর থেকে দেখে এস। পরে তোমার কাছে একটি কথা বল্‌ব।"

বিলাস কিছুক্ষণ পরে একবার জানালা দিয়া দেখিয়া আসিলেন। বিনোদিনী যেন চক্ষু মেলিয়া চাহিতেছে, সে চক্ষু যেন কাহাকে খুঁজিতেছে। বিলাসের একবার ইচ্ছা হইল, একবার কক্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু পরক্ষণেই ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বিলাস তখন ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় ডাক্তারকে কত তিরস্কার করিলেন।

ডাক্তার বলিলেন—"তোমার তিরস্কার শুনে আজ এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পাচ্ছে। আমার একটি গোপনীয় কথা আছে শুন্‌বে?

বিলাস—"তোমার মত পাষণ্ডের কথা আমি আর শুন্‌তে চাই না। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ—তুমি। আর তুমি এখনও গোপনীয় কথা শুনাতে চাও!"

ডাক্তার।—"তা বটে, আমিই তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ! তবে শোন। কাল সন্ধ্যার পর তোমার দাসী চঞ্চলাকে হঠাৎ রাস্তায় দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—"চঞ্চলা কোথায় যাচ্ছিস্?" চঞ্চলা থতমত খাইল। আমার সন্দেহ হইল। কথায় কথায়

বুঝলাম, সে এক কৌটা বিষ কিনে নিয়ে যাচ্চে। আমি তখন কৌশলে তার হাত থেকে সে কোটাটি নিয়ে, তার অজ্ঞাতসারে তার হাতে আর একটি কৌটা দিয়ে বলে দিলাম—"খুব সাবধানে নিয়ে যাবি। কাকেও বলবি না! তোর দিদিঠাকরুণের যখন যেতে নিতান্তই সাধ হয়েছে, তখন এই ভাল জিনিষটি গোপনে তাঁকে দিবি।"

বিলাস।—"তুমি এ কি আশ্চর্য্য কথা বল্‌ছ! এমন তো কখনও শুনি নাই! তা হ'লে তুমিই কি আমার এই সর্ব্বনাশ করলে?"

ডাক্তার।—"তুমি বন্ধু বলে তোমার সঙ্গে না হয় একটু রহস্যই করলাম! তুমিও মনে মনে ভাব্‌ছ—যেন তোমার সুখের সংসার শূন্য করে সে তোমায় ফাঁকি দিয়ে পালাল। অন্তিম সময়ের ভালবাসার দৃশ্যটি কেমন হৃদয়ের ভিতর আঘাত করে, তা একবার বুঝে দেখ্‌লে। উভয়ে বসিয়া প্রেম-কাব্য আলোচনা ঢের করছে। ইহাতে তোমারও শিক্ষা হয়েছে, তোমার স্ত্রীরও শিক্ষা হবে। ভয় নাই; তোমার স্ত্রী মরবে না। যে ওষুধ দিয়েছি, তার ফলে সুখে নিদ্রা হচ্চে। এখন বুঝতে পার্‌বে তোমার স্ত্রী তোমার কাছে কত অপরাধী ও কতই লজ্জিতা। এমন ঘটনা তোমার সংসারে সত্যই যেন আর না ঘটে, সে জন্য উভয়েই সতর্ক থেকো। আমি এখন আসি।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

(৮)

প্রভাতে বিনোদিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, সে বড়ই লজ্জিত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"এ কি! আমি মরিলাম না কেন? স্বামী মনে মনে কি ভাব্‌বেন! তিনি বোধ হয় সারা-রাত্রি আমার পাশে বসেছিলেন। তাঁ'র মনে কত ব্যথা দিয়েছি। আমার এমন দেবতার মত স্বামী থাকৃতে আমি কেন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম! আমার এত পরিচারিকা, দাস দাসী, চাকর-নফর, কোচোয়ান-সইশ-বরকন্দাজ—তাহারাই বা কি মনে কর্‌বে? আমার স্বামীর এমন অগাধ ভালবাসা, আর কি তেমন ভাবে ভোগ কর্‌তে পাবো! তাঁর মুখপানে চেয়ে, আর কি তেমন হাসি-রহস্য কর্‌তে পার্‌বো! আমি কি অপকর্ম্মই করেছি! কেন বেঁচে উঠলাম!"

এমন সময় ধীরে ধীরে বিলাসচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করি-লেন। বিনোদিনী অতীব সঙ্কুচিতা হইয়া মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। তাহাতে যেন সুপ্তোত্থিতা সুন্দরীর সৌন্দর্য্য শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। বিলাসচন্দ্র অধরের হাসি নয়নে প্রকাশ করিয়া, বিনোদিনীর চিবুক স্পর্শে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিনু, সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল কি?"

লজ্জিতা বিনোদিনী কথা কহিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, এক বার বলি—"তোমার চরণের দাসী হইতে পারিলেই

অমার সুখ, অভাগিনীকে ক্ষমা কর।" কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। চক্ষু নত করিয়া বিলাসের পার্শ্বে লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কোচিতভাবে কেবল দাড়াইয়া রহিল।

বিলাসচন্দ্র সুন্দরীকে বাহুবেষ্টনে নিকটে টানিয়া সোহাগভরে বিনোদিনীর মুখের কাছে মুখ লইয়া কহিলেন,—"বিনু, এমন কাজ আর করো না। আমি তোমারই।"

স্বামীর সে স্নেহ-আলিঙ্গনে বিনোদিনীর প্রাণ গলিয়া গেল। প্রভাতের শিশিরসিক্ত কমলের ন্যায় তাহার কোমল চক্ষু দুইটী যেন অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া আসিল। বিনোদিনী স্বামীর চরণ-প্রান্তে লুন্ঠিতা হইয়া কাতর-কণ্ঠে কহিল,—"হৃদয়ের দেবতা! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আর লজ্জা দিও না। এমন কর্ম্ম আর কখনও কর্‌ব না।"

বিলাসচন্দ্র বিনোদিনীর হাতখানি ধরিয়া কহিলেন,—"বিনু, উঠ! অভিমানভরে যা করেছ, তার জন্য আর দুঃখ করো না। অনলে পুড়িয়া স্বর্ণ যেমন নির্ম্মল হয়, এখন তোমার হৃদয়ও তেমনি নির্ম্মল হয়েছে। আমার গৃহে এখন তেজোময়ী বিদ্যুৎ-শিখার পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ-প্রভাই অধিক শোভা পাবে।"

স্বামীর চরণে ধরিয়া লজ্জাবনতমুখী বিনোদিনী কহিল,—"জীবনে মরণে তুমিই আমার আরাধ্য দেবতা। ক্ষমা করো সব অপরাধ।"

* * *

মহামায়া।

—:(*):—

(১)

সদানন্দ ভট্টাচার্য্য রূপগ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সদানন্দ উপাধিধারী পণ্ডিত নহেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক দশকর্ম্মে সদানন্দের ন্যায় পারদর্শী অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সদানন্দ নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক ও ভক্ত।

কিন্তু সদানন্দ অতি দরিদ্র। যজন-যাজন দ্বারা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেন। সংসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও এক মাত্র কন্যা ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না। পত্নী কাত্যায়নী, দুঃখ-দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও, কদাচ পতিসেবা বিস্মৃত হন নাই। কন্যা মহামায়া যেমন অশেষ গুণে গুণবতী, তেমনি অশেষ রূপে রূপবতী ছিলেন। মহামায়ার রূপগুণের বিষয় অবগত হইয়া বেলগাঁয়ের জমীদার বিশ্বেশ্বর চৌধুরী নিরন্ন দরিদ্র সদানন্দের কন্যা

মহামায়াকে পুত্রবধূ-রূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বড়লোকের গৃহে কন্যাদান করিতে সদানন্দের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দরিদ্রে ধনাঢ্যে আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা চলে না। কিন্তু কি করিবেন? গৃহিণীর অনুরোধ; বিশেষতঃ কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, সদানন্দ বিবাহে কোনও আপত্তি করেন নাই।

(২)

আশ্বিন মাস আসিল। প্রাবৃটের ঘনঘটা অপসৃত হইল। প্রকৃতি সুন্দরী নবমনোহর সাজে সজ্জিতা হইলেন। শুভ্র শেফালিকার সুকোমল আসন বিস্তৃত হইল। সরোবর-বক্ষে কুমুদ-কহ্লারের অপূর্ব শোভা ফুটিয়া উঠিল। বিন্দু বিন্দু শিশির-সম্পাতে নিশীথিনী মুক্তার হারে সজ্জিতা হইলেন। তৃণশষ্প-সমাবৃত হরিৎ-ক্ষেত্রে ধান্যশীর্ষ-সমূহ বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া সুবর্ণ চামর বীজন করিতে লাগিল।

দিঙ্মণ্ডল আনন্দে পরিমগ্ন। বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গমগণের আনন্দ-কলরব। প্রান্তরে পূর্ণোদরা গো-বৎসের আনন্দ ক্রীড়া। ফল-পুষ্প-শস্য-শীষে পতঙ্গ প্রজাপতির আনন্দ-নর্ত্তন, শস্যশ্যামলা ধরণীর মনোমোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে কৃষকের আনন্দ-গীতি,—সকলই আনন্দ-উৎসবে পরিমগ্ন।

প্রকৃতির এ আনন্দ নিরন্ন নিরানন্দ সদানন্দের প্রাণও নাচাইয়া তুলিল। আনন্দময়ী সদানন্দের প্রাণে আনন্দধারা বর্ষণ করিলেন।

দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট সদানন্দ আনন্দ-উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। সদানন্দ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন,—"এবার যেমন করিয়া পারি, সর্ব্বদুঃখহরা জগজ্জননীর অর্চ্চনা করিব।"

কিন্তু সদানন্দের সে সামর্থ্য কোথায়? সদানন্দ দরিদ্র অর্থহীন; দুর্গোৎসবের ব্যয় তিনি কিরূপে নির্ব্বাহ করিবেন! কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? সদানন্দ কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না; মনে মনে ভাবিলেন,—"আমি কি করিতে পারি? যাঁহার কার্য্য তিনিই করাইয়া লইবেন। আমি নিমিত্ত বই তো নয়? কোনরূপে মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে পারিলেই কামনা পূর্ণ হইল; আড়ম্বরে আমার প্রয়োজন কি?"

কাত্যায়নীর নিকট সদানন্দ আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। কাত্যায়নী শিহরিয়া উঠিলেন। কাত্যায়নীর বাক্য সরিল না। তিনি মনে মনে প্রার্থনা জানাইলেন,—"জগদম্বে! এ আবার কি পরীক্ষা! এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, তবুও কি পরীক্ষার শেষ হইল না। অনাহারে, অর্দ্ধাহারে কত দিন চলিয়া যাইতেছে। সংস্থান কিছুই নাই; কি দিয়া আবাহন করিব? আবার এ পরীক্ষা কেন?"

কাত্যায়নীকে নীরব দেখিয়া সদানন্দ উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না! তবে কি জগজ্জননীর অর্চ্চনায় তোমার ইচ্ছা নাই?"

কাত্যায়নী উত্তর দিলেন,—"কেন সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না?

কোন্ হিন্দু রমণীর ইচ্ছা হয় না যে, জগজ্জননীর অর্চ্চনা করে?"

সদানন্দ।—"তবে কি ভাব্‌ছ?"

কাত্যায়নী।—"ভাব্‌ছি, কি আছে? কি দিয়ে মায়ের রাঙ্গা পায়ে অঞ্জলি দেব! আমরা গরীব! আমাদের দুর্গোৎসব শুনে পাঁচ জনে তামসা দেখ্‌তে আস্‌বে। তাদের তত্ত্ব নিতে না পার্‌লে উপহাস কর্‌বে—তাই ভাবছিলাম।"

সদানন্দ উৎসাহব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন,—"আমাদের কি আছে, তাই ভাব্‌ছো—কাত্যায়নী? কেন, প্রাণে কি ভক্তি নেই? মা আমার কি কেবলই ঐশ্বর্য্য দেখ্‌বার জন্য আসেন? গরীবের ঘরে কি আসেন না? আমরা গরীব—তাই বলে কি মা আমার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন? তা কখনই হতে পারে না—কাত্যায়নী?"

কাত্যায়নী স্বামীর উজ্জ্বল মুখ প্রতি চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

সদানন্দ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন—"পাঁচ জনে তামাসা দেখ্‌তে আস্‌বে, আর তত্ত্ব নিতে না পার্‌লে উপহাস কর্‌বে—এ কথা ঠিক। কিন্তু কাত্যায়নী, যদি মায়ের পদে মতি থাকে, যদি প্রাণ ভরে মা বলে ডাকৃতে পারি, মা আপনি এসে অবশ্যই আমার সাধ পুরাবেন। এতদিন প্রাণ ভরে ডাকি নাই কাত্যায়নী; তাই—এত দুঃখ—এত দারিদ্র্য। একবার

তিন্‌টি দিনের জন্য একাগ্রচিত্তে মাকে ডেকে দেখি—মা আমার শুন্‌তে পান কি না! কাত্যায়নী, তুমি উদ্যোগ আয়োজন কর!"

পতিপরায়ণা কাত্যায়নী আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। পতিপত্নী উভয়ে মহামায়ার অর্চ্চনাব উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন।

(৩)

আজ ষষ্ঠী। ঊষা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ঢাক-ঢোল-কাঁসর-দামামা নহবতাদি বাজিতে লাগিল। আজ যেন সংসার নবোৎসাহে নব উদ্যমে নাচিয়া উঠিল। এক বৎসরের সুপ্ত-সংসারে আজ যেন জাগরণের সারা পড়িয়া গেল।

রূপগ্রাম ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম বটে; কিন্তু গ্রামে প্রায় চারি পাঁচ বাড়ীতে দুর্গোৎসবের ধুম পড়িয়া যায়। অনেকেই বর্দ্ধিষ্ণু; অনেকের বাড়ীতেই প্রতিমাব বহুমূল্য সাজসজ্জা; সকল বাড়ীতেই 'দেহি দেহি' রব; সকলের বাড়ীতেই জন-কোলাহল।

কিন্তু সদানন্দের বাড়ীতে তাহার কিছুই নাই। সদানন্দের নীরব আড়ম্বরশূন্য অনুষ্ঠান—যাহা না হইলে নয়, সেই মত। অতি সামান্য ব্যয়ে একখানি ছোট প্রতিমা আনিয়া, সদানন্দ তাঁহার পর্ণকুটীর সাজাইয়াছেন। প্রতিমার সাজ-সজ্জার আড়ম্বরও কিছুমাত্র নাই। ভক্ত সদানন্দ ভাবিলেন—"যিনি ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী, যিনি সর্ব্বস্বরূপিণী, কৃত্রিম সাজে কি তাঁহাকে সাজান যায়?"

সদানন্দের আন্তরিক আহ্বান—আকুল আবাহন; আড়ম্বরের কি প্রয়োজন? পতিপত্নী উভয়ে সারাদিন ব্রতোপবাসী থাকিয়া একান্ত নিষ্ঠার সহিত পূজোপকরণাদি সংগ্রহ করিলেন।

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল। বোধন-অধিবাসের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কাত্যায়নী উৎফুল্ল প্রাণে স্বামীকে কহিলেন,—"দেখ', আজ প্রায় পাঁচ বছর হল, মহামায়াকে দেখি নাই। মায়ের প্রাণ, এই পূজার সময় তাকে একবার তিনটি দিনের জন্যও আন্‌তে ইচ্ছে করে। তুমি একবার যাও, মহামায়াকে নিয়ে এস।"

সদানন্দ একটু অনিচ্ছার ভাব প্রকাশ করিলেন। প্রথমে তাঁহার মনে হইল,—'বড়লোক তাহারা; আমার বাড়ী দুর্গোৎসব,—তাহারা বিশ্বাস করিবে না। তাহারা হয় তো মনে করিবে, আমি মিথ্যা বলিয়া কন্যাকে লইতে আসিয়াছি।' তার পর তাঁহার মনে হইল,—"বিশ্বাস করিলেও মহামায়াকে আসিতে দিবে না। আমি অপমানিত হইব। তাহাদের বাড়ীতে পূজা—কত ধুম। আমার বাড়ীতে তাহারা কেন পাঠাইবে?" এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া সদানন্দ প্রথমে পত্নীর কথায় কোনও উত্তর দিলেন না।

স্বামীকে নীরব দেখিয়া কাত্যায়নী ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, মহামায়ার জন্য কি তোমার মন কেমন করে না? বড়ঘরে মাকে পাঠিয়েছি বলে কি জন্মের মত তাকে ভুলে থাকৃতে পারি! আমরা গরীব,—গরীব হোলে কি সন্তানের প্রতি

স্নেহ কম হয় ? আজ এমন দিনে কত লোক মেয়ে-জামাই নিয়ে কত আনন্দ করে। আমরা কি একবার দেখ্‌তেও পাবো না !"

সদানন্দ।—মহামায়ার জন্য আমার প্রাণও ব্যাকুল হয়। তুমি বল্‌ছো—আমি আন্‌তে যাবো। কিন্তু সবই তো জানো ! আজ পাঁচ বছর চেষ্টা করেও যখন আন্‌তে পারি-নি, তখন আমি সে আশা ছেড়ে দিয়েছি।"

কাত্যায়নী কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন,—"মায়ের প্রাণে যে কত ব্যথা, তা কে বুঝ্‌বে ! মা জগজ্জননী, তোর মনে যা আছে, তাই করিস্ মা !"

(৪)

মহামায়ার শ্বশুরবাড়ী অধিক দূরে নহে। যথাসময়ে সদানন্দ ভট্টাচার্য্য বৈবাহিক-আলয়ে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে অন্দরে প্রবেশ করিয়া মহামায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। আশঙ্কা—পাছে সমস্ত পণ্ড হয়। যাহা হউক, ধীর পদবিক্ষেপে সদানন্দ বিশ্বেশ্বর বাবুর বৈঠকখানায় উপনীত হইলেন।

বিশ্বেশ্বর বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা। পূজার মহা ধুম। নানা স্থান হইতে কুটুম্ব-স্বজন, আত্মীয়-বন্ধু উপস্থিত হইয়াছেন। বিশ্বেশ্বর বাবু বিশেষ ব্যস্ত ; কথা বলিবার অবসর নাই। সদানন্দ বৈঠক-খানায় ফরাসের একপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বিশ্বেশ্বর

বাবু ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। সদানন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে বেয়াই! কি মনে করে?"

সদানন্দ উত্তর দিলেন,—"না, বিশেষ কিছু মনে করে আসি নাই। তবে আপনার কাছে একটা কথা বল্‌তে এসেছি।"

বিশ্বেশ্বর বাবু কহিলেন,—"কি, বল দেখি।"

সদানন্দ ভরসা করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন; কহিলেন—'তিনি এ বৎসর জগন্মাতার অর্চ্চনার আয়োজন করেছেন, তাই মহামায়াকে লইতে আসিয়াছেন; আর গৃহিণীও অনেক দিন মহামায়াকে দেখেন নাই। তাঁর বড় সাধ—অন্ততঃ তিনটি দিনের জন্যও যদি পাঠান।'

সদানন্দের বাড়ী দুর্গোৎসবের কথা শুনিয়া বিশ্বেশ্বর চৌধুরী 'হো হো' উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"তোমার বাড়ী দুর্গা আস্‌বেন! বউমাকে নিতে এসেছ! হো-হো-হো!"

জনান্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"শুনেছো হে মুখুয্যে-মশায়, আমার বেয়াই এবার দুর্গোৎসব কর্‌বেন! মা দুর্গা এবার তাঁর বাড়ীই আস্‌ছেন, আর কারো বাড়ী আর আস্‌ছেন না।"

বৈঠকখানার সমস্ত লোকই তখন 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে উচ্চহাস্য সদানন্দের প্রাণের ভিতর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সদানন্দ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন,—"মা আস্‌বেন কিনা জানি না; তবে আয়োজন করেছি, এই মাত্র। আপনি অনুগ্রহ করে মহামায়াকে যাবার অনুমতি দেন। গরীব হলেও আমি পিতা।"

বিশ্বেশ্বর।—"তাও কি হয়, হে বেয়াই! আমার বাড়ীতে পূজার কত ধুম, কত রং-তামাসা! এ সব ফেলে কি আমি বউমাকে ছেড়ে দিতে পারি? আর তুমি গরীব; তোমার বাড়ীতে এমন কি হাতি ঘোড়া নাচ্‌বে যে, মেয়েকে তা দেখাতে হবে?"

সদানন্দ ভট্টাচার্য নীরব রহিলেন।

বিশ্বেশ্বর বাবু কহিলেন,—"আচ্ছা, তোমার বেয়ানকে একবার বল। এস—আমার সঙ্গে এস।"

সদানন্দের যাইবার ইচ্ছা ছিল না। আর বিদ্রূপ শুনিবার ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু বৈবাহিকের অনুরোধে তাঁহাকে বৈবাহিকা সকাশে গমন করিতে হইল।

বৈবাহিককে সঙ্গে লইয়া বিশ্বেশ্বর বাবু অন্দরে প্রবেশ করিলেন। সদানন্দকে কিছু বলিতে হইল না। বিশ্বেশ্বর বাবু গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"শুনেছ গা! তোমার বেয়াই-বাড়ী এবার দুর্গোৎসব। তাই বউমাকে নিতে এসেছেন। এখন যা হয় কর!"

বিশ্বেশ্বর-গৃহিণীও সদানন্দের দুর্গোৎসবের কথা শুনিয়া হাসিয়া

উঠিলেন। মেয়ে মহলে হাসির একটা রোল উঠিল। সদানন্দ অপ্রতিভ হইলেন। অনেকক্ষণ পরে, হাসির রোল থামিল। বিশ্বেশ্বর-গৃহিণী, বৈবাহিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তা কি হয় বেয়াই! দশটা নয়, পাঁচটা নয়; আমার এক বউ-মা! এবার কর্ত্তা গান-বাজনার বিশেষ আয়োজন করেছেন। এবার কি বউমাকে যেতে দিতে পারি? তা বেয়াই, তুমি কিছু মনে করো না; এবার থাক; আসছে বছর নিয়ে যেও। এবার কিছুতেই পাঠানো হবে না।"

বিমর্ষচিত্তে সদানন্দ প্রস্থান করিলেন। কন্যার সহিত আর দেখা করা হইল না।

(৫)

বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর সুবৃহৎ অট্টালিকার দক্ষিণ দিকে বৃহৎ জলাশয়। সে জলাশয় পুরমহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। জলাশয়ের দক্ষিণ পাড়ে, খিড়কির দ্বারে উদ্যান। উদ্যানের পার্শ্বে সাধারণ রাজপথ। ফটক হইতে বাহির হইয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে, পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা সেই পথে, মহামায়ার বাপের বাড়ী যাইতে হয়।

সদানন্দ ভট্টাচার্য্য ভগ্নোৎসাহে সেই পথে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সহসা পশ্চাদ্দিকের খিড়কির উদ্যান হইতে "বাবা—বাবা! দাঁড়াও দাঁড়াও! আমি এসেছি!" এই রব তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

সদানন্দ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,—মহামায়া উর্দ্ধশ্বাসে দেঁড়াইতে দৌড়াইতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। সদানন্দ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মহামায়া নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,—"বাবা! তুমি আমায় না নিয়েই চলে এলে? তুমি আনতে গিয়েছ; আমি কি আর থাকৃতে পারি! তাই আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি। তুমি পূজো ক'রছ; আর আমি দেখব না! আমার প্রতি কি তোমাদের মায়া-মমতা নাই? তাই আমায় না ব'লে—না দেখেই চ'লে এলে!"

কন্যার কথায় আর কি উত্তর দিবেন? সদানন্দ সঙ্কুচিত হইলেন। কন্যাকে কহিলেন,—"মা, তুমি কেন পালিয়ে এলে! তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কত মন্দ বল্‌বে! আমার উপর রাগ কর্‌বে! কাজ নাই মা, তুমি ফিরে যাও! তোমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী রাগ করে হয় তো তোমায় আর নিবেন না! আমি গরীব; অনশনে অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করি। তোমার কষ্ট হবে। যাও মা, ফিরে যাও। গরীবের বাড়ীতে তোমার বড় কষ্ট হবে, মা!"

মহামায়া কহিলেন,—"কেন বাবা আশঙ্কা ক'রছ? এ কয় দিন তাঁদের বাড়ীতে যে গোলমাল, কে আর আমার খোঁজ করবে? কত লোক আস্‌ছে যাচ্ছে; কে কার খবর রাখে! তুমি চিন্তা ক'রো না। তিন দিনের পরই আমি আবার চলে আস্‌ব।"

সদানন্দ পুনরপি কহিলেন,—"না—মা! কাজ নাই! তুমি

ফিরে যাও। তোমার বাড়ীতে কত ধুমধাম, কত ঘটা, কত আড়ম্বর! গরীবের বাড়ীতে কি দেখ্‌তে কি শুন্‌তে যাবে মা! চলো মা!—তোমায় আমি রেখে আসি!"

মহামায়া ছল ছল নেত্রে কহিল,—"কেন বাবা! গরীব হ'লে কি মেয়েকে জিজ্ঞাসা ক'রতে নাই? গরীব বাপ এই ভাবেই কি মেয়েকে তাড়িয়ে দেয়? বড় লোকের বাড়ীতে তো প্রতি বৎসরই পূজা দেখে থাকি! কিন্তু সে পূজায় তো বাবা প্রাণ পাই না! সে পূজায় তো কৈ তৃপ্তি হয় না! তাদের পূজায় তো সে ভক্তি, সে একাগ্রতা, সে আকুলতা নাই! তাই বাবা, এবার গরীব ভক্তের পূজা দেখ্‌তে সাধ হয়েছে। তুমি আর নিষেধ কর না! চল, আমি গিয়ে পূজার আয়োজন করবো।"

সদানন্দ সে কথা শুনিলেন না। কন্যার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, লোকনিন্দার ভয়ে, কন্যাকে খিড়্‌কি দিয়া অন্দরে রাখিয়া আসিলেন। কেহ দেখিল না; কেহ জানিল না;—এমনই কৌশলে সদানন্দ কন্যা মহামায়াকে বিশ্বেশ্বর বাবুর বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন।

(৬)

গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সদানন্দ কাত্যায়নীকে কহিলেন,—"মহামায়ার আসা হল না। তার শ্বশুড়-শাশুড়ী তাকে আস্‌তে দিলেন না।"

সে কথা শুনিয়া কাত্যায়নীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কাত্যায়নী প্রতিমার নিকটে যাইয়া কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইলেন,—"মা গো, তুই তো মা জগতের মা! জগতের মা হয়ে, মায়ের প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌লি না! তুই মা আমার ঘর আলো করে এয়েছিস্! তবে কৈ মা, আমার মহামায়া কৈ!"

প্রতিমা সে কথার কোনও উত্তর দিল না।

যথালয়ে সদানন্দ বোধনের আয়োজন করিয়া জগন্মাতার উদ্বোধনে বসিলেন। শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে, ধূপ ধূনার গন্ধে সে পর্ণকুটীর পুলকিত হইয়া উঠিল।

একান্তমনে চণ্ডী-পাঠ শেষ করিয়া সদানন্দ দেবীকে আবাহন করিলেন; কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইলেন,—

"ওঁ এহ্যেহি-ভগবত্যম্বে শত্রুক্ষয় জয়প্রদে।
আগচ্ছ মদগৃহে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে।
ওঁ হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভং।
হর দুঃখং হর ক্ষোভং হরদেবি হরপ্রিয়ে॥
ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥"

এইরূপে বহুক্ষণ ধরিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সদানন্দ, দেবী ভগবতীর ধ্যান করিলেন। তাঁহার দুইগণ্ড বহিয়া অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিল। তার পর গললগ্নীকৃতবাসে মস্তক

ভূমিতে লুটাইয়া বাষ্পাকুলকণ্ঠে কহিলেন—"ও মা, সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে, শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে, হে মা গৌরী নারায়ণী,—আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবী সর্ব্ব মঙ্গল-হেতবে। এ দীন দরিদ্র ভক্ত ব্রাহ্মণের মনোসাধ পূর্ণ করতে আয় মা জগন্মাতা!"

বোধন-অধিবাসাদি যথা-নিয়মে সমাপ্ত করিয়া সদানন্দ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কাত্যায়নী তাঁহাকে দেখিয়াই আনন্দ ও আগ্রহভরে কহিলেন—"এই দেখ, আমাদের মহামায়া এসেছে! তারা এসে মহামায়াকে রেখে গিয়েছে।"

সদানন্দ মহামায়ার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। আহা! মহামায়ার কত রূপ! তারা আজ কত রত্নালঙ্কারে সাজিয়ে মহামায়াকে পাঠিয়েছে! সদানন্দ আনন্দের উচ্ছ্বাসে জিজ্ঞাসিলেন—"মা, তারা বুঝি এমনই ক'রে তোকে সাজিয়ে রেখে যাবে ব'লেই এ দরিদ্র বামুনের সঙ্গে পাঠায় নাই!" তৎপরে কাত্যায়নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"দেখ, তুমি মহামায়ার জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়েছিলে! এখন তো খুশী হয়েছ? মাকে আমার যত্নে রেখো। আর দেখো—পূজার যেন কোনও অঙ্গহানি হয় না।"

সদানন্দ অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। এদিকে মহামায়া কাত্যায়নীর নিকট শুনিলেন—'তাঁহার গরীব পিতা-মাতা দরিদ্রতা-নিবন্ধন কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। আর গ্রামে

এত বড় লোকের বাড়ী পূজা থাকিতে, তাহাদের বাড়ী কেই বা আসিবে!' মহামায়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পিতামাতার অজ্ঞাতসারে গ্রামে এবং গ্রামান্তরে আপামর সাধারণ সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে লোক পাঠাইলেন। আর প্রচার করিয়া দিলেন—'অভুক্ত অনাথ আতুর দীন দুঃখী যে যেখানে আছ, পূজার তিন দিন সদানন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে প্রতিমা-দর্শন ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করো।'

এ কথা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কতজনে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কাত্যায়নী মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। সদানন্দ শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন—"হায়, এ কি হইল! মা জগদম্বা তোর মনে কি এই ছিল! দশের কাছে কি দাঁড়িয়ে অপমান হবো! অভুক্ত অনাথ আতুর কাল প্রাতঃকালে যখন আমার দ্বারে দাঁড়াবে, তখন কি হবে মা! আমি যে বড়ই গরীব!"

পিতা কন্যাকে কতই তিরস্কার করিলেন। মহামায়া মনে মনে হাসিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন,—বাবা, কোনও চিন্তা কোরো না। তুমি পূজা করছো, আর তোমার বাড়ীতে দেশের অভুক্ত-অনাথ-আতুর একমুঠা অন্ন পাবে না! তবে কিশের পূজা বাবা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সব ব্যবস্থাই হবে।"
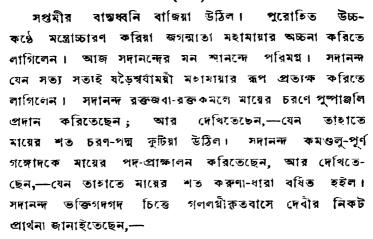
পিতামাতা নির্ব্বাক।

(৭)

সপ্তমীর বাদ্যধ্বনি বাজিয়া উঠিল। পুরোহিত উচ্চ-কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া জগন্মাতা মহামায়ার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। আজ সদানন্দের মন আনন্দে পরিমগ্ন। সদানন্দ যেন সত্য সত্যই ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী মহামায়ার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। সদানন্দ রক্তজবা-রক্তকমলে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন; আর দেখিতেছেন,—যেন তাহাতে মায়ের শত চরণ-পদ্ম ফুটিয়া উঠিল। সদানন্দ কমণ্ডলু-পূর্ণ গঙ্গোদকে মায়ের পদ-প্রাক্ষালন করিতেছেন, আর দেখিতে-ছেন,—যেন তাহাতে মায়ের শত করুণা-ধারা বর্ষিত হইল। সদানন্দ ভক্তিগদগদ চিত্তে গললগ্নীকৃতবাসে দেবীর নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—

"ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগম্
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগম্
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থম্
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
অনাথো দরিদ্র জ্বরারোগযুক্ত
মহাক্ষীণদীনঃ সদাজাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহম্
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥"

পূজা শেষ হইল। মহামায়ার ভোগ হইয়া গেল। কিন্তু সদানন্দের বাড়ীতে ভদ্রলোক কেহই আসিলেন না। সকলের মনের বিশ্বাস—'সদানন্দের বাড়ীতে আর কি খাইব? ডাল তরকারী তো বাড়ীতে রোজই খাইয়া থাকি। লুচি-মণ্ডা তো আর জুটে না!' তবে কেহ ভাবিলেন,—'লুচি মণ্ডার পর অন্নাহার প্রয়োজন। যাইবার সময় না হয় এক বার যাওয়া যাইবে। পাওয়া যায় খাব, না হয়—নাই হবে।' সুতরাং লুচি-মণ্ডার লোভে কেহ বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর বাড়ীতে, কেহ মুখুয্যেদের বাড়ীতে গমন করিলেন।

অন্নপূর্ণা রূপে মহামায়া যে আজ পরিতোষ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎপ্রতি কেহই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

এ দিকে সদানন্দের বাড়ী আজ সহস্র সহস্র কাঙ্গালী, দীন-দরিদ্র, অনাথ, আতুর, অভুক্ত অতিথীতে পূর্ণ হইয়াছে। সদানন্দের গৃহ আজ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-উল্লাসে পূর্ণ। কি পবিত্র সে আনন্দ, কি নির্ম্মল সে উল্লাস! যে দেখিল, সেই মজিল। মাতৃহীন সন্তান ভাবিল—'মা জগৎমাতা আজ সত্য সত্যই সদানন্দের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন।

অপরাহ্ণে কেবলমাত্র কয়েক জন বৃদ্ধ চলচ্ছক্তিহীন স্থবীর ব্রাহ্মণ সদানন্দের আহ্বানে আগমন করিলেন। প্রথমে আসিয়াই তাঁহারা মণ্ডপে প্রতিমার প্রতি লক্ষ্য করিলেন। তাঁহাদের বোধ হইল, [illegible] সে অপরূপ রূপ আর কখনও তাঁহারা দেখেন নাই। সদানন্দের বাড়ীতে যেন সত্য-সত্যই মহামায়া আগমন করিয়া[illegible] জীবনে তাঁহারা অনেক প্রতিমা দেখিয়াছেন; এবারও দে[illegible]ছেন। কিন্তু এরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য তো তাঁহার কোনও প্র[illegible]খিতে পান নাই!

যথাসময়ে তাঁহারা [illegible] বসিলেন। মহামায়া স্বহস্তে পরিবেশন করিতে লা[illegible] দ্রব্যে তাঁহারা অমৃতের আস্বাদ পাইলেন। ব্রাহ্মণগণ [illegible] চিত্তে প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া সদানন্দকে আশী[illegible]াদ করিতে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ গ্রাম হইতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রাষ্ট হইল—সদানন্দের কুটীরে মা যেন স্বয়ং আসিয়াছেন। এমন পূজা, এমন প্রতিমা কেহ কখনও দেখেন নাই। এরূপ আহারের আয়োজনও কেহ কখনও শুনেন নাই।'

পরদিন অতি প্রত্যুষ হইতে সদানন্দের বাড়ীতে জনসমাগম হইতে লাগিল। সদানন্দের ক্ষুদ্র আঙ্গিনা জন-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। মহাষ্টমীর পূজা শেষ হইল। সকলে আহারে বসিলেন। মহামায়া স্বহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কে আনে, কে দেয়,—স্থির নাই। কেবলই 'দেহি দেহি' রব! সদানন্দের গৃহে কোনও দ্রব্যেরই অভাব হইল না। যে খাইল, সেই পরিতোষ লাভ করিল। অন্য কোথাও যাইবার আর কাহারও প্রবৃত্তি রহিল না।

এদিকে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী শুনিলেন,—"সদানন্দের কন্যা মহামায়া স্বয়ং অন্নপূর্ণারূপে অকাতরে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। যে যাহা চাহিতেছে, সে তাহাই পাইতেছে, সেই ধন্য হইতেছে।"

এই সংবাদ শুনিয়া বিশ্বেশ্বর চৌধুরী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—"বেটী বুঝি আমারই সর্ব্বনাশ করেছে! নইলে সদানন্দ এত টাকা পাবে কোথায়!" আর তাঁহার আরও মনে হইল, বুঝি বা তাঁহার পুত্রই গোপনে মহামায়াকে পিতৃগৃহে রাখিয়া গিয়াছে।

উদ্বিগ্নমনে কৌতূহল-বশে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী একবার বৈবাহিক-গৃহে ব্যাপার দেখিতে গমন করিলেন।

(৮)

নবমীর দিন অপরাহ্ণে ধীর-পদ-বিক্ষেপে মন্থর-গতিতে বিশ্বেশ্বর বাবু বৈবাহিক-গৃহে উপস্থিত হইলেন। সদানন্দ তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন। প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রথমেই তিনি বিস্মিত হইলেন। এমন জগন্মোহিনী মূর্ত্তি তো তিনি কখনও দেখেন নাই! তাঁহার বাড়ীর প্রতিমার কত সাজ-সজ্জা! কিন্তু সে প্রতিমা এত সুন্দর—এত রূপসম্পন্ন নয়। তার পর বিশ্বেশ্বর দেখিলেন—অগণিত লোক তখনও প্রাঙ্গণে বসিয়া আহার করিতেছে। যেন তাহাদের কত তৃপ্তি! কে আনে, কে দেয়—বিশ্বেশ্বর কিছুই বুঝিলেন না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কত লোক আসিল, কত লোক খাইল, কত লোক চলিয়া গেল—তাহার ইয়ত্তা হইল না। বিশ্বেশ্বর চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু যাহাকে দেখিবার আশায় সদানন্দের গৃহে আসিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিতে পাইলেন না!

বিশ্বেশ্বর চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ধন্য সদানন্দ!—তুমিই ধন্য! সত্যই তুমি বলিয়াছিলে—'আয়োজন করিয়াছি, এই মাত্র। মা আসিবেন

কিনা, জানি না।' তোমার গৃহে যথার্থই মহামায়া আজ এসেছেন। আজ তোমার ঘরে যা দেখ্‌লাম, ইহাতে আমার জন্ম সার্থক হল। এমন দৃশ্য তো কখনও জীবনে দেখি নাই! সদানন্দ, এখন একবার আমায় মহামায়াকে দেখাও।"

সদানন্দ চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া কহিলেন,—"কেন বেয়াই, তোমার মহামায়াই তো সব ব্যবস্থা করছেন! তোমার দয়াতেই তো তিন দিনের জন্য মহামায়াকে পেয়েছি! ঐ দেখ বেয়াই, রত্নালঙ্কার-ভূষিতা মহামায়া আমার অন্নপূর্ণা-রূপে অন্ন বিতরণ কর্‌ছেন!"

বিশ্বেশ্বর।—তুমি এ কি বল্‌ছো সদানন্দ! আমি মহামায়াকে পাঠাই নাই বলে কি তুমি উপহাস করছো?

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"তুমিই কি আমায় উপহাস করছো! ষষ্টীর দিন বোধনের পর হইতেই যে তোমরা আমার মহামায়াকে রেখে গিয়েছ!"

বিশ্বেশ্বরের মন বড় চঞ্চল হইল। তিনি আর তিলমাত্র বৈবাহিক-গৃহে বিলম্ব করিতে পারিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু এ কি! তাঁহার পুত্রবধূ মহামায়া তো তাঁহার গৃহেই রহিয়াছেন! তবে তিনি এ কি দেখিলেন—কি শুনিলেন! বিশ্বেশ্বর প্রহেলিকার মীমাংসা করিতে পারিলেন না!

তিনি বাষ্পাকুল কণ্ঠে আপন মনে কহিলেন,—"আমি নিতান্তই দুর্ভাগ্য! সদানন্দ, তুমিই প্রকৃত ভক্ত! তোমার অনুষ্ঠানই প্রকৃত অনুষ্ঠান! তোমার অনুষ্ঠানে ভক্তি প্রীতি একাগ্রতা আকুলতা আছে; তোমার অনুষ্ঠান পুণ্যপূত দিব্যভাবে মণ্ডিত। আর আমাদের অনুষ্ঠান কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ কপটতাময়। তাই মা মহামায়া আজি স্বয়ং তোমার কন্যারূপে আবির্ভূতা। তুমি একমনে এক প্রাণে ডাকিতে পারিয়াছ; তাই না আজি তোমার গৃহে অন্নপূর্ণা-রূপে অধিষ্ঠিতা। আর আমায় কিছু বুঝাতে হবে না। তোমার গৃহে আজ পদার্পণ ক'রে, আমার দিব্যচক্ষু খুলে গেল। আমি সত্যই দেখ্‌তে পাচ্চি, জগন্মাতা আজ কন্যারূপে আসিয়া তোমার গৃহ উজ্জ্বল করেছেন। আবার বলি—ধন্য সদানন্দ—তুমিই ধন্য; তোমার পূজাই প্রকৃত পূজা; তোমার আবাহনই প্রকৃত আবাহন। কত দিনে তোমার মত ভক্তি পাবো, সদানন্দ? কত দিনে উদ্ধার হবো!"

বাটোয়াড়া ।

হরিহরপুরের মিত্র-বংশের বিষয়-বাটোয়ারা-ব্যাপার, বোধ হয়, অনেকেই এখনও অবগত নহেন। সকল সংসারেই বিষয়-বিভাগ লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ বাধে। সুতরাং ঘটনাটি সকলেই একবার শুনিয়া রাখুন। সময়ে উপকারে আসিলেও আসিতে পারে।

(১)

দীননাথ ও হরনাথ দুই সহোদর ভাই ; শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। উত্তরাধিকার-সূত্রে পৈতৃক চিরসঞ্চিত দারিদ্র্যেরই একমাত্র অধিকারী হইয়াছিলেন।

দীননাথ চিন্তাশীল ও অধ্যবসায়ী। আপনাদের দৈন্যের কথা ভাবিয়া, কনিষ্ঠ হরনাথের বিষণ্ণ মুখ পানে তাকাইয়া, দীননাথের প্রাণ যতই ব্যাকুল হইত ; সংসারের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য, তিনি ততই আগ্রহান্বিত হইতেন। বহু চেষ্টায়, দীননাথ সুদূর মালদহ-জেলায় একটী সামান্য চাকরী যোগাড় করিয়া লন।

সেই চাকরীই তাঁহাদের লক্ষ্মী। সেই চাকরী হইতেই তাঁহাদের অদৃষ্ট-পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। বাটীর পর্ণকুটীর অট্টালিকায় পরিণত হয়। দুই ভ্রাতার বিবাহ হয়। সংসার দাস-দাসী আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ হয়। প্রভূত বিষয়-সম্পত্তি ও তেজারতী কারবার চলিতে থাকে। তাঁহারা বড়লোক বলিয়া পরিচিত হন। এ সকল কথা, সম্ভবতঃ সকলেরই জানা আছে।

দীননাথের কোনও সন্তান-সন্ততি হয় নাই। কনিষ্ঠ হরনাথের পুত্রকন্যাদিগকে লইয়াই, তিনি সে সুখ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু দীননাথের স্ত্রী ক্ষেত্রমণি সে বিষয়ে সদাই ঈর্ষাপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার স্বামী বিদেশে থাকিয়া মাসে প্রায় সহস্রাধিক টাকা উপার্জ্জন করেন, আর হরনাথ ও তাঁহার পোষ্যবর্গ বসিয়া তাহা ভোগদখল করেন; ক্ষেত্রমণির তাহা সহ্য হইবে কেন? তিনি সুযোগ পাইলেই স্বামীকে তাই বুঝাইতেন,—"পরের জন্য কেন তুমি খাটিয়া মর? এখনও লোক চিনিলে না! এখনও সতর্ক হও।"

(২)

পূজার সময় দীননাথ বাড়ী আসিলেন। ক্ষেত্রমণি আবার সেই পুরাতন কথাই নূতন করিয়া তুলিলেন; কহিলেন,—"দেখ, আমাদের তো ছেলেপিলে নেই; আর বিদেশে পড়ে থাকা কেন? ভগবান আমাদের যা দিয়াছেন, দু'হাতে বিলালেও তা ফুরাতে পাব না। দু'টি উদরের আবার ভাবনা? তুমি এমন পণ্ডিত

এমন বুদ্ধিমান হয়ে যে এই মোটা কথা দুটি বুঝ্‌তে পার না, সে আমারই পোড়া-কপালের দোষ। যাদের জন্য বিদেশে খেটে মর্‌ছ, তারা যদি মানুষের মত হ'ত, দেবতুল্য মহাপুরুষ তুমি, তোমায় যদি তারা চিন্‌তে পার্‌ত, তবে আর ভাবনা কি ছিল? তারা তো মানুষ নয়—শয়তানের অবতার! তারা কি তোমার দুঃখ বোঝে—না, তোমার ভাবনা ভাবে? বরং তুমি কিসে অপদস্থ হও, তাই তাদের সদাই চেষ্টা।"

এইরূপ নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিমায়, ক্ষেত্রমণি স্বামীর কর্ণে বিষ-বর্ষণ করিলেন।

যখনই বাড়ী আসেন, তখনই সেই কথা! আর কি কোনও কথা নাই? কান ঝালা-পালা হল যে! কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, দীননাথ উত্তর করিলেন,—"ক্ষেত্রমণি! বুঝ্‌লাম, এ সংসারে কেউ কারো নয়। ভাই বল, আত্মীয় বল, সকলেই আপন নিয়ে ব্যস্ত। ভাল, ক্ষেত্রমণি, ভেব না; কালই আমি সে বন্দোবস্ত করব।"

স্বামীর মুখে অপ্রত্যাশিত আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া, ক্ষেত্রমণি আহ্লাদে আটখানা হইলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর যেন কি এক গর্ব্বভাব সঞ্চারিত হইল। ক্ষেত্রমণি, দীননাথের অধিকতর সমীপস্থা হইয়া, তাঁহার মুখপানে বঙ্কিমনয়নে সোহাগপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, যথাসম্ভব রসাল কণ্ঠস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"এত

দিনে ভগবান্ তোমায় সুমতি দিয়েছেন। তুমি স্বামী, তোমাকে কেহ তুচ্ছ কর্‌লে, কেহ তোমার প্রতি হিংসা কর্‌লে, আমার প্রাণে কি তা সহ্য হয়? কত জ্বালা, কত যাতনা, কত অপমান সয়েছি আমি;—একদিনে তোমায় কত বল্‌ব?"

ইহার পর ক্ষেত্রমণি মনে মনে কহিলেন,—"কাল হ'তে দেখ্‌ব, হরনাথই বা কেমন ক'রে এত নবাবী ফলায়, আর তার স্ত্রীরই বা এত বড়-মানসি চাল-চলন কোথায় থাকে?"

(৩)

রজনী প্রভাত হইল। ক্ষেত্রমণি ভাবিলেন—বহুদিনের পর আজ তাহার সুপ্রভাত!

প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর, দীননাথ পাড়ার কতিপয় প্রবীণ ব্যক্তিকে আপন গৃহে ডাকিয়া আনিলেন। সকলে সমবেত হইলে দীননাথ স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য-সহকারে বলিতে লাগিলেন,—"আপনারা জানেন, আমি কখনও কলহপ্রিয় নই। আজ আপনাদিকে যাহা বলিবার জন্য সমবেত করিয়াছি, তাহা শুনিয়া হয় তো আপনারা আপাততঃ বিস্মিত হইবেন। আপনারা সকলেই জানেন—হরনাথ আমার 'লক্ষ্মণ ভাই'। এমন ভাইয়ের সহিত আজ পৃথক হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এ সংবাদে আপনাদের বিস্মিত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আপনাদের নিকট সম্ভব বা অসম্ভব যাহাই হউক, হরনাথকে পৃথক করিয়া দিব—ইহা নিশ্চিত।"

দীননাথের মুখে পৃথক হইবার প্রস্তাব শুনিয়া, প্রতিবেশিমণ্ডলী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা অবশ্য কোনও প্রকাশ্য কারণ দেখিতে পাইলেন না সকলেই জানেন, দীননাথ জ্ঞানী ও বহুদর্শী, শান্তিপ্রিয় এবং ভ্রাতৃগতপ্রাণ। তাঁহারা ভাবিলেন—অবশ্য কোনও বিশেষ কারণ না ঘটিলে দীননাথের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনই সহসা হরনাথকে পৃথক করিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন নাই। তথাপি যেমন দস্তুর, সকলে দীননাথকে সঙ্কল্প-ত্যাগে অনুরোধ করিলেন।

দীননাথ বিনীতভাবে কহিলেন,—"আমায় ক্ষমা করিবেন। কোনও গুরুতর কারণ না থাকিলে, হরনাথকে কখনও পৃথক করিয়া দিতে চাহিতাম না।"

সকলে কহিলেন,—"আমরাও সেই কথাই ভাবিতেছি।"

মধ্যস্থতায় সমদর্শিতা দেখাইবার জন্য, কেহ কেহ হরনাথকেও সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখ বাপু হরনাথ! এ বিষয়ে তোমারও ক্ষোভ করিবার কিছুই নাই। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—এ তো শাস্ত্রেরই লিখন। আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। এ জন্য কিছু মনে করিও না।"

যাহা হউক, দীননাথ পুনর্ব্বার কহিলেন,—"আপনারা জানেন, আমাদের কোনও পৈতৃক সম্পত্তি ছিল না। হরনাথও জীবনে এক কপর্দ্দক উপার্জ্জন করে নাই। যত কিছু বিষয় সম্পত্তি,

সকলই আমার স্বোপার্জ্জিত। সুতরাং হরনাথ ন্যায়তঃ অংশ পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারে না।"

সকলে একবাক্যে কহিলেন,—"আপনি যাহা বলিলেন, সকলই সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। ভাগ-বণ্টন থাকিলে, মধ্যস্থতা করিবার আবশ্যক হয়। এখানে আমরা আর কি মধ্যস্থতা করিব?"

দীননাথ।—ভাগ বণ্টন না থাকিলেও, হরনাথ আমার ছোট ভাই, এক মায়ের সন্তান; তাকে একেবারে বঞ্চিত করা আমার ইচ্ছা নয়।

ক্ষেত্রমণি কবাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকলই শুনিতেছিলেন। স্বামীর মুখে শুভসূচনার আশাপ্রদ ভূমিকা শুনিয়া ক্ষেত্রমণির সর্ব্বাঙ্গে প্রতিলোমকূপে আনন্দের শতমুখ উৎস ছুটিতেছিল। কিন্তু দীননাথের শেষোক্ত বাক্যে তিনি যেন একটু ক্ষুব্ধ হইলেন।

হরনাথ নীরব নিশ্চল একপার্শ্বে দণ্ডায়মান। তাঁহার স্নেহসাগর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হঠাৎ ঈদৃশ ভাব-পরিবর্ত্তনে, হরনাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি দাদার কাছে এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, দাদা আমাদের প্রতি সকল স্নেহ-মমতা ভুলিয়া গেলেন! ভগবান্ জানেন—অজ্ঞানে যদি দাদার কাছে কোনও অপরাধ করিয়া থাকি! দাদা পৃথক করিয়া দিলে, গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট হইবে বলিয়া কি ভাবিতেছি? তাহা নহে। ভগবান অন্ধ-আতুরের অন্ন জুটাইয়া দিতেছেন; তাঁহার এই বিশাল রাজ্যে

এই কয়টি ক্ষুদ্র প্রাণীর কি আহার জুটিবে না? তবে অকারণে দাদার স্নেহ-ভালবাসায় বঞ্চিত হইলাম বলিয়া হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিয়াছে।"

ভাবিতে ভাবিতে হরনাথের চক্ষে অশ্রু সঞ্চারিত হইল। দীননাথ তাহা দেখিলেন। দেখিয়া, চকিতে চক্ষু ফিরাইলেন।

দীননাথ মধ্যস্থগণের উদ্দেশে পুনর্ব্বার কহিলেন,—"বলিয়াছি তো, হরনাথকে আমি এককালে বঞ্চিত করিব না। তবে আমার ইচ্ছানুসারে দুইটি অংশ নির্দ্দিষ্ট করিব। আমার অংশ আমার স্ত্রী বুঝিয়া লইবে, এবং হরনাথের অংশ হরনাথ পছন্দ করিয়া লইবে। যাঁহার যে অংশ ইচ্ছা, লইতে পারেন। ভরসা করি, ইহাতে কোনও পক্ষেরই আপত্তি হইবে না।"

সকলে "সাধু সাধু" বলিয়া দীননাথকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

দীননাথ পুনরায় সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— "আপনারা সকলে শুনুন, আমি এইরূপ অংশ ভাগ করিয়াছি। এক অংশে আমার দালান ইমারত দেশের সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি, অপর অংশে আমি স্বয়ং। এক্ষণে হরনাথ ও আমার স্ত্রী—কে কোন্ অংশ লইতে চাহেন ... জিজ্ঞাসা করুন।"

মধ্যস্থ ব্যা... এরূপ ব্যবস্থার বিষয় শুনিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হ... ভাবিলেন,—'হরনাথকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ক... চমৎকার কৌশল!'

ক্ষণেক পরে জনৈক চাকরাণীকে মধ্যে রাখিয়া, ক্ষেত্রমণি অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন,—"আমি সম্পত্তিই লইব।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই সঙ্গে-সঙ্গেই আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে হরনাথ কহিলেন,—"ভগবান্, তুমিই ধন্য। আমি যা চাই, তাই পাইয়াছি। আমি দাদাকে চাই; সম্পত্তি চাই না!"

হরনাথ আনন্দ উচ্ছ্বাসে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। দীননাথ, অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিয়া, অতি-কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিলেন।

(৪)

ক্ষেত্রমণি সমস্ত বুঝিয়া লইলেন; আর এক একবার বক্র-নয়নে হরনাথের স্ত্রীর প্রতি গরলময় কটাক্ষ-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সমস্ত জিনিস-পত্র বুঝিয়া লওয়া হইলে, ক্ষেত্রমণির আর এক অভিনব ভাবনা উপস্থিত হইল। কিন্তু এ ভাবনা, ক্ষেত্রমণিকে অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না।

হরনাথ স্ত্রীকে কহিলেন,—"এ বাটীর কোনও জিনিসেই অধিকার নাই। তোমার ও ছেলেদের ব্যবহার্য্য জিনিষ ও অলঙ্কার-পত্র সমস্ত, তোমার দিদির হাতে বুঝাইয়া দেও। ভাগে আমরা দাদাকে পাইয়াছি; যারা পাইয়াছি, কাহে আমাদের প্রয়োজন নাই।"

হরনাথের স্ত্রী সুরধুনী তাহাই করিল; ক্ষেত্রমণির ভাবনা দূর হইল।

হরনাথ ও তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যাগণ সহ নিজ-বাটী পরিত্যাগ

করিয়া, দীননাথ, জনৈক সম্পন্ন প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় লইলেন; পাঁচ সাত দিন তথায় থাকিয়া, পরিশেষে দীননাথ আপন কার্য্যস্থল মালদহ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মুদি, পসারী, গোয়ালা প্রভৃতিকে বলিয়া গেলেন,—"আমি কার্য্যস্থলে যাইয়া টাকা না পাঠান পর্য্যন্ত, তোমরা হরনাথকে ধারে জিনিষ পত্র যোগাইও। দেখ, হরনাথকে যেন কোনও কষ্টে ও অসুবিধায় না পড়িতে হয়।"

বলা বাহুল্য, দোকানী প্রভৃতিও অণুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, ধারে দ্রব্যাদি দিতে স্বীকৃত হইল। যাইবার সময়, হরনাথকেও বলিয়া গেলেন,—"ভাবিও না, ভাই! আমি শীঘ্রই টাকা পাঠাইব। আর একখানি নূতন বাড়ী প্রস্তুত করাইও। বাড়ীখানি যেন আয়তনে বড় ও দেখিতে সুরম্য হয়।"

হরনাথ অশ্রুসিক্ত নয়নে দাদার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া হরনাথ কহিলেন,—"দাদা, বউদিদির সহিত একবার দেখা করবেন না?"

দীননাথ কোনও উত্তর দিলেন না। হরনাথ পুনর্ব্বায় অনুরোধ করিলেন। দীননাথের তীব্র দৃষ্টি, আন্তরিক বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিল।

(৫)

কার্য্যস্থলে পৌঁছিয়া, যোগাড়-বন্দ করিয়া, দীননাথ প্রথমে চারি হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। হরনাথ অচিরে নদীতীরে এক

বৃহৎ বাটী পত্তন করিলেন। দীননাথ ক্রমশঃ আরও টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। ছয় মাস মধ্যে পূজার দালান ও সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত হইল। হরনাথ শুভদিনে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। মাস চতুষ্টয় মধ্যে, ভ্রাতৃবধূর ও বালক-বালিকাদিগের জন্য, দীননাথ, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ অলঙ্কার-পত্র পাঠাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে ক্ষেত্রমণির হৃদয়ে শত-লৌহশলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল।

আশ্বিনে অম্বিকা-পূজার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। দীননাথের আদেশক্রমে নূতন বাটীতে পূজার আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে ক্ষেত্রমণিও সাবেক বাড়ীতে পূজার অনুষ্ঠান করিতে বিরত হইলেন না। দীননাথ পূজার সময় বাড়ী আসিলেন। যথাকালে উভয় বাড়ীতে পূজা হইয়া গেল। দুই বাড়ীর পূজাই ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইল। দুই বাড়ীরই ব্যোম্, বন্দুক ও বাদ্য-বাজনার শব্দে কয়েক দিন কাণ ঝালাপালা হইয়াছিল।

পূজা গেল। কোজাগর গেল। দীননাথ স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন না বা তাঁহার কোনও সংবাদও লইলেন না। ক্ষেত্রমণি তখন ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে গরবিনী; তাঁহার মনে তখন অভিমানের ঝড় জোরে বহিতেছিল। সুতরাং ক্ষেত্রমণিও সেবার স্বামীর কোনও তত্ত্ব লইলেন না। ক্ষেত্রমণি ভাবিলেন,—"পুরুষের সঙ্কল্প কয় দিন? দু'দিন পরেই দেখিব—যে সেই।"

এক মাস কাল বাড়ী থাকিয়া, দীননাথ কার্যাস্থলে চলিয়া গেলেন। ক্ষেত্রমণি মনের রোষে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিলেন।

(৬)

বৎসরান্তে আবার দুর্গোৎসব আসিল। আবার দীননাথ বাড়ী আসিলেন। আবার এক বৎসর অতিবাহিত হইল। আবার দীননাথ কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। ক্ষেত্রমণি, সময়ের ব্যবধানে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেও, এবারও স্বামীর শরণাগত হইতে পারিলেন না। কতকটা অভিমান, কতকটা লজ্জা, কতকটা দুর্বুদ্ধি, তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল।

আবার বঙ্গে শারদীয় উৎসব। দুর্গা দুর্গতিনাশিনী মা, আবার দুর্গতি দূর করিতে আসিতেছেন।

বহু দিনের পর, স্ত্রী-পুত্র-ভ্রাতা-ভগ্নীর মুখ দেখিতে পাইবে ভাবিয়া, প্রবাসীর প্রাণ আনন্দভরে নাচিয়া উঠিল। কুলকামিনীগণ, আকুলনেত্রে প্রবাসগামী স্বামি-পুত্রের পথপানে চাহিয়া রহিল। বাটীর পাদবাহিনী তটিনীর বক্ষের উপর দিয়া কত তরণী কত যাত্রী লইয়া যাইতেছে; কৈ—তাহারা যাহাকে চায়, সে তো কৈ আসিল না! তাহারা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ঘরে গিয়াও স্থির থাকিতে পারিল না; আবার নদীতীরে ফিরিয়া আসিল। এইরূপ কত বার আনাগোনা করিতে লাগিল; কিন্তু কৈ, তাহাদের স্বামী-পুত্র তো কেহ আসিল না! অশান্তিময় চিন্তা ও আশা-নৈরাশ্যের

মধ্যে সন্ধ্যা আসিল ; ক্রমে রজনী গভীর হইতে গভীরতর হইল ; প্রবাসী স্বামী-পুত্রের নৌকা কৈ, এখনও তো ঘাটে আসিল না? অবশেষে রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আকুল মাতা-পত্নীর বদনে হাস্য-রেখা প্রস্ফুটিত হইল ; প্রভাতে প্রবাসী স্বামী পুত্রের নৌকা ঘাটে লাগিল।

ক্ষেত্রমণি দুই বৎসর সহ্য করিয়াছেন, দুই বৎসর অভিমানে কাটাইয়াছেন। কিন্তু আর কত দিন সহিবেন? ক্ষেত্রমণির মতি এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। এখন তিনি গর্ব্ব-অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। ধনৈশ্বর্য্য এখন তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। এবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—'দীননাথ দেশে আসিলেই তাঁহার শরণাগত হইবেন।' সেই স্থির করিয়াই, তিনি প্রতিদিন দীননাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্ষেত্রমণি প্রতিদিন দিন-গণনা করেন। কিন্তু দীননাথ তো কৈ আসিলেন না? ক্ষেত্রমণি প্রতিদিন নদীর ধারে নৌকার পানে তাকাইয়া থাকেন ; কিন্তু কৈ, দীননাথের নৌকা তো ঘাটে আসিয়া লাগিল না! ক্ষেত্রমণি দিন দিন অধিকতর ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন।

অন্যান্য বার দীননাথ পূজার চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বেই বাড়ী আসেন। এবার আসিতে আরও বিলম্ব হইল। ষষ্ঠীর দিন দ্বিপ্রহরে তিনি বাড়ী আসিলেন।

ক্ষেত্রমণিও প্রতীক্ষায় ছিলেন। স্বামীর আগমন-সংবাদ

শুনিয়াই, তিনি নূতন বাটীর অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার গর্ব্ব অভিমান বন্যার স্রোতে তৃণখণ্ডবৎ কোথায় ভাসিয়া গেল। যে গৃহে দীননাথ বিশ্রামার্থ উপবেশন করিয়া ছিলেন, ক্ষেত্রমণি সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর সকলেই তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিল।

ক্ষেত্রমণি, স্বামীর গৃহে উপস্থিত হইয়াই, স্বামীর চরণযুগল ধারণ করিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"আমার অপরাধ হইয়াছে। দাসীকে ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া নিজ হাতে বিষপান করিয়াছি। বিষের জ্বালায় প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে। তুমি স্বামি, গুরু, পরম দেবতা; ক্ষমা করিয়া চরণে স্থান দেও। আমি শপথ করিতেছি, তুমি যাহাদিগকে চাও, তুমি যাহাদিগকে ভালবাস, আমি তাহাদিগের দাসী হইয়া থাকিব। আমায় ক্ষমা কর।" ক্ষেত্রমণির অশ্রুজলে দীননাথের চরণযুগল ভাসিয়া গেল।

দীননাথ ব্যথিত হইলেন। তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইল। তিনি সহধর্ম্মিণীকে সাদর সম্ভাষণে সান্ত্বনা করিলেন। হরনাথ, বড়বৌকে পাইয়া, যেন হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন। সুরধুনী দিদিকে প্রণাম করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল। সংসারে আনন্দের অবধি রহিল না।

বাটোয়ারা বিফল হইয়া গেল। দুই সংসার এখন আবার এক হইয়া গিয়াছে। হরনাথের পুত্রকন্যাই এখন ক্ষেত্রমণির প্রাণ-সর্ব্বস্ব। হরিহরপুরের মিত্র-বংশে সুখ-স্বচ্ছন্দ উথলিয়া উঠিয়াছে।

• • •

প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ।

——:(*):——

(১)

মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত চা পান করিতে করিতে আমি বলিয়া উঠিলাম,—"যাই বলুন, নবীনাগণ যতই ভাল হউন না কেন, প্রাচীনাদের সঙ্গে তাহাদের কখনই তুলনা হইতে পারে না।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আমার এই ৫০ বৎসর বয়সে এ কথাটা শুন্‌তে ভাল লাগে বটে; কিন্তু আপনার মত অল্পবয়স্কের মুখে এ রকম কথা শোভা পায় না।"

"যাই বলুন, আমি নবীনাদের বড় ঘৃণা করি। তারা এত বাজে কথা কয় ও এমনভাবেই হাসে যে, তাদের কাছে থাকা বিড়ম্বনা হ'য়ে উঠে। কারুর মাথায় একটা শাদা চুল তাদের তীক্ষ্নদৃষ্টি এড়াতে পারে না। আর বৃদ্ধ লোকেদের বিষয় নিয়ে তারা এত হাসি ঠাট্টা করে যে, সহ্য করা ভার হয়।"

"কিন্তু নবীনায় আর প্রাচীনায় তফাৎ আছে, নলিনী বাবু!"

"তফাৎ ত আছেই,—অনেক তফাৎ! আমি বিশেষতঃ ১৬ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্কা রমণীদের ঘৃণা করি। তাঁরা বালিকার মত চপলা; কিন্তু বুদ্ধিতে পরিপক্কা নারীর মত। বালিকার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর নারীর রসিকতা, তাঁদের দুই আছে। তাঁদের বিবাহ হইয়া গেলে, তাঁরা বেশ সন্তুষ্ট ভাব অবলম্বন করেন; কিন্তু অনূঢ়া অবস্থায় তাঁদের হিংসা আর গর্ব্ব বড় ভয়ানক!"

"আপনি নবীনাদের বিষয়ে কুসংস্কারে পড়েছেন। যাক্, আমাদের এ কথা ছেড়ে দেন। আপনি আর নূতন কিছু লিখ্‌ছেন কি?"

একটু আগ্রহের সহিত আমি বলিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ, লিখ্‌ছি বৈ কি! আজ কাল আমি পদ্যরচনায় মনোনিবেশ করেছি। কিন্তু বড় সুবিধা করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। আমার একটু আধটু সাহায্যের দরকার হয়ে পড়েছে। পদ্যের ভাষায় আর ছন্দের বিশেষ উপদেশ দিতে পারে, এমন একজন লোকের বড় অভাব বোধ কাচ্ছি।"

"আচ্ছা, আপনি সুকুমারী দত্তের কবিতা পড়েছেন কি?"

"আজ্ঞে হাঁ। তাঁর কবিতা আমার বড় চমৎকার লাগে। তাঁকে জানেন কি?"

"না। তবে তিনি আমার একজন আত্মীয়ার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার মুখে আপনি কুমুদিনীর নাম বোধ হয় শুনেছেন!"

"হাঁ, অনেক বার শুনেছি।"

"সুকুমারী দত্ত—কুমুদিনীর একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার বিশ্বাস, যদি আমি আপনার কবিতাগুলি কুমুদিনীর কাছে পাঠিয়ে দিই, তা'হলে সে সুকুমারীকে দেখিয়ে তার মতামত সংগ্রহ কর্‌তে পারে।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জির কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। কারণ, সুকুমারী দত্তের ন্যায় খ্যাতনামা লেখিকার সাহায্য পাওয়া বড় কম সুবিধার কথা নহে।

আমি কহিলাম,—"আপনার এ প্রস্তাবে আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনি যদি আমার প্রস্তাব মত কাজ করেন, তা'হলে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ কর্‌বেন। আচ্ছা, সুকুমারী দত্ত বিবাহিতা—না 'অনূঢ়া'?"

"তিনি অনূঢ়া—এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই।"

"তাঁর প্রকৃতি কেমন জানেন?"

"সে সব বিষয়ে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নাই। আমি এই মাত্র জানি, তিনি কুমুদিনীর বন্ধু। আর তাঁর বই পড়ে সকলে যা জানে, আমিও তাই জানি।"

"তাঁর যৌবন-কালে বোধ হয় কোনও বিপদ আপদ ঘটে থাক্‌বে; কারণ, তাঁর কবিতাগুলি বড় করুণরসাত্মক।"

"তা নাও হতে পারে। আমি অনেককে জানি, যারা কখনও দুঃখ কাকে বলে জানে না; অথচ, তাদের লেখা অত্যন্ত করুণ

হৃদয়বিদারক। আবার যারা দুঃখে কষ্টে পড়ে সারাটা জীবন অতিবাহিত কচ্ছে, শোকের আর্ত্তনাদে যাদের বুক ভেঙ্গে গেছে,—তাদের লেখা ততটা মনে লাগে না। আমার বোধ হয়, আপনি যদি তাঁকে কখনও দেখেন, তো দেখবেন—তিনি একজন হাস্যময়ী বয়স্থা রমণী, সম্ভবতঃ বেশ সরলা। অথচ, তাঁর প্রেমের কবিতা-গুলি পড়লে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না।"

"কুমুদিনী কি ঐ রকম না কি?

"না—না, ছেলেবেলায় সে বেশ সুন্দরী ছিল। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। সে খুব শান্ত ছিল। এখন সে অথর্ব্ব হয়ে পড়েছে। আমি অনেক দিন তাকে দেখি-নি; কিন্তু চিঠি লেখা-লিখি বরাবরই চলেছে।"

(২)

অল্পক্ষণ পরেই আমি মিসেস্ ব্যানার্জ্জি নিকট বিদায় লইয়া নিজের নিভৃত কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। আমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই গতায়ু। আমি যদিও কোনও চাকরী করিতাম না, তথাপি সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকিতাম। নিজের জমীদারীর কাজ বড় কম নহে; তাহাতেই আমার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। তথাপি সাহিত্য-বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে পাই, এমন একজন সঙ্গীর অভাব বড়ই বোধ করিতাম। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি একজন বেশ আমোদপ্রিয়া প্রৌঢ়া রমণী; কিন্তু তেমন চালাক চতুর বা

বিদুষী নহেন। প্রতিবেশীদের আর সংসারের কথা ছাড়িয়া সাহিত্য-বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিলে, তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন এবং নীরব থাকিতেন।

আমার বিষয়-সম্পত্তি থাকায় আমি অনেক কন্যার পিতার লক্ষ্যস্থানীয় হইয়াছিলাম ; কিন্তু নবীনাদের উপর আমার ঘৃণাবশতঃ আমার এই ৩০ বৎসর বয়সেও বিবাহ হয় নাই। আমার এই বিরক্তির অবশ্য একটা খুব গুরুতর কারণও ছিল। সামাজিক কুসংস্কার আমাদের সংসারে বড় একটা স্থান পায় নাই। আমার পিতা একজন স্বাধীনচেতা ও সংস্কারক দলের নেতা ছিলেন। সুতরাং আমার বিবাহের সম্বন্ধ আসায়, তিনি সমাজ-ধর্ম্মের মুখাপেক্ষী না হইয়া, এক ষোড়শী সুন্দরীর সহিত আমাকে পরিচিত করাইয়া দেন।

পাশ্চাত্য 'কোর্টসিপ' প্রথায় আমাদের মনের মিলন হইলে আমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইব, এইরূপ স্থির থাকে। কিন্তু সে সুন্দরী আপনার সৌন্দর্য্যের গরবে ও বিদ্যার গরবে এতই গরবিনী ছিল যে, সে আমায় প্রায়ই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিত! আমিই বা তাহা সহিব কেন? আমার কিসের অভাব? আমার অর্থ অমন অনেক সুন্দরীকে কিনিতে পারে। অল্প দিন পরেই পিতার মৃত্যু হইল। সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইয়া আমি সে সুন্দরীকে উপেক্ষা করিলাম। তার পর সে যে কোথায় গেল, কি করিল, সাত আট

বৎসর তার আর কোনই খোঁজ-খবর লই নাই। ইহার পর আরও দুই এক জনের সহিত এইরূপে প্রেম-বিনিময়ের প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কিন্তু সেই যুবতীরা সকলেই আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সেই হইতে আমার একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য-চর্চ্চা, আর তাহাতেই আমি অত্যন্ত আনন্দ পাইতাম। সেই হইতে আমার ঘৃণা—রমণীদের ঐ বয়সের প্রতি।

(৩)

আমার জীবনে একটু নূতনত্ব আসিয়াছে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাঁহার কথা-মত আমার কবিতাগুলি কুমুদিনীর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তিনি সেইগুলি সুকুমারী দত্তকে দেখাইয়াছিলেন। সেই অবধি এই খ্যাতনামা লেখিকার সঙ্গে অনেক পত্রালাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

তাঁর চিঠিগুলি আমার বড় চমৎকার লাগে এবং যদিও এ পর্য্যন্ত আমি তাঁকে দেখি-নি, তবু তাঁকে আমার একজন নিকট বন্ধু বলে মনে করি। এরূপ একজন প্রতিভাসম্পন্না লেখিকার বয়স অনেক হইলেও তাঁহার হৃদয় যে কতদূর নবীনতায় পূর্ণ, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি আমাকে অনেক উৎসাহ দিয়াছেন এবং সাহায্যও করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষকতায় আমি নবীন কবিদের মধ্যে একজন গণ্যমান্য হইতে চলিয়াছি।

আমাদের চিঠিতে যে সাহিত্যের কথাই থাকিত, এমন নহে;

আমরা সব বিষয়ে লেখালিখি করিতাম। যা সকলকে বিশ্বাস করে বলা যায় না, এমন অনেক ঘরের কথা তাঁকে লিখে-ছিলাম। এ বিষয়ে সুকুমারী আমার হৃদয়ের শূন্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

সুকুমারীর পত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি তাঁহার পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর হইতে নিজ-গৃহে একাকিনী বাস করিতে-ছেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ভাল নহে বলিয়া তাঁহার বন্ধুগণ একজন সঙ্গিনী নিযুক্ত করিতে বলেন; কিন্তু তিনি বলেন, তিনি বরং একাকিনী থাকিবেন এবং চসমা ব্যবহার করিবেন, তথাপি একজন অপরিচিতা সহচরীর সঙ্গ গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার দুইটি ভ্রাতা ছিল; তাঁহারা এক্ষণে গতায়ু। তাঁহার এক বিধবা ভগিনী বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার ভগিনীর পুত্রকন্যাগণ তাঁহার জীবনের একটা অবলম্বন। তথাপি তিনি পৃথকভাবে আপন গৃহে একাকিনী থাকিতেই ভালবাসিতেন।

তিনি বিবাহ করেন নাই বলিয়া আমি দুঃখ করিতাম। কারণ, আমার মতে বিবাহিত জীবনই নারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর। তাঁহার বয়সের বিষয়ে কথাগুলি বড় আনন্দজনক। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"লোকে আমাকে বয়স্থা বলে বটে; কিন্তু আমি ত আমাকে তা দেখি না।" সংক্ষেপতঃ, তাঁহাকে না দেখিলেও, আমি বুঝিয়াছিলাম—সুকুমারী বড় চমৎকার রমণী।

(৪)

আমি একটু বিশেষ ভাবনায় পড়িয়াছি। সেদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির গৃহে চা-পান করিতেছিলাম। এমন সময় তিনি বলিলেন,—"নলিনী বাবু, আজ কুমুদিনীর একখান চিঠি পেয়েছি। তাতে সুকুমারীর একটু দুঃসংবাদ আছে।"

আমি একটু উদ্বিগ্নভাবে বলিয়া উঠিলাম—"এঁ্যা, কি হয়েছে! প্রায় সপ্তাহ-খানেক আমি তাঁর চিঠি পাই নাই।"

"সে লিখেছে যে, সুকুমারী উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পিতৃধন পাইয়াছিলেন। বই-টই লিখিয়াও কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে ব্যাঙ্কে ঐ টাকা রাখিয়াছিলেন, সেই ব্যাঙ্কটি ফেল হইয়া গিয়াছে এবং তিনি উপস্থিত কপর্দ্দকশূন্য। তাঁর বিধবা ভগ্নীরও এইরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে; অতএব তাঁর নিকটও কোনও সাহায্য পাইবার আশা নাই। কুমুদিনী লিখিয়াছে,—সুকুমারী এই আঘাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন।

আমি মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলাম—"ওঃ, বড় ভয়ানক ত!"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বলিতে লাগিলেন—"গল্প-টল্প লিখে আজকাল বেশী উপার্জ্জন করা যায় না। কুমুদিনী লিখেছে,—সুকুমারী বই-টই লিখে যা পান, তাতে তাঁর চল্‌তে পারে না; বাধ্য হয়ে তাঁকে অন্য উপায় অবলম্বন কর্‌তে হবে। কিন্তু কি উপায় যে আছে,

তা ত ভেবে ঠিক করা যায় না। তিনি বরাবরই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে এসেছেন। আর এই বয়সে তাঁকে কাজে ঢুকতে হবে—শুধু জীবিকার জন্য—কি ভীষণ!"

"ভীষণ! ভীষণ ত বটেই! বিশেষতঃ সুকুমারী দত্তের মত একজন প্রতিভাসম্পন্না রমণীর পক্ষে অতি ভীষণ!"

আমার মাথায় একটি অদ্ভুত খেয়ালের উদয় হওয়ায় আমি শীঘ্রই মিসেস্ ব্যানার্জির ওখান হইতে উঠিয়া পড়িলাম।

সুকুমারী তাঁহার পত্রে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন,—তাঁর শরীরটা কিছু দুর্বল, আর তাঁর দৃষ্টিশক্তিও দিন দিন হ্রাস পাইতেছিল। একজন ভগ্নস্বাস্থ্য ক্ষীণ-দৃষ্টি বয়স্থা রমণী যে এই ভীষণ সংসার-সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু যাইবেন, ইহা আমার পক্ষে অসহ্য হইল; বিশেষতঃ, তাঁকে রক্ষা করিতে যখন সম্পূর্ণ সক্ষম। যে কোনও রমণীর পক্ষেই এরূপ বিপদ অতি ভীষণ; সুকুমারীর ন্যায় কোমল-হৃদয়া শান্তপ্রকৃতি রমণীর পক্ষে এ বিপদ ভীষণতর।

ভাবিলাম, তাঁকে আমার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে লিখি না কেন? জগতের লোকে হয় তো আমাকে মূর্খ বলিয়া উপহাস করিবে! কিন্তু জগতের লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? তাঁহার পুস্তক পাঠে আমি তাঁহার হৃদয়টি বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার মতে, তাঁহার হৃদয় অতি সত্যনিষ্ঠ, কোমল এবং পবিত্র। তা তাঁর বয়স যদি একটু বেশী

হয়, তাতে আমার ক্ষতি কি! গোলাপী গণ্ড, কৃষ্ণকুন্তলরাজি, আর যত কিছু যুবতীগণের গর্ব্বের বিষয়, সে সব আমি বড় ঘৃণা করি। রমণীতে আমি যে যে গুণ চাই—পবিত্রতা আর কোমলতা, তা তো সুকুমারীর আছে! অতএব, আমি সুকুমারীকে লিখিব—আমাদের উভয়ের বয়সের বিষয়ে লক্ষ্য না করেন এবং বিবাহে মত দেন।

(৫)

আমি সুকুমারীকে পত্র লিখিয়াছিলাম। এইমাত্র তাহার উত্তর পাইলাম,—

"প্রিয়তম বন্ধুবরেষু —

"আপনি আমার প্রতি কি সদয়! আমার মনে হয়, আপনার সহৃদয়তা-হেতু আপনার উপর একটা সুবিধা গ্রহণ করা আমার উচিত নয়। আপনি যে রমণীকে কখনও দেখেন নাই, কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকেই জীবনের সঙ্গিনী করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু আপনার প্রস্তাবে অসম্মত হইতে হইলে, আমার পক্ষে এ আত্মত্যাগ কিছু আতিরিক্ত হইয়া পড়ে।

"আমি একাকিনী, এ জগতে আমার বলিতে কেহই নাই; আমাকে ভালবাসে এবং আমার ভার গ্রহণ করে, এরূপ একজন লোকের বড় অভাব বোধ করিতেছি। আমি অনেক দিন একাকিনী আছি; আর এরূপ-ভাবে জীবন যাপন করিতে

পারিতেছি না। সেইজন্য আমি আপনার কথায় সম্মত হইলাম। এবং আপনাকে আমার যথাসাধ্য সুখী করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।

"আমাদের বয়সের পার্থক্য বিষয়ে আপনি যা লিখিয়াছেন এবং যে চমৎকারভাবে লিখিয়াছেন, তা ছাড়া আমি আর কি লিখিব! আপনার বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ; আপনি ত এখনও যুবা। পুরুষের পক্ষে ৩৫ তো যৌবনকাল! মেয়েদের পক্ষে যতই হউক না কেন! আর আমার—! যাক, ও সব কথায় কাজ কি!

"আমি যদি আমার কবিতার মত প্রীতিপ্রদ হই এবং আপনি যদি আপনার পত্রের মত সহৃদয় হন, তাহ'লে বয়সের তারতম্য কি আর আমাদের সুখের অন্তরায় হইবে! ইতি—

আপনার সুকুমারী।"

(৬)

আমার জীবনে আজ বিশেষ দিন। পূর্ব্বের ব্যবস্থা মত আমি আমার গাড়ী করিয়া সুকুমারীকে ট্রেণ হইতে বাসায় আনিবার জন্য ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ট্রেণ যথাসময়ে প্লাটফর্ম্মে আসিয়া লাগিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, একজন বৃদ্ধা ফিরিওয়ালী, একটি অবগুণ্ঠনবতী সুসজ্জিতা যুবতী এবং দুই জন পুরুষ ব্যতীত আর কেহই গাড়ী হইতে নামিলেন না। আমি সুকুমারীকে বাহির করিবার জন্য গাড়ীর প্রত্যেক কামরা খুঁজিলাম, কিন্তু সেরূপ কোনও প্রৌঢ়া রমণীকে দেখিলাম না।

ট্রেণ ছাড়িয়া গেলে আমি প্লাটফর্ম্মের উপর বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম। এমন সময় সেই সুসাজ্জিতা যুবতীটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার নাম কি নলিনীরঞ্জন বোস?" যুবতী তখনও অবগুণ্ঠনবতী।

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ। আপনার কি কোনও দরকার আছে?"

তিনি বলিলেন,—"আমি সুকুমারী দত্ত।"

মুহূর্ত্তের জন্য আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। তার পর বলিয়া উঠিলাম,—"আপনি যে বলিয়াছিলেন, আপনার বয়স হইয়াছে।"

তা তো বটেই! আমার বয়স ২৫ বৎসর। আমি কিছু রোগা ব'লেই আমাকে ছোট দেখায়।"

আমি কোনও রকমে চিত্ত স্থির করিয়া তাঁহার মাল-পত্রাদি লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ গাড়ী কার? মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নাকি?"

আমি উত্তর দিলাম,—"আমারই।"

এবার তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ভাবে বলিলেন,—"আমি জীবনে কখনও এত আশ্চর্য্য হই নাই! আমি জানিতাম,—আপনার আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে।"

আমি বলিলাম,—"আমিও কখনও এত আশ্চর্য্য হই নাই! আমি জানিতাম,—আপনি একজন প্রৌঢ়া রমণী।"

অতঃপর আমরা দুই জনেই খুব হাসিয়া উঠিলাম! তাঁর হাসিটি কি চমৎকার!

(৭)

সুকুমারীকে বলিলাম,—"দেখ সুকু, আমার প্রতিজ্ঞা আর বজায় রাখিতে পারিলাম না! আমি একজন প্রৌঢ়াকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম।"

সুকুমারী।—আমিও একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। অতএব, আমাদের কাহারও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা আর বজায় রহিল না!"

আমি বলিলাম,—"আমার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রৌঢ়ার সহিত বিবাহ-প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করি।"

"আমিও সেই দরিদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হই।"

"দেখ সুকু, ধনীর খাতিরে একজন দরিদ্রকে ত্যাগ করা বড় লজ্জার কথা।"

সুকুমারী যুবতীজনসুলভ হাসির সহিত বলিল,—"একজন বয়স্থা রমণীকে ত্যাগ করিয়া একজন যুবতীকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে আরও লজ্জাজনক।"

আমি একটু সঙ্কোচের সহিত কহিলাম,—"না সুকু, প্রাচীনারা যতই ভাল হউন না কেন, নবীনাদের সঙ্গে কি তাঁদের তুলনা হয়?"

সুকুমারী গম্ভীর স্বরে কহিল,—"তোমার ২৫ বৎসর বয়সেও আমি যুবতী হইতে পারি; কিন্তু আমি এখন তা মনে করি না।"

"কিন্তু আমার মতে তাই। আচ্ছা সুকু! আজ আমরা কত সুখী?"

সুকুমারীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলাম। সুকুমারীর গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

আমি কহিলাম,—"সুকু! কাঁদিও না। দোষ তোমারও নয়; দোষ আমারও নয়। দোষ—'কোর্টসিপ' প্রথার। পিতা যদি একেবারে আমাদিগকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিতেন, সে বন্ধন নিশ্চয়ই ছিন্ন করিতে পারিতাম না! চপলচিত্ত যুবক-যুবতীকে স্বাধীনতা দেওয়ায়, তাহাদের স্বেচ্ছাচারের যে বিষময় ফল, তাহাই আমরা এতদিন ভোগ করিলাম।"

অভাবে।

—:(*):—

(১)

উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিতী করিতেন। গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। স্কুলের ছাত্রেরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিত এবং তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর সকলেই প্রশংসা করিতেন।

উমেশচন্দ্র ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের জন্য অনেকেই তাঁহার বাধ্য ছিল। স্কুলে হেড পণ্ডিতী করিয়া তিনি ২০৲ টাকা বেতন পাইতেন। ইহা ব্যতীত 'প্রাইভেট টুইসন' করিয়া আরও ৭।৮ টাকা পাইতেন। গ্রামের মধ্যে একটী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মেটে বাড়ী ও তৎসংলগ্ন এক বিঘা জমি তাঁহার পৈত্রিক ভদ্রাসন। বাটীর পার্শ্বে দুই ঘর গোয়ালা প্রজা ছিল; তাহাদের উভয়েরই মৌরস স্বত্ব; সুতরাং খাজনা বাবত ও যৎকিঞ্চিৎ পাইতেন। সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার আয় মাসিক ৩০৲ টাকার বেশী ছিল না। কিন্তু অল্প আয় হইলেও তাঁহার সংসার বেশ চলিয়া যাইত।

সংসারে ভার্য্যা দুর্গাসুন্দরী, একাদশ বর্ষীয়া কন্যা সরস্বতী ও অষ্টম বর্ষের পুত্র মন্মথনাথ ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

উমেশচন্দ্রের বয়স আনুমানিক চল্লিশ বৎসর হইবে। তিনি সর্ব্বদাই হাস্যবদন। ভার্য্যা দুর্গাসুন্দরী বড় বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তাঁহার সুবন্দোবস্তে সংসারে কোনও অভাব বোধ হইত না। সম্প্রতি কন্যা বয়স্থা হওয়ায় উমেচন্দ্র কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহ দিতে হইলে কিছু ব্যয় আবশ্যক। তাঁহার মাসিক যাহা আয় ছিল, সংসার-খরচে সমস্তই ব্যয়িত হইত। কিছু সংস্থান করিতে পারেন নাই; সুতরাং কেমন করিয়া কন্যার বিবাহ দিবেন, সেই চিন্তায় তিনি মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল হইতেন। তবে কন্যা রূপগুণযুক্তা; সুতরাং উমেশচন্দ্রের বেশ ভরসা ছিল যে, অবশ্যই তাহার একটি সুপাত্র জুটিবে।

হরিদাস মুখুয্যে গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁহার বেশ সঙ্গতিও ছিল। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে মান্য করিতেন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার প্রবল প্রতাপ ছিল ও গ্রামস্থ স্কুলটী তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত। হরিদাস বাবু উমেশচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি একদিন উমেশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি সৎপাত্রের অনুসন্ধান কর, খরচের জন্য আটকাইবে না।" হরিদাস বাবু মনে করিলে পাঁচটা মেয়ের বিবাহ দিয়া দিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার কথায় উমেশচন্দ্র বিশেষ আশ্বাসিত হইয়াছিলেন।

(২)

রামকান্ত চাটুয্যে বহুদিন হইতে গ্রামে "এক ঘরে" হইয়া আছেন। তাঁহার দোষ গুরুতর ছিল। গ্রামের সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'পতিত' করিয়াছিলেন। সম্প্রতি হরিদাস বাবুর কন্যার বিবাহ হইবে। হরিদাস বাবুর ইচ্ছা, এই উপলক্ষে তাঁহাকে সমাজে উঠাইয়া লইবেন। যখন রামকান্তকে সমাজচ্যুত করা হয়, তখন হরিদাস বাবুই একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। রামকান্তেরও অপরাধ ছিল; সুতরাং তখন সকলেই হরিদাস বাবুর কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে হরিদাস বাবু তাঁহাকে যখন পুনরায় সমাজে চালাইবার সঙ্কল্প করিলেন, তখন গ্রামের অনেকে আপত্তি জানাইল। অনেকেই বলিল যে, রামকান্ত যদি স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে, এবং পাঁচ জনে মিলিয়া যে শাস্তির বিধান দিবে, তাহা যদি মানিয়া লয়, তাহা হইলেই তাহাকে পুনরায় সমাজে লওয়া হইবে; নচেৎ নহে। হরিদাস বাবু তাঁহাদের কথায় চটিয়া উঠিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কোনও কথা বলিলেন না। সম্প্রতি রামকান্তের দ্বারা হরিদাস বাবু বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার জেদ হইয়াছিল যে, যে কোনও প্রকারে হউক, তিনি স্বীয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রামকান্তকে সমাজে উঠাইয়া লইবেন। তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়-- এমন সাহস গ্রামের কয় জনের আছে!

যথাসময়ে হরিদাস বাবুর কন্যার বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে বসিয়া দেখিলেন, রামকান্ত তাঁহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়াছে। তাহাতে অনেকে চটিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—হরিদাস বাবু সমাজকে এত সহজে অবজ্ঞা করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই উঠিয়া পড়িলেন। উমেশচন্দ্র সেই পংক্তিতে বসিয়াছিলেন; কাজে কাজেই তাঁহাকেও অধিকাংশের পথ অবলম্বন করিতে হইল। হরিদাস বাবু ব্যাপার দেখিয়া করযোড়ে ব্রাহ্মণদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; রামকান্তকে উঠাইয়া অন্যত্র বসাইলেন। গোলমাল চুকিয়া গেল; কিন্তু হরিদাস বাবুর মনে তীব্র প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। তবে কেহই তাঁহার এক চালে বাস করেন না। তিনি কাহার কি করিতে পারেন! ফলে একজনের কপাল ভাঙ্গিল।

হরিদাস বাবুর অধীনে উমেশচন্দ্র চাকরি করেন। এই ব্যাপারে কেবল তাঁহারই সর্ব্বনাশ হইল। এই ঘটনার এক মাস পরে হরিদাস বাবু সামান্য একটু ছুতা ধরিয়া উমেশচন্দ্রকে স্কুলের কার্য্য হইতে জবাব দিলেন। উমেশচন্দ্রের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায় চলিয়া গেল। তিনি দারুণ কষ্টে নিপতিত হইলেন।

(৩)

চাকরির সঙ্গে সঙ্গে ছেলে পড়ানর কার্য্যগুলি একটী একটী করিয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং এখন হইতে উমেশচন্দ্রের কষ্টের

দিন আসিল। জমিজমা এমন কিছু ছিল না, যাহার আয়ে দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের যোগাড় হইতে পারে। উমেশচন্দ্র ভাবিয়া অস্থির হইলেন। যখন স্ত্রী-পুত্র ও কন্যার মুখের দিকে দেখেন, তখন উমেশচন্দ্র ভাবিয়া আকুল হ'ন। কন্যা বিবাহের উপযুক্তা। কেমন করিয়া তাহাকে পাত্রস্থ করিবেন? উমেশচন্দ্র এই সব চিন্তা করিয়া বিপদের কূলকিনারা দেখিতে পান না। তাঁহার স্ত্রী দুর্গাসুন্দরী অকস্মাৎ এই সাংসারিক বিপদে হতবুদ্ধি হইলেন।

উমেশচন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়া একটী মুদির দোকানে খাতা লিখিবার কার্য্য পাইলেন। তাহাতে পারিশ্রমিক মাসিক ২৲ টাকা পাইতেন। রাত্রি বা দিনের মধ্যে কোনও সময়ে ২।৩ ঘণ্টা কাল খাতা লিখিতে হইত। বক্রী সময় বিবাহের ঘটকালি করিয়া কিছু উপায় করিবার মানসে তিনি এ-গ্রাম ও-গ্রাম যাতায়াত করিতেন। দুর্গাসুন্দরী সংসারের কার্য্য করিয়া অবকাশ পাইলেই চরকা কাটিয়া সংসারের সাহায্য করিতে প্রয়াস পাইতেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক ৪৲।৫৲ টাকার বেশী আয় হইত না। পুত্রকন্যার কোনও প্রকারে দুই বেলা অন্ন জোগাইয়া স্বামী-স্ত্রীতে প্রায় অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেন।

অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উমেশচন্দ্রের গ্রামে প্রতিপত্তিও কমিয়া আসিল। গ্রামের সর্ব্বসাধারণের নিকট উমেশচন্দ্রের সে সম্মান

ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল। তিনি পাছে ঋণ বা সাহায্য প্রার্থনা করেন, এই ভয়ে গ্রামস্থ বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে দেখিলে প্রায়ই পাশ কাটাইতেন। দুই একজন তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলেও সাহায্য করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না।

এই বিপদের সময় কেবলমাত্র গ্রামের একটী লোক তাঁহার দুঃখে প্রকৃত দুঃখিত হইয়াছিল এবং যথাসাধ্য তাঁহার কষ্ট দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিত। সে তাঁহার একজন গরীব প্রজা—নবকুমার ঘোষ। নবকুমার জাতিতে পল্লব গোপ। সে ছাপোষা লোক; চাষ বাস করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহার সাহায্য করিবার বেশী সামর্থ্য ছিল না। তবু মাঝে মাঝে ক্ষেত হইতে তরিতরকারি ও সময় সময় গাইএর দুধ দিয়া যাইত।

দুর্গাসুন্দরী বলিতেন,—"নব, আর জন্মে তুই আমাদের কে ছিলি! এ বিপদে তুই আমাদের যা কর্‌লি, যদি পরমেশ্বর কখনও দিন দেন, তবে এই ঋণ পরিশোধ কর্‌ব।"

নব বলিত,—"মা ঠাক্‌রুণ, ঈশ্বর করুন, বাবার একটী কর্ম্ম হউক; এ কষ্ট চিরদিন থাক্‌বে না।"

কিন্তু উমেশচন্দ্রের সংসারে খাইতে চারিটী; সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ও পরিধানের বস্ত্রের জন্য তাঁহাকে একটী একটী করিয়া তৈজসপত্র বিক্রয় করিতে হইল।

(৪)

ক্রমে মাথার উপর দিয়া দারুণ বর্ষা চলিয়া গেল। ঘরের চালগুলি অনেক দিন ছাওয়ান হয় নাই। মাঝে মাঝে খড় গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে জল আটকায় নাই। সমস্ত বর্ষায় চাল ভেদ করিয়া জল পড়িয়াছে। উমেশচন্দ্র শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া, একবেলা খাইয়া কোনপ্রকারে স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার শরীর ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। সংসার অচল হইয়া উঠিয়াছে।

কন্যা সরস্বতী পিতামাতার দুঃখ বেশ অনুভব করে। সে বড় বুদ্ধিমতী। যখন দেখে—ঘরে চাউল নাই, কি করিয়া তাহাদিগকে এক মুঠা অন্ন দিবেন এই ভাবিয়া সে আকুল, সে তখন অসুখের ভাণ করিয়া মাকে বলে,—"মা, আমার আজ বড় অসুখ করেছে, আমি আজ কিছু খাব না।"

পিতার চাকরি যাওয়ার পর মন্মথনাথকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সে বাটীতে বসিয়া নিজের চেষ্টায় পিতার সাহায্যে পড়া শুনা করিত। কিন্তু ইদানীং পিতার মানসিক অবস্থা এত চঞ্চল ছিল যে, তিনি মন স্থির করিয়া দুই দণ্ড তাহাকে পড়া বলিয়া দিবার অবকাশ পাইতেন না।

চাউল অভাবে বাড়ীতে যখন সকলে উপবাসে কাটাইয়াছে ও মন্মথ গাছের কাঁচা পেয়ারা খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছে, নব ঘোষ

মাঠ হইতে সন্ধ্যার সময় আসিয়া, তখনই এক বাটী দুধ ও মুড়ি লইয়া মন্মথ ও সরস্বতীকে খাইতে দিয়াছে। নবর অন্তঃকরণ থাকিলেও তাহার সামর্থ্যের অভাব ছিল। সুতরাং ক্রমশঃ উমেশচন্দ্রের দিন চলা দায় হইয়া উঠিল।

ঘড়া ঘটি প্রভৃতি তৈজসপত্র একটী একটী করিয়া বিক্রয় করিয়া ৮ মাস কাল চালাইয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না।

উমেশচন্দ্র মাঝে মাঝে ঘটকালি করিতে বিদেশে যাইতেন। কিন্তু তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটকালি করেন নাই; সুতরাং তাহাতে কোনও উপায়ই হইত না। কখনও কখনও বিবাহ বাটীতে 'উপস্থিত ব্রাহ্মণ' বলিয়া কিছু কিছু বিদায় পাইতেন মাত্র।

ক্রমে পূজার সময় আসিল। প্রতি বৎসর পূজার সময় উমেশচন্দ্র স্ত্রীপুত্রকন্যাকে নূতন কাপড় কিনিয়া দিয়া কত আনন্দ বোধ করিতেন। পূজার সময় সমস্ত বাঙ্গালা দেশ আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হয়, কিন্তু নিরানন্দ উমেশচন্দ্রের সংসার আজ ম্রিয়মাণ। নিজের পরণে শততালিযুক্ত কাপড়, স্ত্রীপুত্রকন্যা মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আছে।

ষষ্ঠীর দিন বৈকালে বাড়ীর ভিতর দাওয়ায় বসিয়া উমেশচন্দ্র দারুণ চিন্তাস্রোতে ভাসিতেছেন; দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল

পড়িতেছে। দুর্গাসুন্দরী একপার্শ্বে বসিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছেন। সরস্বতী ও মন্মথ নীরবে মার নিকট বসিয়া আছে। তাহাদের মনে সুখ নাই।

অদূরে পূজাবাড়ী, বোধনের ঢাকের বাদ্দি শুনা যাইতেছে; সে বাদ্দি শুনিয়া, তাহাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে না। এই বিশ্ব-সংসারে চারিটী অনাবশ্যক জীব সংসারের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া সাধারণের নিকট হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নব ঘোষ আস্তে আস্তে আসিয়া উমেশচন্দ্রকে ও দুর্গাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমি আপনাদিগের গরীব সন্তান; আপনাদের এ বিপদে পুত্রের কাজ করিতে পারি নাই। যাহা হউক, পূজার সময় পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীকে এই কাপড় দিতেছি।" এই বলিয়া চারি জনের জন্য চারিখানি কাপড় দাওয়ায় রাখিয়া উঠানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় উমেশচন্দ্র ও দুর্গাসুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। সরস্বতীর ও মন্মথের চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

উমেশচন্দ্র বলিলেন,—"নব! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার নিজেরই সংসার অচল। ইহা সত্ত্বেও তুমি আমাদের জন্য ব্যয় করিতেছ! তোমার ন্যায় হৃদয় কয় জনের আছে?"

(৫)

দেখিতে দেখিতে আর দুই মাস কাটিয়া গেল। কন্যার বয়স ১২ বৎসর অতিক্রম করিতে চলিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় উমেশচন্দ্র ভার্য্যার সহিত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন। উমেশচন্দ্র ঘোর চিন্তাযুক্ত। হাতে হুঁকা রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে হুঁকায় টান দিতেছেন। উমেশচন্দ্রকে তামাক কিনিতে হইত না। যে :দোকানে খাতা লিখিতেন, সেখান হইতে প্রত্যহ বাড়ীতে ধূমপানের জন্য তামাক পাইতেন। সুতরাং দারুণ চিন্তার সময় তাম্রকূটের ধূম আশ্রয় করিয়া তিনি উদ্বেগের উপশম করিতেন।

দুর্গাসুন্দরী বলিতেছেন,—"তুমি এখন পরের ঘটকালি করিতেছ। নানা জায়গায় যাও। মেয়ের জন্য একটা যেমন তেমন পাত্র না দেখ্‌লে আর চলে না। আর তো ওকে রাখা যায় না!"

উমেশচন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কেই বা আমার ঘর হইতে কন্যা লইবে! যাহাদের ঘরে দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের যোগাড় নাই, যাহাদের পরণে মলিন জীর্ণ বস্ত্র, যাহাদের চালে খড় নাই, দারুণ শীতে গায়ে দিবার লেপের অভাবে যাহাদের দুধের ছেলেদের কষ্ট দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও ফাটিয়া যায়, তাহাদের বাড়ী হইতে কে কন্যা লইবে!"

দারুণ শীতে লেপের অভাবে উমেশচন্দ্র, পুত্রকন্যা সহ অশেষ

কষ্ট পাইতেছেন। রাত্রে উমেশচন্দ্র একটা ছেঁড়া বালাপোশ গায় দিয়া শয়ন করিতেন। দুর্গাসুন্দরী একটা পুরাতন ছেঁড়া কম্বল এবং পুত্রকন্যা একটা বহুকালের পুরাতন ময়লা শতছিদ্র লেপ গায় দিয়া রাত্রি কাটাইত।

সেই ছেঁড়া লেপে আদৌ শীত নিবারণ হইত না; সুতরাং সরস্বতী ও মন্মথ শীতে দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। এই কথার উল্লেখ করিয়া আজ উমেশচন্দ্র বড়ই দুঃখ করিতেছিলেন।

উমেশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন,—"বাড়ীতে এমন একটিও জিনিস নাই যে, বেচিয়া লেপ তৈয়ার করি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাছাদের মুখ শুকাইয়া যায়। তাহাদের কষ্ট আমার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরমেশ্বরের নিকট আমি কত পাপ করিয়াছি, বলিতে পারি না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কতদিনে হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। গ্রামের অনেকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি। অনেকে মৌখিক সহানুভূতি দেখান, কিন্তু বলেন— 'কি করিব? আপনাকে সাহায্য করিয়া হরিদাস বাবুর বিরাগভাজন হইব কি?'

পূর্ব্বে পূর্ব্বে দুই একজন কিছু কিছু ধার দিত; কিন্তু কাহারও ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায়, পরিশোধ হওয়া অসম্ভব জানিয়া, গ্রামের কেহই আর ধার দিতে সম্মত হয়

না। বিশেষতঃ রামকান্ত চাটুয্যে সকলকেই নিষেধ করে। পরে কি হইবে, উমেশচন্দ্র ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না।

(৬)

ঘটকালি উপলক্ষে উমেশচন্দ্র নিকটস্থ অনেক গ্রামে যাইতেন। বীরনগর গ্রামে সর্ব্বেশ্বর মুখুয্যের কন্যার বিবাহ গত অগ্রহায়ণ মাসে হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাড়ী তিনি অনেক বার যাতায়াত করিয়াছিলেন। যদিও পাত্রের সন্ধান অন্য ঘটকে দিয়াছিল, তথাপি উমেশচন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, কন্যার বিবাহের পর তিনি উমেশচন্দ্রকে কিছু দিবেন। পৌষের শীতে সন্তান-সন্ততির কষ্ট অসহ্য হওয়ায়, উমেশচন্দ্র একবার বীরনগরে সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাড়ী যাইবার মনস্থ করিলেন।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি একদিন উমেশচন্দ্র বীরনগর গ্রামে সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাড়ী পারিতোষিক আদায় করিবার জন্য রওনা হইলেন। দিনটী বড়ই কুদিন; যাত্রা একেবারে নিষিদ্ধ; তাই দুর্গাসুন্দরী একবার বলিলেন,—"আজ না গেলেই ভাল হইত!"

কিন্তু উমেশচন্দ্র বলিলেন,—"ভিখারীর আবার সুদিন আর কুদিন কি?"

তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দুর্গাসুন্দরীর দক্ষিণ নয়ন কাঁপিয়া উঠিল। জীবনে কতবার

দুর্গাসুন্দরী সেই দিনটী স্মরণ করিয়া বলিতেন,—"কেন আমি জেদ করিয়া তাঁহাকে সেই দিন বাড়ী হইতে যাইতে বাধা দিলাম না! সে দিন যদি বাড়ী হইতে বাহির হইতে না দিতাম, তাহা হইলে হয় তো আমার কপাল ভাঙ্গিত না!"

যথাসময়ে চূর্ণী পার হইয়া মধ্যাহ্নে উমেশচন্দ্র সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাড়ী পৌছাইলেন। সারাদিনের মধ্যে সর্ব্বেশ্বর বাবুর সহিত দেখা হইল না। সর্ব্বেশ্বর বাবু আহার করিয়া ঘুমাইতেছিলেন; সুতরাং চাকরেরা বলিল,—"সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেখা হইবে না।"

সমস্ত দিন উপবাস করিয়া বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সর্ব্বেশ্বর বাবু তাঁহাকে কিছুই দিলেন না। সর্ব্বেশ্বর বাবুর নিকট উমেশচন্দ্র অন্ততঃ ৫টা টাকা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; আর তাহাতে পুত্রকন্যার শীত নিবারণের জন্য একটা লেপ তৈয়ারী করিবেন ভাবিয়াছিলেন। তিনি তাই কাতর-ভাবে তাঁহার নিকট নিজের দারুণ কষ্টের কথা নিবেদন করিলেন। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর বাবু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা রিক্তহস্তে কাতর প্রাণে উমেশচন্দ্রকে ফিরিতে হইল। সমস্ত দিন অনাহারে ও ভগ্নোৎসাহে উমেশচন্দ্র আর চলিতে পারিতে-ছিলেন না। সন্ধ্যার সময় তিনি গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন।

গৃহে ফিরিবার সময় উমেশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি কি করিয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিব! ভার্য্যা-পুত্র-কন্যা সকলেই

আশা করিয়া আছে,—আমি বাড়ী ফিরিয়াই তাহাদের শীত নিবারণের একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিব। এক মাত্র সর্ব্বেশ্বর বাবুই আমার আশা ছিলেন ; কিন্তু এখন আমার সকল আশাই ফুরাইল ! কি করি ! কোথায় যাই ! এ বিপদে কে আমাকে সাহায্য করিবে !"

বীরনগর একটি বড় গ্রাম। লম্বে প্রায় এক ক্রোশের অধিক। সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাড়ী গ্রামের উত্তরাংশে। উমেশচন্দ্র যখন গ্রামের দক্ষিণ পাড়া দিয়া চিন্তাযুক্ত মনে যাইতেছিলেন, তখন কালীকুমার ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর নিকটে আসিয়া মনে পড়িল যে, কালীকুমার ভট্টাচার্য্যের এক জামাতার বাড়ী কৃষ্ণনগর। উমেশচন্দ্র ইহাদের বাড়ী পূর্ব্বে কোনও কার্য্য-উপলক্ষে আসিয়াছিলেন।

উমেশচন্দ্র আর চলিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। তিনি ভাবিলেন,—"শুনিয়াছি, ভট্টাচার্য্যেরা বড় সদাশয় লোক। দেখি, যদি ইঁহাদের নিকট কোনও সাহায্য পাই।"

এই ভাবিয়া উমেশচন্দ্র, ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ী প্রবেশ করিলেন। ভট্টাচার্য্যেরা বর্দ্ধিষ্ণু লোক। বাড়ীর কর্ত্তা কালী-কুমার কার্য্যোপলক্ষে স্ত্রী-পুত্র লইয়া কলিকাতায় থাকেন। বাড়ীতে বৃদ্ধা মাতা, দ্বাদশ বর্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকুমার ও আর দুই এক জন স্ত্রীলোক থাকেন। সদর বাড়ীতে একটি

চাকর শয়ন করে। কালীকুমার বাবুর জামাতা কৃষ্ণনগরের পূর্ণ চাটুয্যে মহাশয়ের পুত্র। তাঁহার নাম—সতীশচন্দ্র। তিনি কলিকাতায় ওকালতি করেন।

উমেশচন্দ্র যখন ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ী প্রবেশ করিলেন, চাকর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

উমেশচন্দ্র হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন,—"কৃষ্ণনগরের পূর্ণ চাটুয্যের বাড়ী হইতে।"

বলিয়াই উমেশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। মিথ্যা কথার উপর তাঁহার ভারী ঘৃণা ছিল। অথচ, হঠাৎ তিনি এত বড় একটি মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন।

ভৃত্যটি অনেক দিনের পুরাতন। সুতরাং কুটুম্বদিগের নাম বেশ জানিত। সে দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া খবর দিল যে, জামাই-বাড়ী হইতে লোক আসিয়াছে। গৃহিণী সাদরে উমেশচন্দ্রকে বৈঠকখানায় বসাইতে বলিলেন।

(৭)

কুটুম্ব-বাড়ীর লোক বলিয়া ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ী উমেশচন্দ্র খুব আদর-যত্ন পাইলেন। সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণকুমার বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। সে বাড়ী আসিয়া উমেশচন্দ্রকে অপ্যায়ন করিল। রাত্রে ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী পরিতোষ-পূর্ব্বক উমেশচন্দ্রকে

ভোজন করাইলেন। তৎপরে বাহিরের ঘরে তাঁহার শয়নের জন্য সুন্দর শয্যা রচনা করিয়া দেওয়া হইল।

উমেশচন্দ্রের রাত্রি যাপনের আদৌ সঙ্কল্প ছিল না; কিন্তু যখন শয্যার আয়োজন হইতে লাগিল, তখন উমেশচন্দ্র ভাবিলেন,—'কুটুম্ব বাড়ীর লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া কি সর্ব্বনাশ করিলাম! প্রকৃত পরিচয় দিলে, ইঁহারা যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাদের নিকটে নিশ্চয়ই সাহায্য পাইতাম। কিন্তু কুটুম্ব-বাড়ীর লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া এ বড় বিষম সমস্যায় পড়িলাম!

উমেশচন্দ্রের শয্যা রচনা হইল। সতরঞ্চীর উপর বড় চাদর, তাহার উপর পুরু তোষক, মাথার বালিশ, পার্শ্বের বালিশ, সাদা ধপধপে ওয়াড়-পরান খুব বড় লেপ্, মশারী টাঙ্গান হইল।

খাওয়া দাওয়া করিয়া উমেশচন্দ্র যখন বাহিরে আসিয়া বসিলেন, তখন চাকর বাঁধা হুকায় তামাক দিয়া গেল। পরিশেষে সে বলিয়া গেল,—"ঘরে গাড়ু জল সমস্তই ঠিক রহিল। আপনি দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করুন। যদি আবশ্যক হয়, আমি পার্শ্বের ঘরে আছি। আমাকে ডাকিবেন।"

উমেশচন্দ্র বিছানায় বসিয়া বাঁধা হুকায় তামাক খাইতে লাগিলেন। তামাক খাইতে খাইতে ভাবিলেন,—"এতক্ষণ আমার পুত্র-কন্যারা না জানি কত কষ্ট পাইতেছে! ভাঙ্গা চালা দিয়া হিম হু হু করিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। ছেঁড়া মাদুরের উপর ছেঁড়া লেপ

গায় দিয়া বাছারা শুইয়া আছে। হয় ত আজ খাওয়াও হয় নাই! আর আমি এই সুন্দর অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ আরামপ্রদ শয্যার উপর বসিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া মনের আনন্দে তামাক খাইতেছি!" এই ভাবিতে ভাবিতে উমেশচন্দ্রের চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রু পড়িতে লাগিল।

হুঁকাটি বৈঠকে রাখিয়া মনের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া উমেশচন্দ্র হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কত কি চিন্তা করিয়া শয়ন করিতে পারিলেন না। সে শয্যায় শয়ন করিতে যেন তাঁহাকে শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। তাঁহার পুত্র-কন্যা দারুণ শীতে কষ্ট পাইতেছে! তিনি কোন্ প্রাণে আরামে শয়ন করিবেন?

উমেশচন্দ্র ভাবিলেন,—"পৃথিবীতে এত অবিচার কেন! আমি কোনও পাপ করি নাই। আমার পুত্রকন্যারা কোনও দোষে দোষী নহে। তবে তাহাদিগকে কেন এত কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে? জগতে পাপপুণ্য সব মিথ্যা। ঈশ্বরের বিচার নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই!"

তিনি একবার ভাবিলেন,—"ভট্টাচার্য্যদিগের যেরূপ সদ্ব্যবহার, ইঁহাদের নিকট যাচ্ঞা করিলে ইঁহারা কি আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন না?" কিন্তু পরক্ষণেই সর্ব্বেশ্বর বাবুর ব্যবহারের বিষয় মনে পড়িল। ক্ষমতা থাকিলেও মানুষ যে অন্যের দুঃখ

দূর করিতে প্রবৃত্ত নহে,—এই মনে করিয়া তিনি হতাশ হইলেন। আত্মগোপন করিয়া যাওয়ারও পথ রোধ করিলেন, যুগপৎ সে চিন্তাও তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি বড়ই ম্রিয়মাণ হইলেন। এইরূপ মনে মনে কত তর্ক-বিতর্ক করিলেন!

অবশেষে উদ্বেগ বশতঃ উমেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া তক্তাপোষের উপর পদচালনা করিতে লাগিলেন। চিন্তায় ও উদ্বেগে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। অনেকক্ষণ চিন্তার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন,—"ইহাতে পাপ কি? ইঁহাদের তেমন কোনও ক্ষতিই হইবে না; বরঞ্চ দুইটী প্রাণীর জীবন রক্ষা হইবে। সুতরাং এ কাজ না করাই বরং পাপ।"

এই বলিয়া উমেশচন্দ্র মশারীটী খুলিয়া ফেলিলেন। পরে পিতলের গাড়ুটীর জল ফেলিয়া দিলেন। বালিশ তোষক মশারি সব এক সঙ্গে ভাঁজ করিয়া লইয়া গাড়ুটী তাহার ভিতর পুরিলেন। পরিশেষে বিছানার চাদর দিয়া সব বাঁধিয়া একটি মোটের মত করিলেন। কপাট খুলিয়া দেখিলেন, চাকরের ঘর বন্ধ। আস্তে আস্তে মোটটি মাথায় করিয়া ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ী হইতে উমেশচন্দ্র নিস্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার সময় বাঁধা হুকার প্রতি নজর পড়িলে তিনি মনে মনে বলিলেন,—"বাঁধা হুকায় আমার কি দরকার? ছেলেরা দারুণ

শীতে মৃতকল্প ; তাই বিছানাগুলি লইলাম। আর গাড়ু অভাবে বড় কষ্ট পাইতেছি, তাই গাড়ুটি লইলাম।"

উমেশচন্দ্র সদর রাস্তা দিয়া গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তখনও ভোর হইতে অনেক বিলম্ব আছে। রাস্তায় মোটে লোক নাই। উমেশচন্দ্র ক্রমে ক্রমে খেয়া ঘাটে উপস্থিত হইলেন। খেয়া ঘাটে কোনও নৌকা ছিল না। সুতরাং সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। অতি প্রত্যুষে একটি জেলে-ডিঙ্গীতে চূর্ণী পার হইয়া, প্রাতঃকালে উমেশচন্দ্র বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(৮)

প্রত্যুষে উঠিয়া ভট্টাচার্য্য বাড়ীর চাকর—বৈঠকখানায় উমেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইল না। গাড়ু নাই দেখিয়া ভাবিল, বোধ হয় গাড়ু লইয়া তিনি বাগানের দিকে গিয়াছেন। তাহার পর ঘরটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিছানা বালিশ মশারি কিছুই দেখিতে না পাইয়া বাড়ীর ভিতর যাইয়া খবর দিল! কৃষ্ণকুমার ছুটিয়া বাহিরে আসিল। তাহার পর খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। সকলের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই ব্যক্তি একজন জুয়াচোর লোক।

সেই দিনই চাকরকে পত্র দিয়া কৃষ্ণনগরে পাঠান হইল। চাকর সন্ধ্যার সময় খবর লইয়া আসিল যে, তাঁহারা তো কাহাকেও এখানে পাঠান নাই! পাড়ার লোক পুলিশে সংবাদ দিতে পরামর্শ দিল।

ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ীর নিকট এক ময়রার দোকান ছিল। ময়রা বলিল যে, গত কল্য যে লোকটি তাঁহাদের বাড়ী আসিয়াছিল, তাহাকে সে বেশ জানে। সে কখনও কখনও বীরনগরে আসে। তাহার নাম—উমেশ চক্রবর্ত্তী; তাহার বাড়ী কোথায়, ময়রা ঠিক জানে না। সুতরাং ময়রার নিকট উমেশচন্দ্রের নাম সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণকুমার জনৈক প্রতিবাসী সহ রাণাঘাট থানায় গিয়া খবর দিল।

এ দিকে সকাল বেলা বাড়ী পৌছিয়া উমেশচন্দ্র পরিবারকে ডাকিলেন। দুর্গাসুন্দরী উমেশচন্দ্রের মাথার মোট নামাইয়া লইলেন। লেপ বালিশ দেখিয়া সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। দুর্গাসুন্দরী বলিলেন,—"এ যাত্রায় ছেলেগুলা বাঁচিয়া গেল।"

সরস্বতী ও মন্মথ আজ সারাদিন আনন্দে কাটাইল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহাদিগের মুখ শুকাইয়া যাইত। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহাদের বড় আনন্দ যে, আজ পরম সুখে শয়ন করিবে।

বহুদিন পরে আজ উমেশের পরিবারে আনন্দ দেখা দিল। উমেশ বাড়ীতে আসিয়া পরিবারকে বলিয়াছিলেন যে, ঘটকালি করিয়া এই সব জিনিস পাইয়াছেন। সেই দিনে দুই একবার মনের মধ্যে অনুতাপের বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি যুক্তির দ্বারা মনকে বুঝাইয়াছিলেন,—"ইহাতে পাপ কি,

তাঁহাদের কিছুই ক্ষতি হইবে না।” তিনি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেন নাই যে, ভট্টাচার্য্যেরা পুলিশে সংবাদ দিবে।

(৯)

পাঁচ সাত দিন উমেশচন্দ্রের সংসার বেশ সুখে কাটিয়া গেল। মুদীর নিকট টাকা পাইয়াছিলেন, তাহাতে চাউল কিনিয়াছিলেন। নবঘোষের নূতন গাই এর দুধ হইয়াছিল। সে প্রত্যহ তাঁহাদের জন্য জেদ করিয়া দুধ দিয়া যাইত। উমেশচন্দ্র আপত্তি করিলে বলিত,—“আমার এত দুধ কি হইবে!” ইহা ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারিও সে দিয়া যাইত। নব নিজে বিচালি দিয়া শয়নঘরের চাল ছাইয়া দিয়াছিল। এক্ষণে দুর্গাসুন্দরী রাত্রে পুত্র-কন্যাসহ সুখে নিদ্রা যাইতেন।

দারুণ ঝটিকার পূর্ব্বে আকাশ যেমন পরিষ্কার থাকে, ইঁহাদের সংসার পাঁচ সাত দিন বেশ সুখে কাটিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন দারুণ বিপদ আসিয়া উমেশচন্দ্রের সংসারকে আচ্ছন্ন করিল।

এক দিন প্রত্যূষে উমেশচন্দ্র শয্যা হইতে উঠিয়া দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। পার্শ্বে জলপূর্ণ গাড়ু রহিয়াছে। তামাক খাইয়াই গাড়ু লইয়া বাগানে যাইবেন। এমন সময়ে দারোগা বাবু, দুইজন কনষ্টেবল ও কৃষ্ণকুমার তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

তাঁহারা সকলে বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলে, কৃষ্ণকুমার বলিল,—হাঁ, এই সেই লোক; আর এই আমাদের গাড়ু।”

উমেশচন্দ্র ভয়ে বাগানের দিকে দৌড়াইলেন। দারোগা বাবু "পাক্‌ড়ো" বলিতেই কনেষ্টবল দুইজন তাঁহাকে ধরিয়া প্রহার করিতে লাগিল। উমেশচন্দ্র ভয়ে পড়িয়া গেলেন। কনেষ্টবলেরা তাঁহাকে হিঁচড়াইয়া উঠানে টানিয়া আনিল।

গোলমাল শুনিয়া উমেশচন্দ্রের ভার্য্যা ও পুত্র-কন্যা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। ক্রমে ব্যাপার বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। দুর্গাসুন্দরী বুকে করাঘাত করিয়া,—"কেন তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হইল!" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

নব ঘোষ ও পাড়ার দুই একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। দারোগা বাবু ঘর তল্লাস করিয়া লেপ, তোষক, বালিশ, সতরঞ্চী, মশারি প্রভৃতি চোরাই জিনিসগুলি আনিয়া উঠানে জমা করিতে লাগিলেন।

সরস্বতী কাঁদিয়া আকুল হইল। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—"ওগো বাবা গো, তুমি যে বলেছিলে ঘটকালি করে এই সব জিনিস পেয়েছিলে! তুমি কেন চুরি কর্‌তে গেলে বাবা গো! আমাদের তো কোনও দিন কোনও কষ্ট হয় নাই, বাবা! আমরা তো ছেঁড়া বিছানায় বেশ সুখে ছিলাম গো।"

সরস্বতী এই কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠানে গড়াগড়ি দিতেছিল, তাহার ক্রন্দনে প্রতিবাসীদিগের চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছিল। নব কাঁদিয়া আকুল। বালিকার ক্রন্দন শুনিয়া

একজন কনেষ্টবল ধমকাইয়া বলিল,—"এই লৌণ্ডী, চুপ রও।" কিন্তু দারোগা বাবু কনেষ্টবলকে ধমকাইয়া উঠিলেন। মন্মথ নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

উমেশচন্দ্র আতঙ্কে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি মাত্র হয় নাই। ক্রমে দারোগা বাবু জিনিসপত্রের তালিকা প্রস্তুত করিয়া মাল-সমেত উমেশচন্দ্রকে বাঁধিয়া লইয়া রাণাঘাটে চলিয়া গেলেন।

(১০)

গ্রামের মধ্যে এই কথা চারিদিকে রাষ্ট হইয়া পড়িল। গ্রামের সকলেই দুঃখিত হইল। নব যাহাকে দেখে, তাহারই পায় ধরিয়া কাঁদিয়া বলে,—"আমার বাবাকে বাঁচান।"

ক্রমে হরিদাস মুখুয্যের কাণে সব কথা পৌঁছিল। তিনি উমেশ-চন্দ্রের এই বিপদে প্রকৃতই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মনের মধ্যে অনুতাপ দেখা দিল। তিনি নব ঘোষকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "মোকদ্দমায় মোক্তার দিবার বন্দোবস্ত কর। খরচ আমি দিব।"

দুর্গাসুন্দরীর অবস্থা কে বুঝিবে! স্বামীকে লইয়া যাওয়া অবধি তিনি স্নানাহার বন্ধ করিয়া একস্থানে পড়িয়া ক্রমাগত রোদন করিতেছিলেন। প্রতিবাসীরা আসিয়া অনেক প্রবোধ দিল; কিন্তু বহু সাধ্য-সাধনায় তাঁহাকে কেহ স্নান আহার করাইতে পারিল না। নব আসিয়া জোর করিয়া সরস্বতীকে ও

মন্মথকে দুই বাটি দুধ খাওয়াইল। সরস্বতী অনেক আপত্তি করিয়াও নবর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না।

দুর্গাসুন্দরীকে আশ্বাস দিয়া নব বলিল,—"যখন হরিদাস মুখুয্যে মশায় লাগিয়াছেন, তখন বাবা নিশ্চয়ই খালাস পাইবেন। যখন হরিদাস বাবুর দয়া হইয়াছে, আর কোনও ভয় নাই। তিনি খালাস তো পাইবেন, আর হরিদাস বাবু সংসার চলারও একটা কিনারা করিয়া দিবেন।"

কিন্তু দুর্গাসুন্দরীর শোক প্রমশিত হইবার নহে। বিপদে ও কলঙ্কে তাঁহার হৃদয়ের পঞ্জর একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নব ঘোষের প্রবোধ-বাক্যে সরস্বতী ও মন্মথ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের মনের মধ্যে একটি ক্ষীণ আশার উদয় হইয়াছিল যে, এ বিপদ কাটিয়া যাইবে। গ্রামের দুই এক জন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশিনী আসিয়া দুই তিন দিন রাঁধিয়া দিয়া সরস্বতীকে ও মন্মথকে খাওয়াইয়া গেল। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া, স্বামীর অকল্যাণ হইবে বলিয়া, প্রতিবেশিনীরা দুই তিন দিনের মধ্যে দুর্গাসুন্দরীকে দুই এক বাটি দুধ খাওয়াইতে সমর্থ হইয়াছিল মাত্র।

এইরূপে ৩।৪ দিন কাটিয়া যাইবার পর নব খবর আনিল যে, কাল মোকদ্দমার দিন। হরিদাস বাবু খরচার জন্য নবর হস্তে চারিটি টাকা দিয়াছিলেন, আর রামকান্ত মোক্তারকে একটি পত্রও দিয়াছিলেন। স্থির হইল, কল্য প্রত্যুষে দুর্গাসুন্দরী পুত্র কন্যা

সহ নব ঘোষের সহিত রাণাঘাটে রওনা হইবেন। সরস্বতী ও মন্মথ কিছুতেই বাড়ীতে থাকিতে রাজী হয় নাই।

(১১)

আজ মোকদ্দমার দিন। অতি প্রত্যূষেই নবঘোষের সহিত দুর্গাসুন্দরী, সরস্বতী ও মন্মথ, রাণাঘাটে আসিয়া পৌছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা রামকান্ত মোক্তারের বাসায় যাইলেন।

রামকান্ত বাবু নবকে বলিলেন,—"খালাস হওয়া দুষ্কর। আসামী দোষ স্বীকার (Confession) করিয়াছে। প্রমাণও বেশ আছে। নৌকার মাঝি, ময়রা, বাড়ীর চাকর প্রভৃতি সাক্ষী আছে। ইহা ব্যতীত চোরাই মাল সমুদায়ই আসামীর বাড়ী হইতে পাওয়া গিয়াছে। এখন কেবল হাকিমের দয়া।"

বেলা ১০।১১টার সময় নব ঘোষ ও দুর্গাসুন্দরী পুত্র-কন্যা সহ আদালতে পৌছিলেন। দুর্গাসুন্দরী পুত্র-কন্যা লইয়া আদালতের অনতিদূরে একটি গাছের তলায় বসিয়া ভগবানের নাম জপ করিতে লাগিলেন।

নব আদালতে গিয়া মোক্তার বাবুর পার্শ্বে বসিল। যাইবার সময় দুর্গাসুন্দরীকে বলিয়া গেল,—"আপনি এখানে থাকুন। আমি মোকদ্দমার ফলাফল জানিয়াই আপনাকে আসিয়া খবর দিব।"

দুর্গাসুন্দরী মৃতকল্প হইয়া নব ঘোষের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

উমেশচন্দ্রের এই মকদ্দমার দিনে ভট্টাচার্য্য বাড়ীর কর্ত্তা কালীকুমার কলিকাতা হইতে আসিয়া আদালতে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণের বিপদে তাঁহার বড় কষ্ট বোধ হয়। তিনিও হাকিমকে জানাইলেন যে, তাঁহার কোনও জেদ নাই, বরং আসামী খালাস পাইলে তিনি খুসী হইবেন।

যথাসময়ে উমেশচন্দ্রের মোকদ্দমায় ডাক হইল। ডেপুটি বাবু একজন বিচক্ষণ হাকিম। তিনি মোকদ্দমার বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন,—"ভদ্রলোকের এরূপ ব্যবহার! এই সব মোকদ্দমায় দয়া প্রকাশ করিলে অপরাধের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই ব্যক্তির গুরুতর সাজা হওয়া উচিত।"

উমেশচন্দ্র দোষ স্বীকার করিলেন। মোক্তার বাবুর অনেক অনুনয় বিনয়ে ও প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ডেপুটি বাবু বলিলেন,—আসামীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সে অর্থদণ্ড দিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? সুতরাং তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করা ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতেছি না।"

এই কথা শুনিয়া কালীকুমার বাবু মোক্তারের দ্বারা হাকিমকে জানাইলেন যে, অর্থদণ্ড করিলে সে টাকা যেমন করিয়া হউক, যোগাড় হইবে।

বিচারপতি ক্ষণেক চিন্তার পর অবশেষে উমেশচন্দ্রকে ৩৭৯ ধারা মতে চার্য্য করিয়া ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড করিলেন।

যথাসময়ে কালীকুমার বাবু ঐ টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। উমেশচন্দ্র মুক্তিলাভ করিলেন।

বেলা চারিটার সময় মোকদ্দমা শেষ হইল। নবঘোষ উমেশ-চন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বকথিত গাছতলার দিকে লইয়া চলিল।

দূর হইতে পিতাকে দেখিতে পাইয়া মন্মথকুমার "বাবা! বাবা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সরস্বতী কাঁদিয়া ফেলিল। দুর্গাসুন্দরী উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। উমেশচন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

নব ঘোষের ও দুর্গাসুন্দরীর পরিচর্য্যায় দুই তিন ঘণ্টার পর কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চার হইলে, কালীকুমার বাবু একটি পাল্কী আনাইয়া দিলেন। সেই রাত্রেই উমেশচন্দ্রকে বাড়ী আনা হইল। কিন্তু উমেশচন্দ্রের দেহ ও মন একেবারে ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বাটি আসিয়াই শয্যা লইলেন।

এবার গ্রামের অনেকেই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন। চিকিৎসারও বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু কোনই ফল ফলিল না। মকদ্দমার সাত দিন পরে উমেশচন্দ্রের কষ্টময় জীবনের অবসান হইল। তাঁহার পরিবারবর্গের দারুণ আর্ত্তনাদ গ্রামের অনেকেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল।

* * *

মিলন।

(সত্য ঘটনা-মূলক ক্ষুদ্র উপাখ্যান)

——‡(*)‡——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাস। রজনী অৰ্দ্ধপ্ৰহর। নব-বর্ষা সমাগমে আকাশ-তল ঘনঘটাপূর্ণ। চারিদিকে জমাট-বাধা অন্ধকার। মুহুর্মুহু বিজলি-চমক। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ-গর্জ্জন। বিন্দু বিন্দু বারি-বর্ষণ হইতেছে। আম্র-কাননে বেতস-বনে খদ্যোৎপুঞ্জ ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। গ্রামের কোলাহল মন্দীভূত। শ্রান্তক্লান্ত কৃষক নিদ্রার অঙ্কে শায়িত। ক্বচিৎ কোথাও খঞ্জনির বাদ্যসহ গ্রাম্য-সঙ্গীত শ্রুত হইতেছে। বাহিরে পুষ্করিণীর ধারে ভেকের মকমকি। বৃক্ষশিরে কালপেঁচার বিকট নিনাদ।

এই দুর্য্যোগ রজনীতে শঙ্করগাছি-গ্রাম-প্রান্তস্থিত একখানি ক্ষুদ্র কুটির-দ্বারে এক দুঃখিনী একাকিনী দাঁড়াইয়া। নয়ন চঞ্চল; সম্মুখপানে ঘন ঘন দৃষ্টি সঞ্চালিত। দুঃখিনী যেন কাহারও আগমন

প্রতীক্ষা করিতেছে। গৃহতলে বালক-পুত্র নিদ্রিত। দীপ লইয়া বাহিরে আসিয়া কপাটে শিকল টানিয়া দিয়া দীপ-হস্তে পুষ্করিণীর পারে যাইয়া দাঁড়াইল। হস্তস্থিত দীপ উর্দ্ধোত্থিত করিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, সম্মুখপানে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে পুষ্করিণীর অদূরে জলময় পথে মনুষ্য-পদক্ষেপ-সঞ্জাত ধুপধাপ শব্দ শুনিতে পাইয়া দুঃখিনী কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে ও?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইল,—"মা, আমি যে হরিলাল।" 'আঁ বাঁচলেম'—এই বলিয়া দুঃখিনী জননী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। হরিলাল দ্রুতপদে আসিয়া জননীর সম্মুখে দাঁড়াইল; কহিল,—"এই অন্ধকারে মা তুমি একাকিনী দাঁড়াইয়া! চল মা—ঘরে চল।"

মাতাপুত্রে ঘরে আসিল। হরিলাল হস্তস্থিত পুটলিটি দ্বার-সম্মুখে রাখিয়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহে রোয়াকে বসিয়া পড়িল। দুঃখিনী জননী পুত্রের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিল,—"বাপ, এম্নি করে দুঃখিনী মাকে কাঁদাতে হয়! না, এম্নি দুর্য্যোগ রাতে একলাটি পথ চল্‌তে হয়!" এই বলিয়া জননী সস্নেহে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

হরিলাল কহিল,—"মা! যজমান বাড়ীর কাজ সার্‌তে বেলা শেষ হয়ে এল। একবার ভাবলেম—ওখানে থেকে যাই।

আবার ভাবলেম—তাহলে তুমি ভেবে সারা হবে। সাত পাঁচ ভেবেচিন্তে অবেলায় রওনা হলেম। পথ অনেকটা দূর, তাতে আবার পথে জল দাঁড়িয়েছে; তাই মা আস্‌তে বিলম্ব হ'য়েছে। কিন্তু মা! যে আশায় এতটা পথ গিয়েছিলাম, তার কিছুই হল না। সামান্য কিছু চাউল আর চারিটা পয়সা মাত্র পেয়েছি। মা! এই ভাবে ক'দিন চল্‌বে!"

জননী নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

হরিলাল জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, গোপাল কি খেয়েছে?"

জননী।—"ঘরে চার্‌টী ক্ষুদ ছিল, তাই রেঁধে দিয়েছি; খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

হরিলাল।—"মা! তুমি বুঝি ও-বেলা কিছু খাওনি?" জননী উত্তর করিল না. হরিলাল বুঝিল সারাদিন জননীর অনশনে গিয়াছে। হরিলাল কহিল,—"মা এবেলা রান্না কর্‌বে না?"

জননী।—"তুমি খাও যদি রান্না কর্‌ব বই কি?"

হরিলাল।—"তুমি খাবে না—মা?"

জননী।—"না, বাছা।"

হরিলাল।—"বল কি মা—খাবে না! উপবাস করে মারা যাবে;—আর আমাদের অকূলে ভাসাবে!"

জননী।—"সামান্য চার্‌টী চাউল বইত নয়! কাল্‌কের উপায় কি হবে।"

হরিলাল।—"কালকের উপায় কাল করবে। আমি খাব বই কি। মা! তুমি উনুন ধরাও। আমি সন্ধ্যাহ্নিক সেরে আসি।"

জননী আর আপত্তি করিলেন না। উনুন ধরাইয়া অর্দ্ধেক পরিমাণ চাউল পরদিনের জন্য রাখিয়া দিয়া বাকি চাউল চড়াইয়া দিলেন। আলু ভাতে ভাত হইতে বেশী সময় লাগিল না। হরিলালের বড় ক্ষুধা ছিল না; না খাইলে জননী খাইবেন না ভাবিয়া, সে খাইতে বসিল।

নামমাত্র খাইয়া হরিলাল উঠিয়া আসিল। জননী আধপেটা খাইয়া গোপালের জন্য কিছু সংস্থান রাখিয়া দিলেন।

হরিলাল স্বহস্তে ছিন্ন কন্থার শয্যা রচনা করিল। জননী আহারান্তে থালা-বাসনগুলি যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া গোপালের পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

হরিলাল শয্যায় শয়ন করিয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। একটীর পর একটী—কত ভাবনা কত চিন্তা তাহার হৃদয় মধ্যে উদয় হইতে লাগিল। চক্ষে নিদ্রা আসিল না। চিন্তাক্লিষ্টের কাছে নিদ্রা আসে না।

হরিলাল ভাবিল,—"যে হতভাগ্য মাতা ভ্রাতার আহার যোগাইতে অক্ষম, জানি না—তাহার জীবন ধারণে কি ফল। জননীর সজল নয়ন, ভ্রাতার মলিন বদন দেখিয়া যে হতভাগ্য

অবিচলিত থাকিতে পারে, নিশ্চয় সে হতভাগ্য মানুষের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। দস্যুতস্করও তো মাতা ভ্রাতার কষ্ট দূর করিতে যত্ন-চেষ্টা করিয়া থাকে!”

ভাবিতে ভাবিতে হরিলাল প্রতিজ্ঞা করিল,—“আর এ ভাবে দিন কাটাইব না। যে উপায়ে পারি, মাতা ভ্রাতার কষ্ট দূর করিব। অকৃতকার্য্য হই, আত্মহত্যা করিব।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাহারও মুখপানে তাকাইয়া সময় বসিয়া থাকে না। সুখী দুঃখী সকলেরই রজনী প্রভাত হয়। হরিলালেরও দুঃখের রজনী অবসান হইল। পূর্ব্ব-গগন-ভালে উষার রক্তিম-রাগ ফুটিয়া উঠিল। সূর্য্যালোকভীত নক্ষত্র-রাজি অদৃশ্য হইতে লাগিল। বৃক্ষশিরে বিহঙ্গকুল কলস্বরে উষা প্রকৃতির সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। উপবনে প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি সৌরভ-সম্ভার উপহার-দানে প্রকৃতির অভ্যর্থনা করিল। বিনিদ্র হরিলাল দুঃখ-কণ্টকিত শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। উষা-প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্যে তাহার নয়ন মন আকৃষ্ট হইল না। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বগগনভালে কনক থালার ন্যায় বালার্ক উদিত হইল। প্রকৃতির বদনশ্রীতে হাস্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল।

হরিলাল কোনদিকে লক্ষ্য করিল না। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য

সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসিল। দুঃখিনী জননী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ তল ঝাঁট দিতেছিলেন।

হরিলাল কহিল,—"মা! আগে আমার একটা কথা শুনে যাও; তার পর ঝাঁট দিও।"

জননী ঝাঁটা ফেলিয়া পুত্রের পার্শ্বে রোয়াকে উপবেশন করিল।

হরিলাল বলিতে লাগিল,—"মা! এ ভাবে আর দিনগুজরাণ চল্‌বে না। তোমার কষ্ট ও গোপালের কষ্ট আমি আর সহ্য কর্‌তে পারি না। মায়ের কুপুত্র আমি; মায়ের অঙ্গে ছিন্ন বসন দেখে আমি আজও নিশ্চিন্ত আছি! মায়ের কুপুত্র আমি; মায়ের অঙ্গে ছিন্ন বসন দেখে আজও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে আছি! দুঃখ-কষ্টের তাড়নায় এক এক দিন আত্মহত্যা কর্‌তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু মা—"

দুঃখিনী জননী চমকিয়া উঠিলেন; বাধা দিয়া কহিলেন,—"বল কি! এমন সর্ব্বনেশে কথা কি বল্‌তে আছে! নিজের দুঃখ-কষ্টের জন্য অনুমাত্রও ভাবিনে। তোমরা দুটি যে সময়ে আর দশজনার মত খেতে-পরতে পাও না, ইহাই আমার দারুণ কষ্ট। যাক বাছা! হতাশ হ'ও না। সংসারে কার না দুঃখ-কষ্ট হয়! চিরদিন কাহারও সমান যায় না। যিনি দুঃখ দিয়েছেন, তিনিই আবার সুখ দিবেন। একদিন ভগবান মুখ তুলে চাইবেন। এমন দিন আস্‌বে, যে দিন অপর দশজনে তোমাদের খেয়ে মানুষ হবে।"

হরিলাল নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। ক্ষণেক পর

কহিল,—"মা! আমি বলি কি, তোমার ও গোপালের দুচার মাসের খোরাকীর বন্দোবস্ত করে দিয়ে আমি বিদেশে চলে যাই। বিদেশে একটা-না-একটা চাকরী জুটবে। না হয়, রেলওয়ে ষ্টেসনে কুলীর দলে নাম লিখাব। ভাগ্যে যদি কুলিগিরি না জুটে, অবশেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কর্‌ব। কি কর্‌ব মা! হতভাগ্য আমি; ভাল লেখা-পড়া শিখি নাই; মান-অপমানের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌লে চল্‌বে কেন?"

দুঃখিনী জননী নীরবে শুনিতেছিলেন আর তাঁহার শীর্ণ গণ্ডস্থল গড়াইয়া অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছিল। পরমুহূর্ত্তে অশ্রুবিন্দু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন,—"না বাবা! তোমার বিদেশে যেয়ে কাজ নাই। আমি নিজে ভিক্ষা করে তোমাদের খাওয়াব। এই মাত্র যে সর্ব্বনেশে কথা মুখ দিয়ে বের্‌ কর্‌লে, তেমন কথার পর কোন্‌ প্রাণে তোমায় বিদেশ যেতে দেব!"

হরিলাল কষ্টের হাসি হাসিয়া কহিল,—"না—মা! আমি মরব না। আমি মলে তোমার দশা গোপালের দশা কি হবে। আমি আছি বলে আজও আধপেটা খেয়ে তোমরা বেঁচে আছ। আমি মর্‌লে তো মা আধপেটাও জুটবে না। তখন এ হতভাগ্যের প্রেতাত্মাকেই এ পাপের ভাগী হতে হবে। মা, আমি বলি কি, ব্রহ্মোত্তর এক বিঘা যে জমী আছে, সেই এক বিঘা জমী ও বসত-বাটি বন্ধক দিয়ে পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জ করি।"

জননী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আমার শ্বশুর ঠাকুরের সমস্ত সম্পত্তি গিয়ে মাত্র এইটুকু সম্পত্তি আছে। তাই বন্ধক দিয়ে টাকা কর্জ্জ করে যদি মেয়াদ মধ্যে শোধ দিতে না পার, তাহলে বাছা, তোমাদের নিয়ে মাথা-লুকাবার স্থান থাকবে না। যা-ই কর বাছা! অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে কর।"

হরিলাল কহিল,—"মা বেঁচে থাক্‌লে তো মাথা লুকাবার স্থানের দরকার। যদি বেঁচে থাকি, তবে যেমন করে হোক তোমার আশীর্ব্বাদ-বলে এই ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব। মা! তুমি অনুমতি দাও, টাকা কর্জ্জের যোগাড় দেখি।"

জননী ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া পুত্রের মতে মত দিলেন।

হরিলাল উত্তরীয় স্কন্ধে পাড়ায় বাহির হইল। দুঃখিনী অনেক-ক্ষণ করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া চিন্তা-তরঙ্গে মনপ্রাণ ভাসাইয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিলাল ক্রমাগত দুই দিনের চেষ্টায় ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিল। সপ্তাহ পরে যাত্রিক দিন দেখিয়া বিদেশ-যাত্রা করিল।
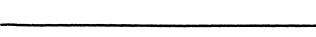
হরিলাল পথের সম্বল ১০৲ দশটী মাত্র টাকা লইল। যাত্রা-

কালীন ৪০৲টী টাকা জননীর হস্তে দিয়া কহিল,—"মা! আশীর্ব্বাদ করিও, আমার মনের আশা যেন সফল হয়। তোমার অমোঘ আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া চলিলাম। এই চল্লিশটি টাকায় তোমাদের কষ্টে-স্বষ্টে চারি পাঁচ মাস গুজরাণ চলিবে। ইহার মধ্যে ভগবান অবশ্য মুখ তুলে চাইবেন।"

ছোট ভাইটী গোপালকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া হরিলাল কম্পিত-কণ্ঠে কহিল,—"ভাই! সর্ব্বদা মন দিনে লেখা-পড়া ক'রো; মায়ের কথামত চ'লো। কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ কর' না। মনে রেখ'—আমরা বড় কাঙ্গাল।"

গোপাল ছলছল নয়নে হরিলালের মুখপানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদা! তুমি কবে ফিরবে?"

এই প্রশ্নে হরিলাল অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না। আঁখি-প্রান্ত দিয়া টস্ টস্ করিয়া অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল।

কম্পিত-কণ্ঠে হরিলাল কহিল,—"ভয় কি ভাই! মা রইল। পারি যদি, শীঘ্র এসে একবার তোমায় দেখে যাবো। মাঝে মাঝে আমায় পত্র দিও।"

এতক্ষণ দুঃখিনী জননী নীরবে শুনিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় মধ্যে দুঃখের প্রবলোচ্ছ্বাস বহিতেছিল; আর চক্ষুপ্রান্ত দিয়া উষ্ণধারা শীর্ণ গণ্ড গড়াইয়া পড়িতেছিল। হরিলাল যখন তাঁহাকে

প্রণাম করিয়া যাত্রা করিতে উদ্যত হইল, জননী আর হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই হস্তে প্রবাসগামী পুত্রের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"হতভাগিনী আমি, মরিলাম না কেন? চারটী ভাতের জন্য আমার বক্ষের ধনকে নিঃসম্বল অবস্থায় বিদেশ পাঠাইতেছি! কোথায় কার আশ্রয়ে মাথা লুকাইবে, কে ক্ষুধার সময় খেতে দিবে, কে আদর ক'রে দুটো কথা বল্‌বে! আমার কচি ছেলে, কোনও দিন ঘরের বাহির হয়-নি; আজ কিনা পোড়া পেটের দায়ে পাষাণে প্রাণ বেঁধে তাকে প্রবাসে পাঠাতে হ'ল! এস বাছা! যার কেউ নেই, ভগবান তার সহায়। দুঃখে বিপদে সুখে সম্পদে শয়নে জাগরণে ভগবানের নাম ভুলো না; তাঁর দয়ার উপর সর্ব্বদা নির্ভর করিও।"

হরিলাল ধীরে ধীরে জননীর বাহু-বেষ্টন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া প্রস্থান করিল।

যতক্ষণ দৃষ্টি-সীমা-বহির্ভূত না হইল, জননী ও ভ্রাতা সতৃষ্ণ নয়নে হরিলালকে দেখিতে লাগিলেন! অবশেষে মাতা-পুত্রে চক্ষু-জল মুছিতে মুছিতে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন।

ইহার পর কয়েকদিন পর্য্যন্ত স্নেহময়ী জননীর চক্ষুজল শুকাইল না। গোপালের মুখে হাসি ফুটিল না। ক্রমে সময়ের ব্যবধানে বিচ্ছেদের তীব্রতা প্রশমিত হইয়া আসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরিলাল কত স্থানে ঘুরিল; কত জনের তোষামোদ করিল; কত জনকে দুরাশার ছলনায় মুরুব্বি ধরিল; কত স্থানে কত জনের কটূক্তি শুনিল; কত বিদ্রূপ-বাক্য নীরবে সহ্য করিল; কিন্তু তাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না;—চাকরী জুটিল না। অবশেষে জাত্যভিমান দূরে ঠেলিয়া রেল-ষ্টেশনে কুলীর খাতায় নাম লিখাইতে চেষ্টা করিল। তাহার ঘুষ দিবার সংস্থানাভাব—কাজেই সেখানেও তাহার সকল যত্ন-চেষ্টা ব্যর্থ হইল। যে দশটি টাকা সম্বল ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়াছে। হরিলাল চতুর্দ্দিকে কেবলই নিরাশার অন্ধকার দেখিতে পাইল। তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, পথ-পর্য্যটনে ও অর্দ্ধাশনে তাহার দেহের বল অপচয়িত হইল। মুখ-চোখের লাবণ্য-প্রভা কোথায় মিশিয়া গেল।

শেষ কপর্দ্দকটি নিঃশেষিত। এক্ষণে উপায়? হরিলাল আর ভাবিতে পারিল না। অবসন্ন দেহ কাঁপিতে লাগিল। মাথায় হাত দিয়া পথিমধ্যে বসিয়া পড়িল। মস্তক ঘূর্ণিত, নয়নের দৃষ্টি ক্ষীণ, দেহ শীর্ণ, পদদ্বয় শিথিল—দেহ ভারবহনে অক্ষম। অনেকক্ষণ এ অবস্থায় অতিবাহিত হইল। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুই হস্তে দুই হাঁটুর উপর ভর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথায় কোন্ দিকে যাইবে, স্থিরতা নাই। লক্ষ্যশূন্য হরিলাল

ধীরে ধীরে সম্মুখবর্ত্তী পথানুসরণে চলিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিজ জেলার এক মহকুমায় উপস্থিত হইল। জনৈক ভদ্র-যাত্রীর সহিত আলাপ-পরিচয় হইল।

কথাপ্রসঙ্গে তাহার দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া সহযাত্রী ভদ্রলোকটি তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন,—"ভয় কি ভাই! এ সংসারে কাহারও চিরদিন সমান যায় না। তোমার এ দুঃখের দিন থাকিবে না। চল—হোটেলে চল; উভয়ে একত্র বাসা লইব। আপাততঃ তোমার হস্তে টাকা-কড়ি না থাকে, তাহার জন্য চিন্তা কি! আপাততঃ কয় দিনের খরচ যাহা প্রয়োজন হয়, আমি দিব। পরে সময় পাইলে না হয় তুমি পরিশোধ করিও।"

হরিলাল সেই ভদ্রযাত্রীটি সহ হোটেলে আশ্রয় লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যতই সন্ধ্যার ঈষৎ কৃষ্ণছায়া ঘনীভূত অন্ধকারে পরিণত হইতে লাগিল, ততই হোটেলে যাত্রীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যা-সমাগমে বিহঙ্গ-সমাকুল বৃক্ষের ন্যায় হোটেল-গৃহ জন-কোলাহল-মুখর হইয়া উঠিল। কত স্থানের কত লোক, কত বেশে, হৃদয়ে কত ভাবনা-চিন্তা লইয়া, হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কত ধরণের কথা, কত গল্প-গুজব, কত ঢঙ্গের কত হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল।

হরিলাল চিন্তাভারগ্রস্ত চিত্তে নীরবে এক কোণে উপবিষ্ট। কাহারও সহিত আলাপ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। তাহার সহযাত্রীটি পার্শ্বোপবিষ্ট অপর যাত্রীর সহিত গল্প করিতেছেন। হরিলাল নীরবে বসিয়া শুনিতেছে, আর অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে দীর্ঘ-নিশ্বাস বহির্গত হইতেছে।

সহসা জনৈক সুবেশধারী যাত্রী হোটেলে উপস্থিত হইলেন। ব্যবহারে বোধ হইল, সমাগত যাত্রিদলের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পরিচিত।

নবাগত যাত্রীটি উপবেশনান্তর সমাগত যাত্রিদলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তোমরা বুঝি ভাই একটা মজার সংবাদ শোন-নি? তবে শোন।"

কাহারও উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"সংবাদ বড় মজারই বটে! হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে বড় লোক হইবার ইচ্ছা থাকিলে, এ সুযোগ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।"

শ্রোতৃবর্গের ক্রমেই কৌতূহল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে "বলুন, বলুন, সংবাদটা কি—আগে বলুন" বহু কণ্ঠে সাগ্রহ অনুরোধ-বাক্য চলিতে লাগিল।

বক্তা বলিতে লাগিলেন,—"জমিদার আবদু সুভান চৌধুরীকে এ দেশে কে না জানে? তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী, দেশ-জোড়া নাম, প্রবল পরাক্রম। সম্প্রতি চৌধুরী সাহেব এক এস্তাহার জারি

করেছেন,—যদি কোনও ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ যুবক তাঁহার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তিনি তাঁহার পরম রূপবতী দুহিতার সহিত জমিদারীর চারি আনা অংশ তাকে সম্প্রদান কর্‌বেন। এই সেই এস্তাহার।"

এই বলিয়া বক্তা পার্শ্বোপবিষ্ট যাত্রীর হস্তে একখণ্ড মুদ্রিত বিজ্ঞাপন অর্পণ করিলেন।

শ্রোতৃবর্গের আগ্রহাতিশয্যে পার্শ্বোপবিষ্ট যাত্রী উচ্চ-কণ্ঠে বিজ্ঞাপনখানি আদ্যন্ত পাঠ করিল। যাত্রিমণ্ডলী বিস্মিত স্তব্ধীভূত। সহসা কেহ কিছু বলিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বা নীরবে আপন মনে উপস্থিত ঘটনা উপলক্ষে কতই সুখের কল্পনা করিতে লাগিল। কেহ বা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ ছলে কহিল,—"জমিদারীর লোভে জাতি-ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে অতি অল্প লোকেই ইচ্ছুক হইবে।"

অপর জনৈক যাত্রী এই উক্তির পালটা উত্তর গাহিতে যাইয়া কহিল,—"জমিদারের তত বেশী লোকের দরকার নাই। তাহার একমাত্র দুহিতা; সুতরাং একটি মাত্র বরের দরকার। একজন মাত্র বর জুটিলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। একে পরম রূপবতী ষোড়শী বালিকা; তাহার উপর লাখ টাকার জমিদারীর লোভ সম্বরণ করা,—বড় শক্ত কথা। আমরা সমবেত যাত্রিমণ্ডলী যদি অকপটে আপন আপন মনের ভাব ব্যক্ত করি, তাহা হইলে

এখনই দেখিতে পাইব যে, আমাদের মধ্যে চৌদ্দ আনা লোকই এ বিবাহ করিতে প্রস্তুত।"

এমন সময় আহার্য্য প্রস্তুত বলিয়া হোটেল অধিকারীর ডাক পড়িল। যাত্রিমণ্ডলী আহার করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে চলিয়া গেল।

হরিলালের সহযাত্রী তাহাকে কহিলেন,—"চল ভাই, খাইবে চল।"

হরিলাল নীরবে নতমুখে যাইয়া আহার করিতে বসিল। পরের কড়িতে আহার করিতে হইল বলিয়া হরিলালের চিত্তে বড় আঘাত লাগিল। কিন্তু উপায় কি? জঠর-জ্বালা—বড় জ্বালা।

আহারান্তে হরিলাল শয়ন করিল। সহসা নিদ্রা আসিল না। মাতার কথা—ভ্রাতার কথা মনে পড়িল। জীবনের ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান কত কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। কোথাও ক্ষীণ আলো-রেখা দৃষ্ট হইল না। জননীর হস্তে যে কয়টি টাকা দিয়া আসিয়াছিল, সে কয়টি এই সময় নিঃশেষিত হইয়া থাকিবে; এক্ষণে কি করিয়া মাতা-ভ্রাতার গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে! পুত্র বর্ত্তমানে জননী অনশনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন! কি ভীষণ দৃশ্য!

হরিলাল আর ভাবিতে পারিল না। সর্ব্বাঙ্গে তাড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় অনুতাপের তীব্রানল পরিব্যাপ্ত হইল। হরিলাল শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল। সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া হরিলাল পুনর্ব্বার শয়ন করিল। বহু সাধ্য সাধনার পর হরিলাল নিদ্রার অঙ্কে আশ্রয় পাইল। কিন্তু নিদ্রা স্বপ্নময়।

হরিলাল স্বপ্নে দেখিল,—তাহার দুঃখিনী মাতা ও প্রিয় ভ্রাতা যেন তাহার সমক্ষে উপস্থিত। অর্দ্ধাশনে কতকগুলি কঙ্কাল যেন চর্ম্মের আবরণে আবৃত। নয়ন কোটর-প্রবিষ্ট, চর্ম্মলোলিত, হস্তপদ শীর্ণ বিশুষ্ক, মস্তকের কেশরাশি রুক্ষ। কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! হরিলাল মাতা-ভ্রাতার বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। দুঃখে বিস্ময়ে হরিলাল চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন মনে হইল, গোপাল অশ্রু-নিষিক্ত নয়নে হরিলালের মুখপানে দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিয়া বলিতেছে,—'দাদা প্রাণ যায়, খেতে দাও। এই দেখ না দাদা, মায়ের অবস্থা দেখ। আমরা মায়ের কুসন্তান, পুত্র থাকিতে জননী অনশনে মরণোন্মুখ। দাদা, দেরী ক'রো না; প্রাণ যায়। শীঘ্র খেতে দেও। দিবে না—খেতে দিবে না! এই চল্লেম, মায়ের হাত ধরে এখনি উভয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে সকল জ্বালা জুড়াব।" এই বলিয়া গোপাল যেন মায়ের হাত ধরিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইল।

হরিলাল 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল। সে চীৎকারের রবে পার্শ্বের নিদ্রিত যাত্রিগণ নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠিল।

হরিলাল নিদ্রা-ভঙ্গেও প্রত্যক্ষবৎ মাতা-ভ্রাতাকে নয়ন-সমক্ষে দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। নীরবে চক্ষুপ্রান্তে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। হরিলাল অস্থির-চিত্তে অবশিষ্ট রজনী বসিয়া বসিয়া কাটাইয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নগরোপকণ্ঠে আবদুস্ সুভান চৌধুরীর বৃহৎ ভবন অবস্থিত। ফটক-সম্মুখে কুসুমোদ্যান; দেশী বিলাতী বিবিধ কুসুমরাজিতে উদ্যানভূমি সুশোভিত।

ফটক পার হইয়া সম্মুখে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই দক্ষিণ পার্শ্বে চৌধুরী সাহেবের বিরাট অট্টালিকা নয়নপথে পতিত হয়। বামপার্শ্বে কাছারি-দালান, তৎপার্শ্বে দপ্তরখানা। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মনোহর অট্টালিকায় চৌধুরী সাহেবের বৈঠকখানা।

দিবা পূর্ব্বাহ্ন নয় ঘটিকা। তখন সপারিষদ চৌধুরী সাহেব সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে 'বার' দিয়া বসিয়া আছেন। উচ্ছিষ্ট-লোলুপ সারমেয়বৎ চাটুকারবৃন্দ প্রসাদ-লাভ আশায় চৌধুরী সাহেবের পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া সুরসাল বাক্য-ধারায় তাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে। অদূরে পর্দ্দার অন্তরালে খিদমৎগিরের দল ফিস্ ফিস্ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। চাটুকারবৃন্দের অহেতুকী হাস্য-রোলে কক্ষদেশ মুখরিত। পরনিন্দা ও তদনুগামী আত্মশ্লাঘা

এবং পরগৃহের কুৎসাকাহিনীই প্রধানতঃ আলাপ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত।

শুনিয়াছি, ক্বচিৎ অহিফেনসেবীদের অহিফেন না হইলেও চলে; কিন্তু এদেশের বড় লোকদের তোষামোদ-বাক্য অভাবে বুঝি এক মুহূর্ত্তও চলে না। না জানি, ইহাতে কি এক বিশেষ মাদকতা আছে!

সহসা জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া, বিনীত-ভাবে চৌধুরী সাহেবকে সেলাম করিয়া, সঙ্কুচিত ভাবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। তৎপ্রতি কেহ বড় একটা লক্ষ্য করিল না। হাসিগল্প পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর আগন্তুক যুবকের প্রতি চৌধুরী সাহেবের দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি স্বাভাবিক মিষ্টবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যুবক! এখানে কি প্রয়োজনে আসিয়াছ? যাহা বলিবার থাকে, নিঃসঙ্কোচে বল।"

আগন্তুক যুবক উৎসাহ পাইয়া হস্তস্থিত এক খণ্ড কাগজ প্রদর্শন করিয়া বলিল,—"এ বিজ্ঞাপন কি সত্যসত্যই আপনার প্রচারিত?"

চৌধুরী।—"হঁা, ইহাতে তোমার কি প্রয়োজন?"

আগন্তুক।—সে কথা পরে হইবে। এক্ষণে আমার নিবেদন, যাহা বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে, প্রকৃতই কি তাহা আপনার অভিপ্রেত?"

চৌধুরী।—"অপ্রকৃত বলিয়া সন্দেহ হইবার কি কারণ আছে!"

আগন্তুক ক্ষণেক ইতঃস্তত করিয়া কহিল,—"এ দীনের অজ্ঞতা মাপ করিবেন। এরূপ অভিনব সঙ্কল্পের কারণ কি?"

চৌধুরী সাহেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"ধর্ম্ম-সংস্কার। কাফেরকে ইসলাম-ধর্ম্মের পবিত্রালোকে আনিতে পারিলে, পারত্রিক শুভসাধন হয়।"

যুবক স্তম্ভিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চৌধুরী সাহেব স্মিতমুখে কহিলেন,—"যুবক! সম্মুখস্থিত আসনে উপবেশন করিয়া আমার কয়েকটি প্রশ্নের সমুচিত উত্তর প্রদান কর।"

আগন্তুক যুবক আদেশানুসারে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল।

চৌধুরী সাহেব কহিলেন,—"যুবক, এত কথা জানিবার তোমার উদ্দেশ্য কি?"

যুবক।—"উদ্দেশ্য—বিজ্ঞাপনের সত্যতা নির্ণয় করা।"

চৌধুরী।—"তা হলে ভরসা করি, বিজ্ঞাপনে কথিত বিষয়ে এতক্ষণে তুমি নিঃসন্দিহান হইয়াছ!"

যুবক।—"আমার সংশয় সম্পূর্ণ দূর হয়েছে।"

চৌধুরী।—"এক্ষণে তোমার বক্তব্য কি?"

যুবক।—"এ দীন আপনার দুহিতার পাণিপ্রার্থী।"

চৌধুরী সাহেব সহাস্যমুখে কহিলেন,—"উত্তম; বড় সুখী হলেম। আমি যাহা যাহা চাহিয়াছিলাম, তোমাতে সে সকলই বর্ত্তমান দেখিতে পাইতেছি। একে ব্রাহ্মণ-নন্দন; তাহাতে আবার সুকান্ত যুবাপুরুষ। তোমার বিনয়-নম্র স্বভাবের, অধিকন্তু তোমার বুদ্ধির তীক্ষ্নতার পরিচয় পাইয়া একান্ত প্রীত হইয়াছি। কিন্তু বৎস, তুমি যদি অগ্র-পশ্চাৎ বিচার না করিয়া চিত্তের সাময়িক আবেগ-বশে জাতি-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে এখনও অনুরোধ করিতেছি, তুমি নিরস্ত হও।"

যুবক।—"আমি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়াই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।"

চৌধুরী।—"না হয় আরও দু'চার দিন আপন মনে বিচার-বিতর্ক ক'রে দেখ। শেষ অনুতাপ করতে না হয়।"

যুবক।—"মনে মনে যথেষ্ট বিচার-বিতর্ক ক'রে দেখেছি। বহু বিচার-বিতর্কের পর যে কার্য্য স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে কর্‌ছি, তাতে অনুতাপ কর্‌তে হবে কেন?"

চৌধুরী।—"মানুষের বিচার-সিদ্ধান্ত অনেক স্থলে নির্ভুল নহে। তোমার অভিভাবক কেহ আছেন?"

যুবক।—"না। পিতৃদেব স্বর্গগত। আমার অপর অভিভাবক কেহ নাই।"

চৌধুরী।—"তোমার দৃঢ়-সঙ্কল্প জানিয়া নিশ্চিন্ত হ'লাম। তবে

বৎস, আগামী জুম্মাবারে পূর্ব্বাহ্ন নয় ঘটিকার সময় হাজির হইও; বিবাহের সমস্ত স্থির করা যাবে।"

"যে আজ্ঞে" এই বলিয়া যুবক বিনীতভাবে কুর্‌নিশ করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে চৌধুরী সাহেব বাধা দিয়া কহিলেন,—"বৎস, দেখিতেছি তোমার কিছু অর্থের প্রয়োজন। খানিক অপেক্ষা কর।"

যুবক ফিরিয়া দাঁড়াইল। চৌধুরী সাহেব ক্যাস্‌বাক্স খুলিয়া কুড়িটী রৌপ্যমুদ্রা যুবকের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন,—"আপাততঃ এই টাকাতে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিও। আগামী জুম্মাবারে আসিতে যেন ভুলিও না। তবে এস বৎস।"

যুবক চলিয়া আসিল। ডাকঘরে যাইয়া দশ টাকা মণিঅর্ডার করিল। তার পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গন্তব্যাভিমুখে রওনা হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আজি জুম্মাবার। পূর্ব্বাহ্ন নয় ঘটিকা। পূর্ব্ব কথামত সেই যুবক চৌধুরী সাহেবের দরবারে হাজির।

চৌধুরী সাহেব সহাস্য-মুখে কহিলেন,—"বৎস, প্রতিশ্রুতি-সংরক্ষণে তুমি বিশেষ যত্নপর দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। ইহাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। যাহার কথার স্থিরতা নাই, সে মনুষ্য নামের

অযোগ্য। একমাত্র এই গুণে তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ-মমতা আসিয়াছে। সেই স্নেহ-মমতার উত্তেজনা-বশে আবারও তোমায় অনুরোধ করিতেছি, তুমি এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। শেষ হয় তো অনুতাপ করিবে।"

যুবক দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ে আপনি যথা-কর্ত্তব্য করুন।"

চৌধুরী।—"আমার তো বৎস, কর্ত্তব্য স্থির করাই আছে! তুমি যখন কৃতসঙ্কল্প, তখন প্রস্তাবিত কার্য্য-সম্পাদনে বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন। আজই সব হয়ে যাবে। তবে কথা এই, কাফেরকে কন্যাদান করা আমাদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।"

যুবক চমকিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহাই যদি আপনা-দের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আদেশ, তবে এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্য কি?"

চৌধুরী সাহেব স্থিরকণ্ঠে কহিলেন,—"বৎস, আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা শেষ করিতে দেও। আমার কথা এই, অগ্রে তোমাকে কালমা পড়িয়া ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। মোল্লা সাহেব উপস্থিত আছেন। কালমা পাঠ হয়ে গেলে, কন্যা-দান পক্ষে আমার কোনই আপত্তি থাকিবে না। তবে বৎস, প্রস্তুত হও।"

যুবক।—"আমি প্রস্তুত আছি।"

এই কথা বলিবার সময় তাহার হৃদয়ে জোরে একটা কিসের আঘাত লাগিল। কণ্ঠ কম্পিত হইল। সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

"তবে এস বৎস!"—এই বলিয়া সপারিষদ চৌধুরী সাহেব যুবক ও মোল্লা সাহেব সমভিব্যাহারে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন। তথায় আরও দুই চারি জন পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত ছিল। চৌধুরী সাহেবের ইঙ্গিতক্রমে আসাদ উল্লা যুবককে যথারীতি কালমা পাঠ করাইয়া ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তাহার নূতন নাম হইল—মহম্মদ হায়দার আলী। নামের সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত হইল। হায়দার আলী ইজার চাপকান এবং টুপি ধারণ করিল! সেই দিন হইতে চৌধুরী সাহেবের গৃহে হায়দার আলী স্থান প্রাপ্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মতিয়া ষোড়শী অপূর্ব্ব সুন্দরী। সরোবর-বক্ষে সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত কমলিনীর ন্যায় মতিয়ার শোভা-সৌন্দর্য্যে অন্তঃপুর আলোকিত। তাহার দয়া-স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসায় পরিজনবৃন্দ তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত। মতিয়া পরের জন্য কাঁদিতে জানে, পরের দুঃখ-বিপদ আপনার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে।

মতিয়া আপন কক্ষে বসিয়া জনৈক প্রতিবেশীর শিশু-পুত্রকে

আদর-সোহাগ করিতেছে, এমন সময় তাহার প্রধানা সহচরী জুলেখা হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইল।

মতিয়া বীণার ঝঙ্কারবৎ মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"সখি, কি কথায় কোথা থেকে হাস্‌তে হাস্‌তে এলে?"

জুলেখা সহসা কোনও উত্তর না দিয়া কেবলই হাসিতে লাগিল। মতিয়া অবাক হইয়া জুলেখার মুখপানে কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জুলেখা কহিল,—"সুখবর শুন্‌তে পেলে কে না হেসে থাক্‌তে পারে বল?"

মতিয়া হাসির শুভ্র জ্যোৎস্না ফুটাইয়া কহিল,—"এখন হাসির বেগ থামিয়ে তোর সুখবরটাই বল্‌-না ভাই শুনি।"

জুলেখা।—"আগে প্রাণ খুলে হাস্‌তে দাও, তার পর সুখবর শুনো।"

মতিয়া বিস্মিত। তাহার কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে জুলেখা কহিল,—"সখি! এক্ষণে আমার সুখবরটা মন দিয়া শুন। তখন যেন সখি আমাদের ভুলে যেও না। বিয়ের সবই স্থির, বর হাজির। কেবল মোল্লা ডেকে সাদী পড়ান বাকি। তুমি যেমন রূপে পরীকে হার মানিয়েছ, বরটিও তেমনি জুটিয়েছ ভাল। আহা—কি মুখ, কি চোখ! যেন কাটারিতে কাটা।"

মতিয়ার প্রভাত-পদ্মবৎ ঢল ঢল মুখে লজ্জার রক্তিম রাগ ফুটিয়া উঠিল। মতিয়া ব্রীড়াভরে মস্তক অবনত করিল।

জুলেখা হাসিতে হাসিতে মতিয়ার চিবুক ধারণ করিয়া কহিল,—"সখি, আমাদের কাছে এত লজ্জা! ছি!—এমন সুখবর শুনালাম! বক্‌সিস দেওয়া তো দূরের কথা;—মুখে দুটো ধন্যবাদও দিলে না!"

সহসা কক্ষান্তর হইতে দ্বিতীয় সখী বেলা আসিয়া কহিল,—"জুলেখা! এমন সোণার চাঁদ বর কোথা হতে জুট্‌লো?"

জুলেখা কহিল,—"সে তো বর নয় লো—সে বর নয়! হিন্দুর মধ্যে সেরা জাতি—বামুনের ছেলে। এই মাত্র কালমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। রূপ যেন উছ্‌লে পড়ছে! বিয়ে হয়ে গেলে যখন সুখে খেতে পর্‌তে পাবে, তখন সে রূপ চার গুণ বেড়ে উঠ্‌বে।"

বেলা বিস্মিত-ভাবে কহিল,—"বলিস্‌ কি সখি! বামুনের ছেলে! সত্যি সত্যি জাতি-ধর্ম্ম খুইয়ে বসেছে?"

জুলেখা।—"তা নয় তো কি? এমন পরীর মত নারী পেলে, তেমন্‌ তেমন্‌ মিন্‌সেও জাতি-ধর্ম্ম খোওয়াতে প্রস্তুত হয়!"

বেলা।—"সখি! সত্যি বল্‌ছিস্‌? না—তামাসা কর্‌ছিস্‌?"

জুলেখা উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিল,—"যা যা পোড়ারমুখী, আমার কথায় অবিশ্বাস! আল্লার কসম,—যদি এক রত্তি মিথ্যা বলে থাকি।"

সহসা মতিয়ার বদন-শ্রী, মেঘঢাকা চাঁদের মত, বিষাদের কৃষ্ণ-ছায়ায় মণ্ডিত হইল। মতিয়া চিন্তাভারগ্রস্ত চিত্তে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

মতিয়া চৌধুরী সাহেবের প্রকৃতি জানিত। মনে মনে কহিল,—"না জানি, পিতা আবার কি খেলা খেলছেন!"

ভাবিতে ভাবিতে বালিকার সদাপ্রফুল্ল-চিত্ত অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার মুখের হাসি কোথায় যেন মিশিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দিবসত্রয় অন্তর নব-দীক্ষিত হায়দার আলী, চৌধুরী সাহেব সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া, আশু বিবাহ-কার্য্য সম্পাদনের প্রস্তাব করিল।

চৌধুরী সাহেব নীরবে তাহার কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার মুখে বিরক্তির ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সহসা কোনও উত্তর করিলেন না। ক্রমে বিরক্তির ছায়া ক্রোধ-রাগে পরিণত হইল। চাটুকার-বৃন্দ তাহা লক্ষ্য করিয়া ভীত হইল।

অনেকক্ষণ পরে চৌধুরী সাহেব মুখব্যাদান করিলেন। কণ্ঠ-স্বর শ্রবণে হায়দার আলী চমকিয়া উঠিল।

চৌধুরী সাহেব কহিলেন,—"হায়দার আলী! তুমি আমায়

ভুল বুঝিয়াছ। যে ব্যক্তি একটা বালিকার লোভে অবলীলা-ক্রমে জাতি-ধর্ম্ম খোওয়াইতে পারিয়াছে, তেমন ব্যক্তির হস্তে আমার একমাত্র নন্দিনীকে সমর্পণ্ করিব,—ইহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। তুমি যদি আমাকে এত নীচ মনে করিয়া থাক, তবে তোমার সম্পূর্ণ ভুল।”

জনৈক চাটুকার রসনা-কণ্ডুতি সহ্য করিতে না পারিয়া উপযুক্ত সুযোগ-লাভে বলিয়া উঠিল,—“ইহাকেই বলে বামন হয়ে চাঁদ ধরার প্রয়াস। হায়দার আলী! তুমি বাতুল, তাই দুরাশায় মজিয়াছিলে। এক্ষণে মানে মানে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আর, দুরাশা পরিত্যাগ করে, যমের খাতায় দাখিল না হওয়া পর্য্যন্ত, খোদাতাল্লার আরাধনায় মনোযোগী হও।”

হস্তদ্বয় ব্যবধানে বিষধর ভুজঙ্গকে ফণা বিস্তার করিতে দেখিয়া মানুষ যেমন ভীত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়, চৌধুরী সাহেবের প্রতারণা বাক্য শ্রবণে হায়দার আলী ততোঽধিক ভীত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। সে চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে চিন্তাবেগ কিয়ৎ-পরিমাণে প্রশমিত হইলে হায়দার আলী কহিল,—“ইহাই কি ইসলাম-শিষ্য প্রবল প্রতা-পান্বিত ভূম্যধিকারীর প্রতিজ্ঞা-পালন! তবে আমি দুঃখ-বিপদে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত ছিলাম, তাই আমি অবোধ কুরঙ্গের

ন্যায় সাধ করিয়া প্রতারণা-জালে আবদ্ধ হইয়াছি। আমি দীন, সহায়-সম্বল-বিহীন, দারিদ্র্য-পীড়নে আত্মবিস্মৃত, মানব-চরিত্রে অনভিজ্ঞ, সংসারজ্ঞানশূন্য; তাই আপনি প্রতারণা-জালে আবদ্ধ করিয়া, আমার জাতি-ধর্ম্ম নাশ করিয়া, আমায় কুকুরের ন্যায় পদতাড়িত করিতেছেন। জগতে যদি ধর্ম্ম থাকে, ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে এক দিন ইহার বিচার হইবে। মানুষের হস্তে অবশ্য ন্যায়-বিচারের প্রত্যাশা নাই।"

এই বলিয়া হায়দার আলী চলিয়া আসিল।

হায়দার আলী চলিয়া আসিল বটে; কিন্তু কোথায় আশ্রয় পাইবে, এমন স্থান খুঁজিয়া পাইল না। জমিদার-গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। অনুতাপানলে তাহার হৃদয় বিদগ্ধ হইতে লাগিল।

একবার ভাবিল,—"ইহাই তাহার উচিত শাস্তি! জাতি-ধর্ম্মের বিনিময়ে এ দণ্ড—এমন কঠিন দণ্ড নহে।"

দেহ অবসন্ন, পদদ্বয় শিথিল, হৃদয় বিদগ্ধ। হায়দার আলী অদূরে এক সরোবর-তীরে বসিয়া পড়িল। তাহার নয়ন-প্রান্ত দিয়া উষ্ণ অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মনে মনে কহিল,—"সত্য সত্যই কি আমি ভগবানের নিকট অপরাধী! আমি তো আত্ম-সুখের আশায় রূপের কুহকে জাতি-ধর্ম্ম বিক্রয় করি নাই! অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট জননীর ও ভ্রাতার সুখ-সংবিধান আশায় আত্ম-

বলিদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। হায়! না জানি, আমার দুঃখিনী জননী ও প্রাণ-তুল্য প্রিয় ভ্রাতা কত কষ্টে দিন কাটাইতেছে। স্বপ্নে মাতা-ভ্রাতার কঙ্কাল-সার মূর্ত্তি দেখিয়া হিতাহিত জ্ঞান-হারা হইয়াছিলাম। ভগবান! এ হৃদয় তুমি দেখিতেছ? তুমি অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ! অন্তরের বেদনা কি তুমি বুঝিবে না?"

হায়দার আলী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না—অবসন্ন-দেহে বৃক্ষমূলে হেলিয়া পড়িল। গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া অশ্রু-ধারা বৃক্ষমূলে পতিত হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

জমিদার-গৃহের ধাত্রী সকিনা বিবি কার্য্য-ব্যপদেশে সরোবর-তীরস্থ পথ বাহিয়া যাইতেছিলেন। হায়দার আলীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সকিনা বয়সে প্রৌঢ়া; তাঁহার বদনে পবিত্রতার আভা প্রতিফলিত;—হৃদয় দয়া-স্নেহে পরিপূর্ণ। হায়দার আলীর চক্ষে অশ্রুধারা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল।

সকিনা বিবি হায়দর আলীর সমক্ষে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। স্নেহসিক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আহা, তুই কোন্ দুঃখিনীর বাছনি রে বাপ!"

এই বলিয়া ওড়নার অঞ্চল-কোণে হায়দার আলীর অশ্রুধারা মার্জ্জনা করিলেন।

হায়দার উঠিয়া বসিল। সকিনা বিবির মুখপানে কৃতজ্ঞ-নয়নে দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া দেখিল,—মাতার দয়া, মাতার স্নেহ সে মুখে প্রতিফলিত। মুহূর্ত্তে আবার তাহার চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। উদ্বেলিত বাষ্প-প্রবাহে তাহার কণ্ঠাবরোধ হইয়া আসিল। হায়দার সহসা কোনও উত্তর করিতে পারিল না। সকিনার চক্ষুও বিশুষ্ক রহিল না।

অনেকক্ষণ পর হায়দার আলী কহিল,—"মা, আমি বড় হতভাগ্য! আমার ন্যায় হতভাগ্যের মরণ বুঝি বিধাতার অভিপ্রেত নহে। তাই এ মর্ম্মদাহে বিদগ্ধ হইতেছি। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র—দারিদ্র্য-পীড়নে প্রপীড়িত। জীবিকা-অর্জ্জন আশায় আজ পাঁচ মাস কাল নিঃসঙ্গ নিঃসম্বলাবস্থায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। গৃহে দুঃখিনী মাতা ও সংসার-জ্ঞানবিহীন বালক ভ্রাতা নিয়ত অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট। সে দিন স্বপ্নে দেখিলাম,—মাতা ভ্রাতা অনশনে মরণোন্মুখ; আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। চৌধুরী সাহেবের প্রলোভনে পড়িলাম। তিনি এস্তাহারে প্রতিজ্ঞা ক'রে বলেছিলেন,—'যদি কোনও ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ যুবক তাঁহার একমাত্র দুহিতার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হয়, তবে তিনি কন্যাসহ লক্ষ টাকার জমিদারী সম্প্রদান করিবেন। তাঁহার প্রচারিত বিজ্ঞাপন-পাঠে আত্ম-বিস্মৃত হইলাম। মাতা ভ্রাতার কষ্ট দূর করতে যেয়ে জাতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

চৌধুরী সাহেব আমায় প্রলোভনে প্রতারিত করিলেন। তাঁহার অনুরোধে কালমা পড়িয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। আমার যাহা হইবার, তাহাই হইল। আজ চৌধুরী সাহেব কুকুরের ন্যায় পদতাড়িত করিলেন। এক্ষণে কোথায় দাঁড়াই? মা! আমার মাতা-ভ্রাতার দশা এতক্ষণ কি হইয়াছে—তাহাও জানি না। বুঝি বা তাহারা অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকিবে। মা! আমার দশা দেখ। সমাজের চক্ষে ঘৃণিত অবজ্ঞাত স্বসমাজের সাহায্য-সহানুভূতিলাভে চিরতরে বঞ্চিত, এ হতভাগ্য কোথায় দাঁড়াইবে, মা! যখন দুখিনী জননী না খেতে পেয়ে মৃত্যু-শয্যায় এ হতভাগ্যের নাম করে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ কর্‌বেন, স্নেহের পুতলি একমাত্র ভ্রাতা মৃত্যুশয্যায় এ হতভাগ্যের নামে শত ধিক্কার প্রদান কর্‌বে, নিষ্ঠুর কাপুরুষ বলে আমার প্রতি শত কটূক্তি প্রয়োগ কর্‌বে, তখন বুঝি মা বিধাতা অবিচলিত থাকিতে পারিবেন না। তখন—তখন কি এ নরাধমের মস্তকে বিধাতার শত অভিশাপ বর্ষিত হইবে না?"

সকিনা নীরবে শুনিতেছিলেন। আর সহানুভূতির উত্তেজনা-বশে তাঁহার চক্ষু-প্রান্ত দিয়া পবিত্র অশ্রুধারা বহিতেছিল।

সকিনা অশ্রু-মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন,—"বল বাছা, চৌধুরী সাহেব কি বলে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

হায়দার আলী।—"যে ব্যক্তি একটা বালিকার লোভে জাতি-ধর্ম্ম ত্যাগ করে বসেছে—তিনি এত নীচ নহেন যে, তেমন ব্যক্তির

হস্তে তাঁহার একমাত্র দুহিতা সমর্পণ করিবেন। মা! এই বুঝি এ অর্ব্বাচীন নরাধমের উচিত দণ্ড! কিন্তু মা, আমি তো আত্ম-সুখের আশায় জাতি-ধর্ম্ম হারাই নাই! ভগবান সর্ব্বজ্ঞ; তিনি নিশ্চয় এ হৃদয় দেখিতেছেন।"

চৌধুরী সাহেবের প্রতি সকিনা বিবির দারুণ ঘৃণা সঞ্চারিত হইল। সকিনা মনে মনে কহিলেন,—"এটা আর তাঁর পক্ষে নূতন কার্য্য নহে। এমন শত শত পাপ কার্য্য তাঁহার দ্বারা নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে।"

তিনি মাতৃবৎ স্নেহে হায়দার আলীর চক্ষু-জল মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন,—"বাছা, চল—আমার গৃহে চল। আমি যথাসাধ্য তোমার মাতৃ-স্নেহের অভাব দূর করিব।"

"এস—তবে বাছা।" এই বলিয়া সকিনা বিবি হায়দার আলীকে লইয়া আপন গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ন কালে মতিয়া রোয়াকে বসিয়া সহচরীবৃন্দের সহিত গল্প-গুজব করিতেছিল। এমন সময় সকিনা বিবি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে তাহাদের গল্প-স্রোতে বাধা পড়িল। মতিয়া আনত-বদনে এক পার্শ্বে সরিয়া বসিল।

সকিনা বিবি অনুযোগ-বিজড়িত কণ্ঠে মতিয়াকে সম্বোধন
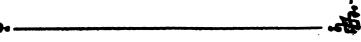
করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অভাগী, তোর উপলক্ষে এ পুরীতে না জানি আরও কত পাপকার্য্য সংঘটিত হবে। যেমন পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিস্, তদনুরূপ কার্য্যফল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে! তোর সতী-মা স্বর্গে গিয়েছেন—হাড় জুড়িয়েছে। এ অভাগিনীর যদি মৃত্যু হত, তাহ'লে আজ এ সকল ঘৃণিত পাপকার্য্য দেখ্‌তে শুন্‌তে হত না।"

মতিয়া শৈশবে মাতৃহীনা। সকিনা মাতৃবৎ স্নেহে তাহাকে লালনপালন করিয়াছেন। সকিনাকেই মতিয়া মা বলিয়া জানে, মাতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করে। মতিয়ার যত আব্দার-বায়না সকিনার কাছে। সকিনাও মতিয়াকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন।

সকিনা বিবির তিরস্কারের কারণ মতিয়া খুঁজিয়া পাইল না। না জানি, কোন্ অজ্ঞাত অপরাধে মা তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়াছেন,—এই আশঙ্কায় মতিয়া বড় ভীত হইল।

মতিয়া ভয়-বিজড়িত কণ্ঠে কহিল,—"আমি তো, মা, জেনে শুনে কোনও অপরাধ করি-নি।"

সকিনা।—"তোর নাম করে,—তোর পাপবুদ্ধি পিতা, নিরীহ হিন্দু-সন্তানের জাতিধর্ম্ম নাশ করে শেষ কিনা শেয়াল-কুকুরের ন্যায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন? এ পাপ কি তোর প্রতি বর্ত্তে না! আর—"

জুলেখা বাধা দিয়া কহিল,—"তবে কি সেই বামুনের ছেলেকে

কর্ত্তা সাহেব তাড়িয়ে দিয়েছেন! তিনি তো সে দিন কালমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন! আমরা তো আশা করে বসে আছি, দুই চার দিন মধ্যে মতিয়ার সহিত তাঁর বিয়ে হবে। হাঁ মা, সত্যি সত্যি তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন কি?"

সকিনা।—"তা নয় তো কি? এতক্ষণ তবে মাথামুণ্ডু কি বক্‌ছি!"

জুলেখা।—"কি বলে তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন!"

সকিনা কহিলেন—"পাপীর কি কোনও কাজ অসাধ্য আছে, বাছা! পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ থাক্‌লে কি তেমন প্রতারণার কার্য্য কেউ কর্‌তে পারে? আপনি ওকে আশা ভরসা দিয়ে ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌লেন; শেষ কিনা বল্‌লেন,—যে ব্যক্তি একটা বালিকার লোভে জাতিধর্ম্ম খোওয়াতে পারে, তেমন ব্যক্তির হস্তে তিনি কন্যাদান কর্‌তে পারেন না! নিরীহ ব্রাহ্মণ-সন্তানের সর্ব্বনাশ-সাধন কর্‌তে এরূপ প্রতারণা-জাল বিস্তার করা কেন? আহা কি সুন্দর বরটী গা। যেমনি মুখ, তেমনি চোক, তেমনি স্বভাব। এ বরের সঙ্গে বিয়ে হলে, আমার মতিয়া নিশ্চয় সুখী হতে পার্‌তো। কুবুদ্ধি পিতার দোষে তা ঘটলো না। শেষ কিনা আকাট চাষার ছেলে ধরে এনে এমন সোণার চাঁদ মেয়েকে ডালি দেবেন। অভাগীর অদৃষ্টে সুখ নেই; একা আমি বৃথা কেঁদেকেটে কি কর্‌ব!"

মতিয়া কহিল,—"মা! যে কার্য্যে আমার হাত নেই, তেমন

কার্য্যে যদি ভগবানের কাছে অপরাধী বলে গণ্য হই, তাহ'লে মা, আমি ইহার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে প্রস্তুত আছি। বল মা, আমায় কি করতে হবে—বল।"

সকিনা সে কথার উত্তর প্রদান না করিয়া কহিলেন,—"কি সুন্দর ছেলে মা! মুখ দেখ্‌লে শত্রুরও প্রাণ জুড়ায়। আমি তো বাছা ওকে দেখ্‌বা মাত্র আপন ছেলের মত ভাল-বেসে বসেছি। ওর প্রতি স্নেহ-মমতা আমি কিছুতে ছাড়তে পার্‌ব না।"

মতিয়া স্বাভাবিক মৃদু-কণ্ঠে কহিল,—"যিনি মা, তোমার পুত্র-স্থানীয়, তিনি নিশ্চয়ই আমার ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র। আমি অন্তরে অন্তরে চিরকাল তাঁর প্রতি ভক্তিমতি থাকৃব, তাঁর মঙ্গল কামনা কর্‌ব, তাঁর দুঃখ কষ্ট দূর কর্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব।"

উত্তর শুনিয়া মতিয়ার প্রতি সকিনা মনে মনে বড় প্রীত হইলেন। তাঁহার শান্ত জ্যোতিঃমণ্ডিত বদন-শ্রী প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। হৃদয়ের বিষাদভাব অপেক্ষাকৃত লাঘব হইল।

সকিনা মনে মনে বলিলেন,—"সাবাস্‌ মেয়ে, তোর দ্বারা সতীমায়ের গর্ভ-যাতনা সার্থক হবে!" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আহা দুঃখিনীর বাছা বড় কষ্টে জাতিধর্ম্ম খোওয়ায়ে বসেছে। মায়ের কষ্ট ভাইএর কষ্ট অন্য উপায়ে দূর কর্‌তে পারে-নি

বলে, তোর পিতার কুহক-জালে প্রতারিত হয়েছে। মাতা-ভ্রাতার জন্য যে ব্যক্তি নিজেকে বলিদান কর্‌তে পারে, সে তো সাক্ষাৎ দেবতা!"

মতিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রোয়াকে ফিরিয়া আসিয়া সকিনার হস্তে তিন শত রজত-মুদ্রা প্রদান করিয়া কহিল,—"মা, এই টাকাগুলি তাঁকে দিও। তাঁর তো মা স্ব-গৃহে ফিরে যাবার যো নেই! তিনি যেন আশ্রয় শূন্য না হন। তোমার গৃহে তাঁকে রেখ। যতদূর সাধ্য, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব। তুমি মা, আমায় ক্ষমা কর; একবার হাসি মুখে কথা কও।"

মতিয়ার মুখপ্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া, তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সকিনা কহিলেন,—"মতিয়া, আমার স্নেহের ধন মতিয়া! বড় দুঃখে তোকে দুটো শক্ত বলেছি। কোনও দিন তোর প্রতি রাগ কর্‌তে পারি-নি। তোর মুখপানে তাকালে রাগ করা কি যায়—মা? তুই বিনে আমার আর কে আছে, বাছা! তুই যে আমার যথা-সর্ব্বস্ব।"

বলিতে বলিতে সকিনার স্নেহ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। চক্ষু-কোণে অশ্রু সঞ্চারিত হইল। দুই বাহু-বেষ্টনে মতিয়াকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া সকিনা তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন।

সকিনার অনাবিল মাতৃ-স্নেহে মতিয়া গলিয়া গেল। মতিয়ার

নীলোৎপলতুল্য নয়ন-কোণে প্রভাত-পদ্মদলস্থিত শিশির-বিন্দুর ন্যায় অশ্রুবিন্দু টল টল করিতে লাগিল।

সকিনা মতিয়ার চক্ষুঃজল মুছাইয়া দিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গৃহে পৌঁছিয়া স্নেহময়ী সকিনা বিবি, মতিয়া-প্রদত্ত অর্থ হায়দার আলীর হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন,—"বাছা, ইহার কতক বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও।"

হায়দার আলী সকৃতজ্ঞ-নয়নে সকিনার মুখপানে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া কহিল,—"মা, তোমার স্নেহ-ঋণ এ জীবনে শোধ দিতে পার্‌ব না। হতভাগ্য আমি, কখনও ভাবি নাই—তোমার ন্যায় স্নেহময়ী আমার মাতার স্থান অধিকার করিবে।"

সকিনা কহিলেন,—"সে কথা যাক্। বাছা! এক্ষণে তুমি স্নান করে এসে একটু জলখাবার খাও।"

বিকাল বেলায় হায়দার আলী গোপালের নামে দুই শত টাকার মনি-অর্ডার করিয়া আসিল।

গোপালকে লিখিল,—"ভাই, তোমার ও মার জন্য আবশ্যক-মত কাপড় কিনিও। ঘর দু'খানি এই সময় সারাইয়া লইও। দেখিও, মার যেন কোনও কষ্ট না নয়। মার জন্য আগেকার মত পূজার

ফুল তুলিয়া দিও। মহাজনের সুদে আসলে যাহা প্রাপ্য হয়, তাহা দিয়া জমী-বাড়ী বন্ধক হইতে খালাস করিয়া লইও। যখন যাহা কর, রামনিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া করিও। মাকে আমার প্রণাম জানাইও। তুমি মন দিয়া লেখাপড়া করিও। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বদা পত্র লিখিও।"

ঠিকানা দিল,—"সকিনা বিবির বাড়ী।"

সকিনা বিবি ভাবিলেন,—"পাপমতি চৌধুরীর তাড়িত হায়দার আলীকে আমার গৃহে আশ্রয় দিয়াছি; চৌধুরী জানিতে পারিলে, অনর্থ ঘটাইতে পারে।" সুতরাং সকিনা স্থির করিলেন,—'আপাততঃ চৌধুরী সাহেবের চক্ষে ধূলি দিয়া চলিতে হইবে।'

সকিনা বিবির বাড়ীর পার্শ্বে জনৈক খ্যাতনামা ডাক্তার বাস করেন। ডাক্তার, সকিনা বিবিকে মাতৃবৎ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সকিনা, হায়দার আলীকে ডাক্তারী শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার সকিনার অনুরোধে হায়দার আলীকে আপন গৃহে রাখিয়া যত্নসহকারে ডাক্তারী শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ক্রমে এক দুই করিয়া ছয় মাস অতীত হইল। মতিয়ার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাতে অণুমাত্র ত্রুটি হইল না। মতিয়া সর্ব্বদা হায়দারের সংবাদ লইয়া থাকে। সময় সময় সকিনার মারফৎ অর্থ-সাহায্যও করে।

ডাক্তার দেখিলেন,—হায়দার ছয় মাসে যাহা শিক্ষা করিয়াছে, অপরের পক্ষে দুই বৎসরে তাহা শিক্ষা করা অসম্ভব। ইহার উপর তাহার বিনয়-নম্র স্বভাবে ও সরলতায় ডাক্তার একান্ত মুগ্ধ হইলেন। হায়দার আলীর প্রতি উত্তরোত্তর ডাক্তারের স্নেহ-প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

আরও ছয় মাস কাটিয়া গেল। বৎসরান্তে একদা ডাক্তার সাহেব, সকিনা বিবিকে কহিলেন,—"এই এক বৎসরে হায়দার নিজে ব্যবসা চালাইবার মত শিক্ষা লাভ করিয়াছে। এ সহরে ঔষধালয়ের বড় অভাব। হায়দার যদি পুঁজি সংগ্রহ করিয়া ঔষধের দোকান খুলিতে পারে, তাহা হইলে অচিরেই লাভবান হইতে পারিবে।"

ডাক্তার সাহেবের মুখে হায়দার আলীর প্রশংসা-বাদ-শ্রবণে সকিনা বিবির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এ সংবাদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকধারা বহিতে লাগিল।

সকিনা বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত টাকা হইলে ঔষধালয় খোলা যাইতে পারে?"

ডাক্তার কহিলেন,—"সম্প্রতি হাজার টাকা হইলেই দোকান খোলা যাইতে পারে।"

"আচ্ছা দেখিব!"—এই বলিয়া সকিনা, মতিয়ার সদনে উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মতিয়ার অর্থ-সাহায্যে হায়দার দোকান খুলিয়াছে। ঔষধের বিক্রয়-বাহুল্য দেখিয়া হায়দার দুই জন কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিল। ছয় মাসের হিসাব নিকাশ আমলে দেখা গেল, সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদ গড়পরতা প্রতি মাসে দেড় শত টাকা আয় হইয়াছে। হায়দার এখন হইতে মতিয়ার নিকট অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করে না। দোকানের উন্নতির সংবাদে সকিনা অতীব সুখী হইলেন। অভিনব কার্য্য মাত্রেই হায়দার সকিনার অনুমোদন গ্রহণ করিয়া থাকে। সকিনার প্রতি হায়দার পুত্রোচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতে লাগিল।

ঘটনার সজ্ঘাতে হায়দারের কথা তুলিতে গেলেই মতিয়ার কথা বলিতে হয়। এই এক বৎসরের মধ্যে দুই স্থানে মতিয়ার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহে মতিয়ার অমত জানিয়া চৌধুরী সাহেব সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য হন। মতিয়া, জুলেখা দ্বারা পিতাকে দৃঢ়তা-সহকারে জানাইল,—সে বিবাহ করিবে না; পিতা যদি পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে সে বিষপানে আত্মহত্যা করিবে। কাজেই চৌধুরী সাহেব পীড়াপীড়ি করিতে সাহসী হইলেন না। মতিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছে—যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে হায়দার আলীকেই বিবাহ করিবে।

অল্পকাল মধ্যেই হায়দার আলী সহরের গণ্যমান্য লোক মধ্যে পরিগণিত হইল। দিন দিন তাহার অমায়িকতার ও সততার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

চৌধুরী সাহেবের কর্ণে এ সংবাদ পৌছিতে বাকি রহিল না। একদিকে বিবাহে মতিয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ, অপর দিকে হায়দার আলীর সমৃদ্ধির খ্যাতি,—ক্রূর-হৃদয় চৌধুরী সাহেবকে পীড়া দিতে লাগিল। তিনি যাহাকে ঘৃণাভরে দূর করিয়া দিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি অল্পকাল পূর্ব্বে কপর্দ্দকশূন্য পথের ভিখারী ছিল, আজ হঠাৎ কি সূত্রে তাহার এইরূপ সমৃদ্ধিলাভ হইল,—চৌধুরী সাহেবের নিকট ইহা এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। তিনি স্থির করিলেন,—'এই সমস্যা অচিরেই সমাধান করিতে হইবে।'

ঘটনা-সংগুপ্তি বিষয়ে মানুষ যতই সতর্ক হউক না কেন, সত্য কখনই অপ্রকাশিত থাকে না; সত্য কোন-না-কোনও সূত্রে প্রকাশ হইয়া পড়ে। মতিয়া হায়দার আলীর প্রতি অনুরক্ত, তাহারই অর্থ-সাহায্যে হায়দার আলীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি,—চৌধুরী সাহেব অচিরে এ রহস্য-ভেদে সমর্থ হইলেন। যে মুহূর্ত্তে এই ঘটনা জানিতে পারিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে চৌধুরী সাহেবের চিত্তে আর অণুমাত্র শান্তি রহিল না। প্রথমে ক্রোধ, তৎপরে হিংসার তীব্রানলে তাঁহার চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রজনী দ্বিপ্রহর। রজনী ঘনান্ধকারময়। জীব-জগৎ সুপ্ত। নৈশ-প্রকৃতি নীরব-নিস্তব্ধ! ক্বচিৎ বৃক্ষশিরে কালপেঁচার বিকট ধ্বনি, ক্বচিৎ গৃহস্থ-অলিন্দে স্বল্পনিদ্র কুকুরের ঘেউ ঘেউ রব,—নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে।

এই গভীর নিশীথে, প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, দুইটী মনুষ্য-মূর্ত্তি নিঃশব্দে পথ চলিতেছে। চলিতে চলিতে মনুষ্যমূর্ত্তিদ্বয় সকিনা বিবির শয়ন-কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া কপাট-গাত্রে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল। সকিনা বিবি নিদ্রাভঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ও?"

সঙ্গে সঙ্গে অনুচ্চ-কণ্ঠে উত্তর হইল,—'দ্বার খোল, বড় বিপদ!"

কণ্ঠস্বর সকিনা বিবির অপরিচিত নহে। দীপ জ্বালিয়া ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার খুলিয়া সকিনা বিবি কহিল,—"ঘরে এস।"

প্রবেশ করিয়া আগন্তুক অনুচ্চকণ্ঠে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সাকিনা বিবির সহিত কি পরামর্শ করিল। সকিনা বিবির প্রশান্ত বদন-মণ্ডলে চিন্তার কালরেখা পাত হইল। কিয়ৎক্ষণ আপন মনে চিন্তা করিয়া সকিনা কহিলেন,—"চল, অদৃষ্টে যা থাকে ঘটিবে।"

এই বলিয়া সকিনা বিবি আগন্তুকদ্বয়কে লইয়া গৃহের বাহিরে

আসিয়া কপাটের শিকল টানিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে তাঁহারা উত্তরাভিমুখে চলিলেন।

ক্রমে তাঁহারা হায়দার আলীর ঔষধালয়ে উপস্থিত হইলেন! কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ঔষধালয়ের দ্বার জানালা ভগ্ন, জিনিসপত্র ও ঔষধের শিশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সকিনা বিবি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয় ততোধিক বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত। সঙ্গিনীদ্বয় মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠা কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"মা সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! যা আশঙ্কা করেছিলেম, তাই ঘটেছে!"

সকিনা বিবি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার প্রশান্ত নয়নযুগলে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

সকিনা বিবি কহিলেন,—"চল, আর এখানে কেন? আমি বিশ্বজগৎ খুঁজে দেখ্‌ব, তবে ছাড়্‌ব।"

এই বলিয়া সকিনা বিবি সঙ্গিনীদ্বয় সমভিব্যাহারে পূর্ব্বদিকে যাইতে লাগিলেন। তখন আকাশে কৃষ্ণপক্ষীয় দশমীর চাঁদ উদিত হইয়াছে। চলিতে চলিতে তাঁহারা সহরের বাহিরে প্রান্তর মধ্যে উপনীত হইলেন। সকিনা বিবি চকিতে দেখিলেন,—সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে একটা শিবা, কি একটা শ্বেত পদার্থ সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে। সকিনা বিবি তদ্দর্শনে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। মনুষ্য-সমাগমে শিবা দূরে সরিয়া গেল।

সকিনা বিবি আকুল-প্রাণে অদূরস্থিত পদার্থপানে ছুটিয়া চলিলেন। শ্বেত পদার্থ অপর কিছু নহে; প্রহৃত হায়দার আলী মৃতকল্পাবস্থায় বৃক্ষতলে শায়িত।

পুত্রস্থানীয় হায়দার আলীকে তদবস্থায় দেখিয়া সকিনা বিবির বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। নয়ন-কোণে যেন শোণিত-ধারা বহিতে লাগিল।

হায়দার আলীর মুখের উপর জ্যোৎস্নালোক খেলিতেছিল। মতিয়ার আকুল নেত্র-পলক তাহার সে মুখপানে ন্যস্ত হইল। মতিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। কাঁপিতে কাঁপিতে বৃক্ষতলে হেলিয়া পড়িল। বহু কষ্টে চিত্তাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া মতিয়া উঠিয়া বসিল। আঘাতজনিত ক্ষতমুখে তখন শোণিত-ধারা বহিতেছিল। মতিয়া অঞ্চল-কোণে শোণিত-স্রোত রোধ করিতে নিষ্ফল চেষ্টা করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনেকক্ষণ পর "মাগো প্রাণ যায়" এই যাতনা-সূচক বাক্য হায়দার আলীর কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইল।

সকিনা বিবি অশ্রুধারা মার্জ্জনা করিতে করিতে কহিলেন,— "নিকটে আমার ভগ্নীর বাড়ী। চল,—হায়দারকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে চল।"

এই বলিয়া সাকিনা ও জুলেখা ধরাধরি করিয়া মৃতকল্প হায়দারকে লইয়া চলিল।

সকিনার ভগ্নীর দুই পুত্র—বলিষ্ঠ যুবক। সকিনা ভগ্নী-পুত্র-দ্বয়কে কহিলেন,—"এখনি আমার নাম করিয়া ডাক্তার এলাহি-বক্সকে ডাকিয়া আন।"

মাসীমার আদেশক্রমে দুই ভ্রাতা ডাক্তার ডাকিতে ছুটিয়া চলিল।

হায়দার শয্যায় শায়িত, পার্শ্বে সকিনা ও মতিয়া উপবিষ্টা। সকিনার ভগ্নী সকিনার ন্যায়ই দয়াবতী। হায়দারের শুশ্রূষার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, সকিনার দয়াবতী ভগ্নী ক্ষিপ্রতার সহিত যোগাইতে লাগিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ডাক্তার এলাহিবক্স আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হায়দারকে পুত্রবৎ ভালবাসেন—স্নেহ করেন। তাহার অবস্থাবলোকনে ডাক্তারের প্রাণ ব্যথিত হইল। সকিনার ভগ্নী-পুত্রদ্বয়ের প্রমুখাৎ হায়দারের তাৎকালীন অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া ডাক্তার প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়া-ছিলেন। তিনি প্রথমেই বলকারক ঔষধ সেবন করাইলেন। তৎপরে ক্ষতমুখে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। ডাক্তারের সমক্ষে একমাত্র সকিনা বিবি উপস্থিত; মতিয়া ও জুলেখা কক্ষান্তরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সকল কথা শুনিতে লাগিল।

সকিনা ব্যাকুলভাবে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই, আমায় নিশ্চয় করে বল, আমার হায়দার সেরে উঠ্‌বে তো! আবার হায়দারের মুখে মা ডাক শুন্‌তে পাবো তো!"

এই বলিয়া ব্যগ্রতাপূর্ণ নয়নে উত্তরের প্রতীক্ষায় সকিনা ডাক্তারের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন,—"আঘাত তত সাঙ্ঘাতিক নহে। দিদি! তুমি ভাবিও না, হায়দার শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বে।"

সকিনা বিবি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পার্শ্বের কক্ষাভ্যন্তরেও ক্ষীণ নিশ্বাস-শব্দ শ্রুত হইল। ডাক্তার সেদিকে লক্ষ্য করেন নাই।

ক্রমে রজনী অবসান হইল। পূর্ব্ব গগনভালে উষার রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল। গাছের ডালে লতা-বিতানে বিহঙ্গকুল ঝঙ্কার দিতে লাগিল।

এই সময় হায়দার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। সকিনাকে দেখিয়া কহিল,—"মা, আমি কোথায়?"

সকিনার প্রাণ আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। তিনি স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে কহিলেন,—"বাবা, নিশ্চিন্ত হও, তুমি নিরাপদ-স্থানেই আছ।"

হায়দার ক্ষীণ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাতনা-সূচক অব্যক্ত

শব্দ করিতে করিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। পর মুহূর্ত্তে কহিল,—"মা, সর্ব্বাঙ্গে বড় বেদনা—ডাক্তার কোথায়, তাঁকে সংবাদ দাও না মা!"

সকিনা।—"হাঁ বাপ! ডাক্তার এখানে আছে। ভাই এলাহিবক্স এতক্ষণ তোমায় ঔষধ-পত্র দিতেছে।"

হায়দার ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল,—"মা, আমি বাঁচ্‌ব ত? মা, তোমার মত আর এক মা আমার দেশে আছেন। আমি ম'লে তাঁর দশা আর আমার ভাইটার দশা কি হবে? যদি মরি, তবে তুমি মা আমার দেশের মাকে ও আমার প্রাণের ভাইটীকে দেখো।"

সকিনার চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে সকিনা কহিলেন,—"ভয় কি বাপ! তুমি হতাশ হইও না; দুই এক দিন মধ্যেই সেরে উঠ্‌বে। লক্ষ্মী বাপ আমার! বেশী কথা বলো না; খানিক চুপ করে থাক।"

ডাক্তার অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। ঘরে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পদশব্দ-শ্রবণে হায়দার ফিরিয়া চাহিল; ডাক্তারকে কহিল,—"আমি সেরে উঠ্‌ব তো?"

ডাক্তার।—"হাঁ বাপ, সেরে উঠ্‌বে বই কি? দুই একদিন মধ্যে হেঁটে বেড়াতে পার্‌বে। তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকা। ডাক্তার সকিনা বিবিকে কহিলেন,—

"দিদি, হায়দারের জীবন সম্বন্ধে কোনও আশঙ্কা নাই। তুমি যদি অনুমতি কর, তবে একবার বাড়ী যাই। অনেক রোগী আমার প্রতীক্ষায় ব'সে থাকবে। বিকালে আর একবার এসে দেখে যাব।"

সকিনা :—"তবে একবার এস। ও বেলায় আসতে যেন ভুল না।"

"বল কি দিদি! হায়দার আমার পুত্রবৎ স্নেহ-ভাজন।" এই বলিয়া ঔষধ-সেবন ও পথ্যাদি সম্বন্ধে যথারীতি উপদেশ দিয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সকিনা বিবি, মতিয়াকে রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে বলিয়া হাত মুখ ধুইবার জন্ম বাহিরে গেলেন। মতিয়া একাগ্রচিত্তে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ক্ষতমুখে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দিল। জুলেখা, দুগ্ধ গরম করিতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

এই সময় একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই মতিয়ার মুখপানে হায়দারের দৃষ্টি পতিত হইল। হায়দার দেখিল,—বালিকার অপূর্ব্ব রূপচ্ছটায় কক্ষদেশ আলোকিত। বদনকমলে, সুনীল চক্ষুর্দ্বয়ে বিপুল দয়া—বিপুল স্নেহ প্রতিফলিত।

হায়দার বিস্মিত স্তম্ভিত। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা

করিল,—"আপনি কে? আপনি বুঝি স্বর্গের দেবী? নতুবা—এত দয়া, এত করুণা কি মানুষে সম্ভবে?—না, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি! বলুন—বলুন, আমায় আর সংশয়-দোলায় রাখিবেন না!"

এই বলিয়া হায়দার সতৃষ্ণ নয়নে বালিকার মুখপানে দৃষ্টি ন্যস্ত করিল।

মতিয়া ব্রীড়াভরে মস্তক অবনত করিল। তাহার গণ্ডস্থলে লজ্জার রক্তিমরাগ ফুটিয়া উঠিল। সে মৃদু-কণ্ঠে কহিল,—"আমি আপনার দাসী।"

"ছিঃ! ও কথা বল্‌বেন না! আমি হতভাগা, পথের ভিখারী। আপনি স্বর্গের দেবী। এ দুঃসময়ে আপনি করুণা-ধারায় হতভাগ্যকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। না—না, আমার সহিত উপহাস কর্‌বেন না! সত্য বলুন—আপনি কে?"

"বলেছি তো—আপনার দাসী বই অপর কেউ নই।"

জুলেখা গরম দুগ্ধ লইয়া আসিল। মতিয়া চামচে করিয়া হায়দারকে দুগ্ধপান করাইল। দুগ্ধপানান্তে হায়দার একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

মতিয়া বাধা দিয়া কহিল,—"না—না;—এখন উঠিবার দরকার নেই। খানিক ঘুমুতে পারেন কিনা দেখুন। খানিক ঘুমুতে পার্‌লে, শরীর অনেকটা সুস্থ হবে।"

জুলেখাকে দেখিয়া হায়দার ততোধিক বিস্মিত। মতিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"ইনি বুঝি আপনার ভগ্নী!"

জুলেখা কহিল,—"হাঁ, আমি ওর ভগ্নীই বটে।"

হায়দার।—"হাঁ, তাই হবে ; নতুবা এমন অপরূপ রূপ অপরে সম্ভবে না। আপনাদের করুণায় বুঝি এ যাত্রা মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা পেলাম। এ হতভাগ্যের প্রতি আপনাদের অযাচিত দয়া কেন, বলিবেন কি ?"

জুলেখা।—"সে কথা পরে হবে। এক্ষণে আপনি খানিক ঘুমুন দেখি!"

হায়দার চক্ষু মুদিত করিয়া নীরবে রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষা গুণে, বিশেষতঃ জগদীশ্বরের কৃপায়, হায়দার আলী দিবসত্রয় অন্তর অনেকটা সুস্থ হইল। প্রহারের চোটে তাহার অঙ্গে সামান্য ক্ষত হইয়াছিল। ক্ষতগুলি শুকাইয়া আসিল। হায়দার এক্ষণে আপন বলে উঠিয়া বসিল। বলাধান পথ্য গুণে দেহে ক্রমে বলোপচারিত হইতে লাগিল। মতিয়ার ও সকিনার আনন্দের সীমা রহিল না।

সকিনা বিবি, নিভৃত কক্ষে মতিয়াকে কহিলেন,—"এক্ষণে বাছা, হায়দার এক প্রকার সেরে উঠেছে। তুমি ঘরে ফিরে যাও।"

মতিয়া বিস্মিত চমকিত ভাবে কহিল,—"বল কি মা! আমার কি ঘরে ফির্বার যো আছে! এক্ষণে পিতার সমস্ত ক্রোধ আমার উপর পতিত। যদি ঘরে ফিরে যাই, তা হলে সকল দোষ আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া, আমার প্রতি তিনি দারুণ অত্যাচার করিবেন। আর এক কথা মা! একবার তাঁহার জালে পড়িলে, তুমি যাঁহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, এ জীবনে তাঁহার সহিত সম্মিলনের আশা একবারে নির্ম্মূল হইবে।"

সকিনা নীরবে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"তবে কি করিতে চাও?"

মতিয়া।—"মা! এ সঙ্কটে তুমি যেরূপ পরামর্শ দাও, তদনুরূপ কার্য্যই করিব। আমি বালিকা মাত্র, আমি আর কি বলিব?"

সকিনা বিবি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। সহসা কোনও কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া কহিলেন,—"মতিয়া, এ সঙ্কটে কোন্ পথ অবলম্বনীয়, কিছুই যে স্থির করিতে পারিতেছি না।"

মতিয়া কহিল,—"আমি তো মা, সঙ্কল্প স্থির করিয়াই গৃহ-ত্যাগ করিয়াছি। যখন শুনিলাম, এ মন্দভাগিনীর সাহায্য-সহানুভূতি লাভে হায়দার আলীর অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে জানিয়া, তাহাকে খুন করিবার জন্য, পিতা কতকগুলি গুণ্ডা নিয়োগ করিয়াছেন, তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া

গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছি যে, আমার জীবন সত্ত্বে তাঁহাকে খুন করিতে দিব না; আমায় হত্যা না করিয়া, কেহ তাঁহার অঙ্গে একটী অঙ্গুলি উত্তোলন করিতে পারিবে না। পিতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যখন বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখনই স্থির করিয়াছি, পিতার গৃহে আমার আর স্থান হইবে না। মা! শিশুকালে আপন গর্ভধারিণীকে হারাইয়াছি। একমাত্র তোমার স্নেহের শীতল ছায়াতলে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি। তুমি আমার প্রতি স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিতে পারিবে না; আমিও তোমায় ত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি মা! সন্তানের পক্ষে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, একমাত্র মা-ই তাহা ভাল বুঝেন।"

সকিনা বিবি চিন্তা-ভারাক্রান্ত চিত্তে কহিলেন,—"যদি ঘরেই না ফির্‌বে, তবে কোথায় থাক্‌বে বাছা! তোমার পিতার অত্যাচার ভয়ে কেহ তোমায় স্থান দিতে সাহসী হবে না।"

মতিয়া।—"তাহা তো মা, ধরা কথা। চল-না, মা, তোমার পালিত পুত্র সহ আমরা বিদেশে চলে যাই। এ হৃদয়হীন দেশে থেকে আর কাজ নেই।"

সকিনা।—"বিদেশে বন্ধুহীন স্থানে কি করে আমাদের ভরণ-পোষণ চল্‌বে।"

"সে উপায় করেই গৃহ ছেড়ে এসেছি!"—এই বলিয়া মতিয়া

জুলেখাকে ইঙ্গিত করিলে, জুলেখা কক্ষাভ্যন্তর হইতে একটি পুঁটুলি আনিয়া সকিনা বিবির সমক্ষে উপস্থিত করিল।

সকিনা বিবি দেখিলেন,—নোটে মোহরে প্রায় দশ হাজার টাকা মতিয়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। তার উপর অলঙ্কার-পত্রেও পাঁচ সাত হাজার টাকা হইবে!

সকিনা বিবির চিন্তাভারগ্রস্ত বদনমণ্ডল সহসা ঈষৎ প্রফুল্ল-ভাব ধারণ করিল। সকিনা বিবি অপেক্ষাকৃত হৃষ্টচিত্তে কহিলেন,—"তবে কি মা, তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ?"

মতিয়া।—"হাঁ, মা! এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করা বাহুল্য মাত্র।"

সকিনা।—"বুঝ্‌লেম, বাছা, তুমি স্থিরসঙ্কল্প হয়েই গৃহ ছেড়েছ। কিন্তু বাছা দু'চার দিন মধ্যে তো এ স্থান ত্যাগ করে যাওয়া ঘট্‌ছে না।"

মতিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন মা? এখানে বিলম্ব করা আমার বিবেচনায় নিরাপদ নহে। পিতার প্রকৃতি না জান, এমন নহে। আমার যে এখানে থাক্‌তে বড়ই ভয় কর্‌ছে।"

জুলেখা কহিল,—"যদি কর্ত্তা সাহেব ঘুণাক্ষরে আমাদের সন্ধান পান, তা হ'লে তাঁর ক্রোধ হ'তে কেউ রক্ষা পাবে না। হায়দার আলী সাহেব সম্বন্ধে তো কথাই নেই!"

সকিনা বিবি কহিলেন,—"তোমরা খানিক ব'স। আমি আস্‌ছি।"

এই বলিয়া সকিনা বিবি গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। তথায় আপন ভগ্নীপুত্রদ্বয়কে ও তাহাদের কতিপয় প্রতিবেশীকে ডাকিয়া আনিয়া কিয়ৎক্ষণ পরামর্শ করিলেন। ভগ্নীপুত্রদ্বয়ের আগমনে মতিয়া ও জুলেখা কপাটের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল।

তাহারা মতিয়ার উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—"আপনারা এ গৃহে থাকিতে অণুমাত্র ভীত বা শঙ্কিত হইবেন না। আমাদের জীবন সত্ত্বে চৌধুরী সাহেব এ গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ, আমাদের এখানে অবস্থান অন্যত্র প্রকাশ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।"

জুলেখার মধ্যবর্ত্তিতায় মতিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিল।

সকিনা কহিল,—"মতিয়া এখন বুঝিলে তো এখানে কোনও প্রকার বিপদের সম্ভাবনা নাই! এ পল্লীবাসী মাত্রেই আমার ভগ্নীপুত্রদ্বয়ের বাধ্য ও অনুগত। ইহাদের কথায় পল্লীবাসি-গণ প্রাণ-দানে প্রস্তুত। বিশেষতঃ, এ গৃহ চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা। সহসা বিপদ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা দেখি না। আরও কিছুকাল এখানে থাকা আবশ্যক। সময় মত যাত্রার দিন স্থির করিব। তোমরা উতলা হইও না।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

হায়দার আলী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। তাহার মুখে চোখে লাবণ্য-প্রভা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে। মতিয়ার ও জুলেখার ঐকান্তিক যত্ন ও শুশ্রূষায় হায়দার আলীর কোনও প্রকার কষ্ট অসুবিধা রহিল না।

সপ্তাহ পর সকিনার ভগ্নীর গৃহে ডাক্তার এলাহিবক্স, নছির-উল্লা মোল্লা এবং পল্লীবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বিবাহ-রেজিষ্টার উপস্থিত। তাঁহাদের সমক্ষে মতিয়ার ও হায়দার আলীর বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহ স্বীকার-পত্র লিখিত ও রেজেষ্টারী হইয়া গেল। নবদম্পতির মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সকিনার মন আজ নিশ্চিন্ত। পরদিন সকিনা বিবি মতিয়া প্রভৃতিকে লইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সকিনার একটী ভগ্নীপুত্রও তাঁহাদের সাহায্যার্থ সঙ্গে চলিল।

কলিকাতায় পৌছিয়া হায়দার-আলী সারকুলার রোডের উপর এক দ্বিতল ঘর ভাড়া করিল। নিম্নতলায় ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হইল। মাসত্রয় পর হায়দার-আলী হিসাব করিয়া দেখিল, সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদ মাসিক দুই শত টাকা আয় হইয়াছে।

একদা মতিয়া কহিল,—“আমার শাশুড়ীকে ও দেবরকে আর দেশে রেখে কাজ নেই। এখানে আনাইয়া লও।”

সকিনাবিবিও এ কথায় যোগদান করিলেন। হায়দার আর এ সম্বন্ধে অন্যমত করিতে পারিলেন না।

বাড়ীর পার্শ্বে আর একখানি বাড়ী ভাড়া করা হইল। প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র খাট-বিছানা প্রভৃতিতে কক্ষ সকল সজ্জিত হইল। হিন্দু চাকর-চাকরাণী নিযুক্ত হইল।

এদিককার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া হায়দার মাতা-ভ্রাতাকে পত্র লিখিল,—

"তোমরা পত্র প্রাপ্তির পর কালবিলম্ব না করিয়া, রামনিধি দাদাকে সঙ্গে লইয়া, কলিকাতায় চলিয়া আসিও। এখানে আমি বাড়ী ভাড়া লইয়াছি। খরচ বাবত ১০০৲ এক শত টাকা মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলাম। যদি কাহারও পাওনা থাকে, তাহা পরিশোধ করিয়া আসিও। জমী-বাড়ী সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত করিতে হয়, রামনিধি দাদা এখানে আসিলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া করিব।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোপাল মায়ের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছে। প্রকাণ্ড বাসগৃহ দেখিয়া গোপাল অবাক বিস্মিত। হায়দার ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও আচার-ব্যবহারের ও পরিচ্ছদাদির কোনও পরিবর্ত্তন করে নাই।

হায়দার জননীর পায়ের কাছে প্রণত হইল। মাকে স্পর্শ করিতে হইবে বলিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে পারিল না।

বহুকাল পরে পুত্রকে দেখিয়া, জননীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। আশীর্ব্বাদ করিতে যাইয়া পুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলে, হায়দার সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"মা, আমায় ছুঁইও না; আমি জাতি-ধর্ম্ম হারিয়েছি; আমি মুসলমান হয়েছি!"

শ্রবণমাত্র, "এঁ্যা এঁ্যা, কি বল্‌ছিস্ রে!" বলিতে বলিতে জননী মূর্চ্ছিতা হইয়া কক্ষতলে হেলিয়া পড়িলেন।

হায়দার ব্যস্তভাবে গোপালকে কহিল,—"ভাই, মাকে শীঘ্র বাতাস কর, মস্তকে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দাও।"

গোপাল তাহাই করিল। অনেকক্ষণ পর জননীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

হায়দার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। তার পর কহিল,—"মা, তোমার হরিলাল চিরকাল তোমার নিকট হরিলালই থাকিবে। যে দিন ইহার ব্যতিক্রম দেখিবে, সেদিন যেন বিধাতার শত অভিসম্পাত এ হতভাগ্যের মস্তকে বর্ষিত হয়।"

জননী চক্ষু মুছিতে মুছিতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতরে একটা অনুতাপের অনল যেন ধু ধু জ্বলিতে লাগিল।

এমন সময় মতিয়াকে লইয়া সকিনা বিবি তথায় উপস্থিত হইলেন। মতিয়া কক্ষতলে মস্তক নোয়াইয়া প্রণাম করিল।

গোপালের জননী মতিয়ার অপূর্ব্ব রূপরাশি-সন্দর্শনে বিস্ময়-প্রাবল্যে কিয়ৎক্ষণ তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"এ আবার কে?"

সকিনা বিবি কহিলেন,—"এ যে তোমার বেটার বউ!"

জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। পুত্রের ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ সংবাদে হৃদয়টা যতদূর না জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সম্মুখে মতিয়াকে দেখিয়া সে জ্বালা যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি অট্টহাস্যে উচ্চ চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"হা! হা! হা! আমার বেটার বউ! ডাইনী মাগী আমায় ভুলাতে এসেছিস্! আমি কি ভুল্‌বার মেয়ে! হা—হা—হা!"

মতিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল,—"মা, তোমার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ কর; চিরকাল যেন অটল ভক্তির সহিত তোমার সেবা কর্‌তে পারে।"

জননী বক্ষে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"বাপ্‌রে! হরিলাল আমার! কোথা গেলি রে তুই! তোর চিতানলে শেষে আমায় পুড়ে মর্‌তে হলো!"

হরিলাল উদ্বিগ্ন অন্তরে কহিলেন,—"মা! মা! তুমি অমন

করছ কেন? এই যে তোমার হরিলাল তোমার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে!"

জননী বিকট স্বরে কহিলেন,—"আমায় প্রবোধ দিচ্ছিস্! ভুলাবার চেষ্টা করছিস্!"

বলিতে বলিতে তিনি আবার কাঁদিতে লাগিলেন,—"বাপ্‌রে! আমার পেটের জ্বালাই কি এত বেশী হলো যে, তোরে খেয়ে ফেল্‌তে হলো! কেন তোরে চাকরীর সন্ধানে বিদেশে পাঠালাম! শেয়াল-কুকুরেও আপনার সন্তান পালন করে; আর আমি কিনা, আমার দুধের শিশুকে, আমার পোড়া পেট ভরাবার জন্যে উৎসর্গ করলাম! হায়—হায়! আমার কি হলো!—কি হলো!"

বলিতে বলিতে শিরে করাঘাত করিয়া, জননী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

অনেক শুশ্রূষার পর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল বটে; কিন্তু দেহ আর প্রকৃতিস্থ হইল না। তিনি সেই যে শয্যা লইলেন, সেই শয্যাই তাঁহার কালশয্যা হইল।

গোপাল সর্ব্বদাই জননীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করে। প্রথমে দাদার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহার যে আনন্দ হইয়াছিল, এখন ক্রমেই তাহা নিরানন্দের উৎস হইয়া দাঁড়াইল।

অন্তিম-শয্যায় শুইয়া, জননী সর্ব্বদাই হা-হুতাশ করেন। যদি হরিলাল কখনও সম্মুখে আসে, যন্ত্রণা যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার

জননীর অন্তিম আক্ষেপ, গোপালের বিষণ্ণ-বদন—হরিলালের হৃদয়ে এককালে শত বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। তখন তাহার অনুশোচনা হইল,—"হায়! আমি কি করিতে গিয়া কি করিলাম! মাতা ভ্রাতার দুঃখ দূর করিতে গিয়া, আপনার কর্ম্মফলে শেষে তাঁহাদিগকে অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করিলাম! আমার কি মোহ জন্মিল! আমি কেন জাতি-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে গেলাম! আমার শরীরে যে সামর্থ্য ছিল, আমি মোট বহন করেও মা-ভাইকে প্রতিপালন করতে পারতাম। তাঁ'দের প্রতিপালনরূপ সৎসঙ্কল্পের সিদ্ধি-কামনায় আমি কেন অসৎ কর্ম্মে—জুয়াখেলায় রাতারাতি বড়মানুষ হইবার প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ হইলাম? সে এক রকম জুয়াখেলা নয় তো আর কি? জাতি-ধর্ম্ম খুইয়ে, নবাব-পুত্রীকে বিয়ে করে, বড় মানুষ হ'বার কল্পনা—জুয়াখেলা নয় তো আর কি? সৎপথে সরল পরিশ্রমে যে উপার্জ্জন, সে যে শান্তির নিলয়; তাহা আমি কেন বুঝিলাম না? সুখ অর্থে নয়—সুখ মনে। দিনান্তে অন্নমুষ্টি সংগ্রহ করেও মানুষ সুখী হ'তে পারে; আবার অর্থের স্তূপে পদচারণা করেও মানুষ অসুখী থাকে। হায়! জীবনে একটী ভুল ক'রে আমি কত জনকে অসুখী করলাম! স্বধর্ম্মে নিধন হওয়াও ভাল; পরধর্ম্ম

উৎকৃষ্ট হ'লেও শ্রেয়ঃ-সাধক নহে,—এই যে শাস্ত্রোপদেশ আছে, আমার জীবনে আমি তা প্রত্যক্ষ কর্‌লাম!"

হরিলালের চিত্ত চির-অশান্তিময় হইয়া রহিল। সুতরাং কি মতিয়া, কি সকিনা, কি গোপাল, কেহই আর সুখী হইতে পারিল না।

দুর্দ্ধর্ষ আবদুসোভান চৌধুরী হঠাৎ একদিন ঘোড়া হইতে পড়িয়া আপনার কর্ম্মের ফল ভোগ করিলেন। কন্যার পলায়ন-জনিত অপমানে, আর ব্রাহ্মণ-সন্তানের ধর্ম্মনাশরূপ পাপাচরণে, তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে অহর্নিশ দগ্ধীভূত হইতেছিল। এখন অপঘাতের যন্ত্রণাময় জীবন বহন করিয়া, তাঁহাকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে হইল। সংসার দেখিল—সৎসঙ্কল্প-সাধনেও অসদনুষ্ঠান কখনও শুভফল প্রদান করিতে পারে না।

শেষ জিৎ।

(১)

সেদিন অতুল গভীর একাগ্রতার সহিত স্বহস্ত-নির্ম্মিত সরস্বতীর মূর্ত্তি চিত্রিত করিতেছে, আর পাড়ার ছেলেরা নীরবে কৌতূহলের সঙ্গে তুলিটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে; এমন সময়ে অতুলের জননী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্র তুলিতে রং মাথাইতে মাথাইতে মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মা ?"

"কৈ বাবা, লাট সাহেবের চিঠি তো এতদিনও আসিল না ?" মাতার স্বর বিষাদমাথা।

"সেজন্য তাহার বা আমার ঘুমের তো বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না মা" বলিয়া অতুল জননীর মুখের দিকে চাহিল।

তাহার কথায় জননী একটু ব্যথিতা হইলেন, একটু অনুযোগের স্বরে কহিলেন,—"তবে কি লেখাপড়া শিখে শুধুশুধু বসে থাক্‌বে ?"

"না মা, একটা কাজের যোগাড় কাল থেকেই হবে।" বলিয়া অতুল মৃদু হাসিতে লাগিল।

পুত্রের একগুঁয়েমির বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিতর্ক খাটিবে না—মাতা তাহা জানিতেন। তবে বুঝিলেন, অতুল একটা কিছু করিবেই করিবে। তাঁহার বরাবর বিশ্বাস ছিল, অতুল বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সরকার বাহাদুর সসম্মানে তাহাকে এক মহকুমার তক্তে বসাইয়া দিবেন। কিন্তু ফল বাহির হইবার পর কয়েক মাস অতীত হইলেও সে বিষয়ের কোনও সম্ভাবনার অভাব তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। আজ অতুলের কথায় তাঁহার 'হাকিমের মা' হইবার আশা অন্তর্হিত হইল।

পরদিন শ্রীপঞ্চমী। ভোর হইতেই অতুলের বাড়ীতে দলে দলে ছেলেরা জুটিতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে ফুলের ডালি, কাহারও কাঁধে কলাগাছ—এই রকম। সেই দিনই মা সরস্বতীর সম্মুখে তাহাদের হাতে খড়ি হইল।

অতুল পূর্ব্ব হইতেই একরাশি প্রথম ভাগ আনাইয়া রাখিয়াছিল; ছেলেরা প্রত্যেকে এক এক খানি বই পুরস্কার লইয়া বাড়ী ফিরিল। চারিদিকে প্রচার হইল যে, অতুলচন্দ্র এক পাঠশালা খুলিয়া বসিয়াছে। দিনের বেলায় চাষাদের ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিত; আর যতটা পড়িত, তার চেয়ে দ্বিগুণ কোলাহল করিয়া বাড়ী ফিরিত। সন্ধ্যার সময় কৃষকেরা হুঁকা হাতে পাঠশালায় সমবেত হইত। অতুল মুখে মুখে তাহাদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিত।

চাষাদের চক্ষে অতুলের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও একদল ভদ্রলোকের

তাহার প্রতি বিদ্বেষ সমানভাবেই বাড়িতে লাগিল। সে যে দেশে চাকর-মজুর দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিতেছিল ও চাষার ছেলেদের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া ভদ্রলোকের মানের দর কমাইতেছিল, এ অপরাধ ক্ষমা করিতে একদল লোক একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

কিন্তু অতুলের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন—গ্রামের জমিদার—রামরতন বাবু। তাঁহার প্রজারা যে হিসাবপত্র বুঝিতে শিখিয়া জমিদারের কোনও দাবীর প্রতিবাদ করিবে,—এ অপমানের আশঙ্কা তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। অতুলকে জব্দ করিবার প্রতিজ্ঞা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগের মধ্যে সময়ের বেশী ব্যবধান ঘটিল না।

(২)

জমীদার বাবুর মৃদু তিরস্কারেও অতুলের কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল না। সেরেস্তায় উচ্চ কর্ম্ম প্রদানের প্রলোভনও বৃথা হইল। রামরতন বাবুর বিরাগকে উপেক্ষা করিবার ফলও অতুলকে শীঘ্রই ভোগ করিতে হইল।

একদিন সন্ধ্যার পর পথে গুপ্ত লাঠির আঘাতে তাহাকে এক মাস শয্যাগত থাকিতে হইল। কিন্তু তাহাতেও সে পাঠশালা বন্ধ করিল না। তাহার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। জলে থাকিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ করিতে অনেকেই নিষেধ করিলেন। কিন্তু অতুলের মত পরিবর্ত্তনের কোনরূপ লক্ষণ দেখা গেল না। তাহার

জননী তখন পরলোকে, কৃষক-পুত্রদের প্রতি গভীর স্নেহ ছাড়া সংসারে আর কোনও দৃঢ়বন্ধনও তাহার ছিল না।

সামান্য একজন শিক্ষিত প্রজার ঔদ্ধত্য দমন করিতে না পারিয়া রামরতন বাবু মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহারা অতুলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রমাদ গণিল।

একদিন প্রাতঃকালে পাঠশালার উদ্দেশে গিয়া অতুল মাঠের মাঝখানে তাহার চির-পরিচিত কর্ম্ম-গৃহের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইল না। পাঠশালা-ঘরের ভিটাখানি পর্য্যন্ত সমভূমির মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। কিন্তু ঘরের অন্তর্দ্ধানে পাঠশালা অন্তর্হিত হইল না। সেদিন হইতে অতুলের নিজ বাটীতে অধ্যাপনা-কার্য্য চলিতে লাগিল। জমিদার বাবুর ক্রোধ, সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া উঠিল।

কয়েক দিন পরে, প্রভাতের পূর্ব্বেই অতুলের বাসগৃহ পুলিশে ঘিরিয়া ফেলিল। সকলে জানিল—জমিদার-গৃহিণীর অপহৃত সোণার হার সম্বন্ধে তাহারই উপর সন্দেহ পড়িয়াছে। খানা-তল্লাসীতে অতুলের নিজ সততায় দৃঢ়-বিশ্বাসকে যেন উপহাস করিয়াই তাহার রান্নাঘর হইতে হার বাহির হইয়া পড়িল। মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করিয়া, অতুল পুলিশ-হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল।

(৩)

আজ অতুলচন্দ্রের বিচার! মহকুমা ম্যাজিষ্টরের কোর্টের প্রধান প্রধান মোক্তারগণ জমিদার পক্ষের সাক্ষীদের কথিত প্রমাণ-

পরম্পরায় অতুলের বিপক্ষে যে জাল গ্রথিত করিয়া তুলিলেন, আসামী-পক্ষের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ব্যবহারাজীবের ক্ষীণ যুক্তি দ্বারা তাহার কণামাত্র ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা, অনেকের ধারণাতেই আসিল না।

অতুলচন্দ্রও বিচারকের শ্মশ্রুশোভিত মুখে তাহার পূর্ব্ববন্ধু সুশীলকুমারের সাদৃশ্য বিশেষভাবে অনুভব করিয়া লজ্জায় ও ঘৃণায় আত্মসমর্থনে একেবারেই যত্ন করিল না।

এদিকে জমিদার-গৃহে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মহ-কুমার বিচার-ফল জানিবার জন্য প্রেরিত পাইকের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় সন্ধ্যার পর কয়েক দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত আতসবাজি পোড়ান বন্ধ রাখিয়া অবশেষে বৃথা বিলম্ব নিস্প্রয়োজন বোধে রামরতন বাবু বাজি পোড়াইবার হুকুম দিলেন। উদ্ধত-দাম্ভিকের শাসনের প্রত্যাশায় সকলেই আনন্দিত।

ভৃত্যদের অসাবধানতায় হঠাৎ কাছারীর বড় আটচালায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে গোলমাল উঠিল। সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ঘরে আগুন প্রবলভাবে জ্বলিতে লাগিল।

সহসা জনতার মধ্যে তাঁহার শিশু পৌত্রের ভৃত্যকে দেখিয়া, রামরতনবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাহার ক্রোড়ে খোকা নাই।

সর্ব্বনাশ! সে খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া বাজি পোড়ান দেখিতে আসিয়াছিল। খোকা ঘুমাইয়া পড়াতে তাহাকে আটচালার

মধ্যে শোয়াইয়া রাখিয়া সে বাহিরে গিয়াছিল। ইতিমধ্যে ঘরে আগুন লাগাতে সে খোকাকে বাহির করিতে পারে নাই।

জমিদার বাবু আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—তাঁহার একমাত্র বংশধর জ্বলন্ত গৃহমধ্যে। পার্শ্ববর্ত্তী জনসঙ্ঘ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। আর ক্ষণকাল মধ্যেই প্রজ্বলিত চাল খসিয়া পড়িবে।

এ কি!—সহসা কোন্ মৃত্যুকামী হতভাগ্য সেই নিশ্চিত মৃত্যুর ক্রোড়ে ঝাঁপ দিল।

সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেই নির্ভীক পুরুষ অচেতন-প্রায় শিশুকে বাহিরে আনিয়া রামরতন বাবুর পদতলে রাখিল। শিশু রক্ষা পাইল; কিন্তু সেই বীরযুবকের সংজ্ঞাহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। শত শুশ্রূষাতেও সে দেহে চেতনার সঞ্চার হইল না।

রামরতন বাবু সেই মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তার পর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—"অতুল! শেষে তোরই জিৎ হইল!"

সেই মুহূর্ত্তে মহকুমা হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে পাইক আসিয়া সংবাদ দিল,—অতুল বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছে।

*　*　*

হরিনাথপুরে রামরতন বাবুর প্রতিষ্ঠিত অতুলচন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আজিও এই শেষ জিতের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

দুখিয়া

(১)

নামটি ছিল তার দুখিয়া। দুখিনীর মতই তার মুখখানি চিরবিমলিন। আলুথালু তার কেশ, অবিন্যস্ত তার বেশ, উদ্ভ্রান্ত তার দৃষ্টি, অস্থির তার গতি; তবুও সে বিধাতার একটা অপূর্ব্ব পরিকল্পনা। ঐটুকু পরিসরের মধ্যে যে অতখানি সৌন্দর্য্য সঞ্চিত থাকতে পারে, তা শুধু কবি-কল্পনার অধিগত। গণ্ডে তার গোলাপ ফুটে, অধরে তার রক্ত ছুটে; পটলচেরা চোখ দুটি তার বেশ, মেঘের মত গুচ্ছ তার কেশ, কম্বু তাহার কণ্ঠ, মরালের মত তাহার গ্রীবা, অঙ্গে তাহার চাঁপার কলি। সে যখন সাম্‌নে দিয়ে চলে যেত, মনে হত যেন একটা বিদ্যুৎ চম্‌কে গেল—এম্‌নি তার রূপের ঝলক।

নিতান্ত গরীব দুঃখীর ঘরে জন্ম তার; তাই বাপমায়ে আদর করে নাম রেখেছিল তার—দুখিয়া। নামের সার্থকতা সম্পন্ন কর্‌তে যে তার সমস্ত জীবনটা একটা সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনার মত কেঁদে কেঁদেই কেটে যাবে, তা কারও মনের কোণেও আসে-নি।

অমন দেবকন্যার মত রূপ যার—হাস্‌লে যে মাণিক পড়ে, কাঁদলে যে মুক্তা ঝরে—তার জীবন উৎসবের আনন্দের মত সুখোন্মাদেই কেটে যাবে, এই সকলে আশা করেছিল। এদিকে বিধাতা যে তার অদৃষ্টের জাল বুন্‌তে বসে একটা মস্ত বড় ভুল করে তাতে প্রায় সবগুলি দুঃখের কালো সূতোই ব্যবহার করে ফেলেছিলেন, তা কারও জানা ছিল না।

(২)

শৈশবেই সে মাতৃহারা। মানুষকে স্বর্গসুখের আস্বাদ দেবার জন্যে ভগবান মায়ের বুকে যে অমৃত-রাশি সঞ্চয় করে রাখেন, দুখিয়া তার কণামাত্রও ভোগ কর্‌বার অবসর পেলে না। বুড়ো বাপ তার মা-বাপ দুই হয়ে তাকে মানুষ কর্‌তে লাগ্‌লো। বুকে করে সে তাকে "মাসী-পিসীর" গান ক'রে ঘুম পাড়াত, সময়ে সময়ে উচ্ছ্বসিত আবেগভরে তার কচি কচি গাল কে শত সহস্র চুম্বনে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ত। আর মাঝে মাঝে তার বার্দ্ধক্যের কোটরগত দীপ্তিহীন চক্ষু দুটি বুঁজে কল্পনা-দেবীর মায়াদণ্ডস্পর্শে সে কোন্ স্বপ্নরাজ্যে গিয়ে পড়ত; দেখ্‌ত—তার সাধের দুখিয়া, তার বার্দ্ধক্যের অবলম্বন জীবনের শান্তি—দুখিয়া, রাণীর বেশে স্বর্ণসিংহাসনে বসে হাস্‌ছে। বুড়োর বুকে তাতে এতখানি আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত যে, সে একান্ত বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়্‌তো। তার মুখ

সহসা মৃদুহাস্যে কুঞ্চিত হয়ে পড়তো, বিরল দন্তপংক্তি তার লোকলোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। এমনি করেই সে দিন দিন শশিকলার মত বেড়ে উঠতে লাগলো। বুড়ো বাপ তার মুহূর্ত্তের জন্যও তাকে চোখের আড়াল হ'তে দিতো না। তার মনে সর্ব্বদাই ভয় হত,—পাছে তার অমূল্য রত্নটি হারিয়ে যায়।

মধুর উষায় যখন দিনের আলোয় আর রাতের আঁধারে দেব-দৈত্যের যুদ্ধের মত একটা ভীষণ যুদ্ধ লাগত, পাখীরা সব হাল্‌কা হাওয়ায় আলগা ফুলের গন্ধে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠে মধুর কলরবে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করতো, অংশুমালী রক্তচক্ষু করে অন্ধকারকে ভয় দেখাতেন, ঠিক সেই সময়ে বুড়ো ঘুম থেকে উঠতো। তার পর প্রাতঃকৃত্য সেরে মেয়েটিকে দুটি পান্তা ভাত খাইয়ে একখানি বাসন্তী রংয়ের কাপড় পরিয়ে তাকে কোলে নিয়ে সে মাঠে যেতো—কাজ করতো। তার মাথার পাগড়ীখানি বিছিয়ে একটি গাছতলার ছায়ায় সে মেয়েটিকে বসিয়ে দিতো। ক্ষেতে কাজ করতে করতে সে মাঝে মাঝে ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিত, আর অজস্র চুম্বনে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো।

কখনও তার বহুকষ্টসঞ্চিত দু' চার আনা পয়সা থেকে সে তাকে দুই এক পয়সার জিলাপী কিনে দিত। সে অপূর্ব্ব আহার্য্য পেয়ে বালিকার মুখমণ্ডল আহ্লাদে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠতো, আর বুড়ো

তার মুখের দিকে চেয়ে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়্তো। তার পর সূর্য্যদেব যখন মাথার উপর চড়ে বস্তেন, তখন আবার মেয়েটিকে বুকে করে নিজের কুটীরে ফিরে আস্তো। নিজে হাতে ডাল ভাত রেঁধে আগে মেয়েটিকে খাইয়ে দিয়ে তবে নিজে আহারে বস্তো। তার পর একটু বিশ্রাম করে মেয়েটিকে নিয়ে আবার সে ক্ষেতে যেতো। কোনও কোনও দিন দুপুরের রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে খাওয়া দাওয়ার পর দুখিয়া ঘুমের কোলে ঢলে পড়্তো। বুড়ো সেই ঘুমন্ত মেয়েটিকে কাঁধে ফেলে ক্ষেতে লয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতো। সে কি তাকে চোখের আড়াল কর্তে পারে?

ক্ষেতে কাজ কর্তে কর্তে যখন সে স্বেদধারায় সিক্ত হয়ে পড়তো, হাত তার অবশ হয়ে যেতো, তখন সে হাতের কোদালের উপরই ভর দিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে চাইতো। তার সব শ্রম, সব ক্লান্তি সেই মায়াময় মুখের প্রভাবে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যেতো—সে আবার পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগে যেতো। আবার যখন দিনের আলো নিভে আস্তো, পশ্চিম আকাশে দেববালারা ফাগ খেলা কর্তেন, সন্ধ্যারাণী তাঁর অন্ধকার চুলগুলি ছড়িয়ে দিতেন, আর ঝিঁঝিঁর ডাকে তাঁর অরুণ-রাঙ্গা চরণ দুটির কনক নুপুরগুলি বেজে উঠ্তো, পাখীরা সব কলরব কর্তে কর্তে আপন আপন নীড়ে ফিরে যেতো;

বুড়ো তখন দুখিয়ার পুষ্পকোমল হাতখানি ধরে ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে ঘরে ফিরে আস্তো। তার পর আবার রেঁধে দুখিয়াকে খাইয়ে নিজে খেয়ে তাকে বুকের উপর করে ঘুম পাড়াত। এম্নি করেই দুখিয়া বড় হতে লাগ্‌লো।

(৩)

তার পর একদিন অলক্ষ্যে যৌবন এসে দুখিয়াকে বসন্ত-শোভায় মণ্ডিত করে দিয়ে গেল। দেহ তার লাবণ্যে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো, হাসি তার মৃদু হয়ে এলো, গতি তার ধীর হয়ে উঠলো, কথা তার সংযত হ'য়ে পড়্‌লো। অনাঘ্রাত ফুলের মত সে কোন্ দেবতার জন্য অকস্মাৎ বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

মেয়েকে তার জীবনের অবলম্বন করে বুড়ো এম্নি নিশ্চিন্ত ভাবে দিন কাটাচ্ছিল, যেন এম্নি করেই তার বাকী দিন কটা সব কেটে যাবে। হঠাৎ তার চমক হ'ল—লোকের কথায়। মেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে—তার যে বিয়ের বয়স হয়ে গেছে! আতঙ্কে বুড়োর প্রাণ কেঁপে উঠলো—কেমন করে সে তার নয়নতারা হারা হ'য়ে বেঁচে থা্‌কবে? কিন্তু না—বিয়ে তো দিতেই হবে। তা না হলে তার "ভাই ব্রাদার"রা যে তার তামাক বন্ধ করে দেবে, পথে ঘাটে তার নিন্দা করবে—তা তো সে প্রাণ থাক্‌তেও সইতে পারবে না!

সেই দিন থেকে বুড়োর মুখের হাসি অদৃশ্য হ'য়ে গেল,

তার কোটরগত চক্ষু আরও বসে গেল, আহারে আর রুচি হয় না, কাজে তার মন লাগে না। একদিনেই তার বয়স যেন বিশ বৎসর বেড়ে গেল। সে পাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত হল। দুখিয়ার মত মেয়ের পাত্রের অভাব হয় না—পাত্র অনেকই জুটলো; কিন্তু বুড়োর কাউকেই মনে ধর্‌লো না। তার আঁধার ঘরের মাণিককে—তার স্নেহের দুলালীকে সে তো আর যার তার হাতে দিতে পারে না! অনেক সন্ধানে পাত্র জুটলো—দেখ্‌তেও বেশ, আর বাড়ী ঘর জোত জমী ভঁইস গরু সবই আছে। কিন্তু পাত্র হ'লেই তো হয় না—টাকা কোথায়? গরীব হ'লে হয় কি? গরীবেরও মেয়ের বিয়ে দিতে টাকা চাই। বুড়ো আর কোনও উপায় না পেয়ে নিজের যা সামান্য জোত জমী ছিল বিক্রী করে, দুখিয়ার বিয়ে দিল—বিয়ে যে দিতেই হবে! একদিন দিনরাতের সন্ধি সময়ে শুভক্ষণে দুখিয়া তার জীবনদেবতার পায়ে আপনাকে উৎসর্গ করে দিলো। তার পর লাল চেলি পরে ঢাক আর শিঙ্গের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত ভীতিপুলকে সে তার জীবনদেবতার মন্দিরে চলে গেলো।

বুড়ো একদৃষ্টে তার পাল্‌কীর দিকে চেয়ে রইলো—ক্রমে তার চোখ জলে ভরে এলো—সে ঝাপ্‌সা দেখ্‌তে লাগ্‌লো। তার পর পাল্‌কী অনেক দূরে চলে গেলে পর সে তার নির্জ্জন কুঁড়ে ঘরে ফিরে গিয়ে মেজের উপর পড়ে কাটা

ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌লো। আর তার বুক একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে—কিন্তু তাতে কি যায় আসে? তার হুঁকা তামাক তো বন্ধ হয় নাই! কিন্তু অতখানি আঘাত তার বার্দ্ধক্যের জীর্ণ হৃদয় সইতে পার্‌লো না। সে দুখিয়াকে বিদায় দেবার এক মাসের মধ্যেই ভবের হাট থেকে তার দোকান-পসার তুলে নিয়ে কোন্ অজ্ঞাত দেশে চলে গেল।

(৪)

বর্ষণের বহু পূর্ব্বে যেমন আকাশে বিন্দু বিন্দু বাষ্প পুঞ্জীভূত হয়ে মেঘ সঞ্চিত হয়, নবনারীর হৃদয়-ক্ষেত্রেও ঠিক তেম্নি বিবাহের বহু পূর্ব্ব হতেই ঈপ্সিতের উদ্দেশে অনেকখানি ভালবাসা সঞ্চিত থাকে। এ অনেকটা নিরাকার ঈশ্বরের ধারণার মত—অস্ফুট হলেও গভীরতায় কম নয়। আধার পেলেই অকস্মাৎ দলে দলে ফুটে উঠে, আর দিগ্‌দিগন্তে তার গন্ধ ছুটে। তাই ফুলশয্যায় বরবধূ মিলন-মধুর প্রথম রাত্রি যাপন করার পরই—উভয়ে উভয়কে যেন কত দিনের পরিচিত বলে মনে করে। চোখে যাকে কখনও দেখে-নি, কাণে যার কথা কখনও শোনে-নি, একদিনের মধ্যেই তাকে প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন বলে মনে করে। বুকে করেও তারে দূরে বলে বোধ হয়—এ কি এক দিনের আকর্ষণে?

দুখিনী দুখিয়ার জীবনেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। সেও একদিনে তার স্বামীকে প্রাণের সহিত ভালবেসে ফেল্‌লো।

আর প্রতিদানও পূর্ণরূপেই পেলো! চক্ষুদুটি তার দিনরাতই ঘোমটার আড়াল থেকে কার অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাক্‌তো, কাণ দুটি তার কার পায়ের শব্দ শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাক্‌তো; কিন্তু চারি চক্ষের মিলন হলেই তার মাথা আপনা থেকে হেঁট হয়ে যেতো, রক্তিম গণ্ডদুটি তার আরও রঙ্গিয়ে উঠ্‌তো।

গরীব-দুঃখীর মেয়ে সে—চিরকাল লোকের অনাদরই পেয়েছে, আর শুনেছে—শুধু তাদের অকথা আর কুকথা। স্বামীর প্রগাঢ় ভালবাসা আর আদর-যত্নে সে একেবারে গলে যেতো। হৃদয়ে তার এম্নিই ভাবের বন্যা আস্‌তো যে, ভাষা তার মূক হয়ে পড়তো—সে তার চিরবাঞ্ছিতের সঙ্গে ভালো করে কথাই কইতে পার্‌তো না। কতদিন সে মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিয়েছে; প্রতিজ্ঞা করেছে—একবার প্রাণ খুলে কথা কইলে, তাঁর আদর-সোহাগের প্রতিদান দেবে,—দুখিনীকে এতখানি আদর-যত্ন করায় তার প্রাণ যে কতখানি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে তা সে জানাবে; কিন্তু তার সব সঙ্কল্প, সব প্রতিজ্ঞা কার্য্যক্ষেত্রে স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে যেতো। তরুবক্ষে সঞ্চারিণী লতিকার মত সে তার স্বামীর বুকে ঢলে পড়তো। তাতে যে কি সুখ, তা শুধু প্রাণেই অনুভব করা যায়। দীর্ঘ রজনী—তাও যে কোথা দিয়ে কেটে যেতো, তা তারা টের পেতো না। শীতের অল্পায়ু দিনও মিলনের আশা-পথ চেয়ে চেয়ে আর যেন কাট্‌তো না। দিনের বেলায় শত

অছিলায় গুরুজনদের প্রতারিত করে, সে কত বার ঘরে ঢুক্‌তো ; কিন্তু বাহির হবার কথা সে প্রায়ই ভুলে যেতো। সে যে কত বার তাঁকে দেখেছে! কিন্তু দেখার সাধ তার কিছুতেই মিটতো না। সেই একখানি মুখে যেন নিখিলের সৌন্দর্য্য জড়ো হ'য়ে আছে।

মিলনের ছোটখাটো বাধাগুলিতে নূতন প্রেম যে কতখানি মধুর হয়ে উঠে, তা জীবনের বসন্তে ভালো করে বোঝা না গেলেও পরে বেশ বোঝা যায়। প্রেমের আঁজন চোখে লাগ্‌লে সবই সুন্দর দেখায়—প্রাণের তারে তখন সদা সর্ব্বদাই আনন্দের সুর বাজ্‌তে থাকে, আর শতসহস্র দুঃখ কষ্টে জড়িত এই সংসারটা নন্দনের উপবন বলে বোধ হয়। তখন স্বর্গ—সে তো বাঞ্ছিতের মিলনে ; নরক—সে তো তার বিরহে। দুখিয়া দিনরাতই এই স্বর্গসুখে বিভোর থাক্‌তো। প্রণয়-সুলভ ছোটখাটো কলহে আর মান-অভিমানে সে সুখের মাধুর্য্য আরও বেড়ে যেতো।

এই প্রণয় সুখস্রোতের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাধা পড়েছিল—বুড়োর মৃত্যুতে। বাপের এই হঠাৎ মরণে দুখিয়ার শোকটা রীতি-মতই লেগেছিল। দুখিয়ার স্বামীর অবস্থা ভাল। সে আশা করেছিল, বুড়ো দুঃখী বাপকে দিনকতক সুখের মুখ দেখাবে। কিন্তু বিধাতা তার কপালে সুখ লেখেন নাই। তাই দুখিয়া আর সে অবসর পেলে না। দুঃখী বাপ তার চিরসঙ্গী দুঃখের কোলেই তার শেষ নিশ্বাসটুকু ফেলে সুখদুঃখের অতীত দেশে চলে গেল।

দুখিয়ার দুঃখের আর সীমা রইলো না। যে বাপ তাকে এত দুঃখে-কষ্টে মানুষ কর্'ল, সে তার কিছুই করতে পার্লে না—রোগের সময় সেবা করতে পেলে না, মরবার সময় মুখে এক গণ্ডুষ জলও দিতে পেলে না, সে দুঃখ সে রাখ্বে কোথায়? সেই স্নেহকরুণ মুখখানি তার প্রাণে জেগে উঠ্তে লাগ্লো, আর মনে পড়তে লাগ্লো—সেই সব অজস্র আদর-সোহাগের কথা। দর বিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণে মুখখানি তার শিশিরসিক্ত পদ্মের মত ম্লান হ'য়ে পড়লো।

স্বামী তার নিজের বস্ত্রাঞ্চলে সযত্নে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলে—আদর ক'রে বুকে তুলে নিয়ে কত সান্ত্বনা দিলে; কিন্তু তাতে কি হয়? মানুষ সবই জানে—সবই বোঝে, কিন্তু কার্য্যকালে তার জ্ঞানবুদ্ধির কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। মরতে একদিন হ'বে, তা সকলেই জানে। কিন্তু তাই ভেবে কটা লোক কাজ করে? অশীতিপর বৃদ্ধ—সেও এই সংসারকুঞ্জে সযত্নে নূতন করে আপনার নীড় বাঁধবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে।

(৫)

দিন যায়, দিন রয় না। আর সেই যাওয়া দিনগুলি দুঃখের বেদনার উপর এমন একটি বিস্মৃতির প্রলেপ দিয়ে যায় যে, তাতে বেদনার আভাষ মাত্র পাওয়া যায় না। কাল যদি মানুষের দুঃখ জুড়াবার এ ভারটুকু না নিত, তা হ'লে এ দুনিয়ার মানুষের বাঁচা ভার হ'য়ে উঠ্তো।

দুখিয়ার দুঃখের দিনও কেটে গেল—তার দুঃখের জ্বালা বাড়াবার জন্যে সময় তার গতির হ্রাস করলে না। তার প্রণয়-নদীতে আবার জোয়ার এলো। মিলন-মধুর রাত্রিগুলি প্রণয়সুলভ হাস্য-পরিহাসে নিমিষের মধ্যেই কেটে যেতে লাগ্‌লো।

এক এক দিন দুখিয়া পাশ বালিশে তার কাপড় জড়িয়ে এম্নিভাবে রেখে দিত যে, মনে হ'তো যেন সেই শুয়ে রয়েছে। স্বামী তার আবেগভরে সেটিকে আলিঙ্গন কর্‌তে গেলে কক্ষখানি তার মধুর কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠ্‌তো।

কোনও কোনও দিন সে ঘরের আলমারীর পাশে চুপ করে লুকিয়ে থাক্‌তো। স্বামী তার ঘরে এসে তার আশা-পথ চেয়ে চেয়ে বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ কর্‌তেন। তার পর ক্রমে ক্রমে বাড়ীর সমস্ত নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলে যখন তার অনুসন্ধান কর্‌তে বাইরে যেতেন, সে তখন তাড়াতাড়ি এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতো। অনেক সাধ্য-সাধনার পর তবে দরজা খুল্‌তো। এম্নিধারা নানাবিধ হাস্য-কৌতুকে তাদের মধুর দিনগুলা মধুরতর ভাবে কেটে যেতো।

কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর থেকে দুখিয়ার হৃদয়ের খানিকটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হ'ত। প্রণয়োৎসবের শত সহস্র আনন্দ-উন্মাদনার মাঝখানেও থেকে থেকে তার প্রাণের সব তারগুলোই হঠাৎ বেতালায় বেসুরে বেজে উঠ্‌তো। তার মনে হঠাৎ একটা

হারাই হারাই ভাব জেগে উঠ্‌তো। মানুষের মনটা বিধাতা না জানি কি উপাদানে গড়েছেন যে, তাতে অনেক সময়ে ভবিষ্যজীবনের একটা ক্ষীণ ছায়াপাত হয়।

সময়ে সময়ে তার মন এম্নি খারাপ হ'য়ে উঠ্‌তো যে, তার কিছুই ভালো লাগ্‌তো না। অথচ এই বিষাদের কারণ যে কি, সে তার হৃদয়ের স্তরে স্তরে খুঁজেও কিছু পেতো না। স্বামী উপস্থিত থাক্‌লে সে আপনাকে প্রকৃতিস্থ কর্‌বার জন্য শত সহস্র চেষ্টা কর্‌তো; কিন্তু কিছুতেই সাফল্য লাভ কর্‌তে পার্‌তো না। এক এক দিন ঘুমের মাঝে সে তার মৃণালের মতো বাহু দুটি দিয়ে তার স্বামীকে এম্নি জোরে আঁকড়ে ধরতো যে, তাঁকে বাধ্য হ'য়ে তাকে জাগিয়ে দিতে হতো। জেগে উঠে সে লজ্জায় মরমে মরে যেতো।

এমন সময়ে একদিন বৃষ্টির জলে ভিজে দুখিয়ার স্বামী সর্দ্দি ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। দুখিয়ার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তার বিষাদ শতগুণ হ'য়ে জমাট বেঁধে তাকে একেবারে মলিন করে দিলো। সে লজ্জা-সরম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে তার স্বামীর শিয়রে গিয়ে বস্‌লো। মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাঁর কাছ ছাড়া হতো না। সমস্ত রাত জেগে সে তাঁর সেবা কর্‌তো। আহারাদির জন্যও সে উঠ্‌তে চাইতো না। অনেক বলা-কওয়া বোঝানার পর তবে সে যেতো।

বাড়ীর লোকেরা মনে মনে তার উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সামান্য সর্দ্দি জ্বরে এতটা উতলা হওয়া ও বাড়াবাড়ি করা কারুর চোখেই ভালো ঠেক্‌লো না। অসুখ তো অনেকেরই স্বামীর হয়! তা বলে এতখানি বাড়াবাড়ি ও বেহায়ামি কে করে?

এদিকে দুখিয়ার প্রাণের মধ্যে যে কি রকম হাঁকুপাঁকু কর্‌ছিলো, তার সংবাদ তো তারা রাখ্‌তো না! বেচারা আজন্ম দুঃখের কোলে লালিত হ'য়ে সবে মাত্র সুখের মুখ দেখ্‌তে পেয়েছে; তার কপালে এ সুখ টেঁক্‌লে হয়। তার প্রাণের তারে একটা কান্নার সুর বাজতে লাগ্‌লো, ভয়ে তার মুখ পাংশু হ'য়ে উঠ্‌লো, ভাবনায় তার চোখ বসে গেলো। আহারে সে বসে বটে; কিন্তু মুখে আর হাত উঠে না। কোনও রকমে দুই এক গাল মুখে দিয়ে সে উঠে পড়ে।

এদিকে তিন চার দিনে তার স্বামীর সর্দ্দি-জ্বর নিউমোনিয়া ও বিকারে পরিণত হলো। দুখিয়া কাতরকণ্ঠে কত দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা কর্‌লে,—স্বামী আরোগ্য লাভ কর্‌লে বুক চিরে রক্ত দেবে মানত কর্‌লে, কত নির্ম্মাল্য এনে স্বামীর মাথায় বুকে বুলিয়ে দিলে, কত চরণামৃত কত জলপড়া তেলপড়া এনে সেবন করালে—মালিষ করালে, ঘন ঘন বৈদ্য যাতায়াত কর্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একদিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই দুখিয়ার জীবনের সূর্য্যও অস্তে চলে গেলেন।

সকলেই উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ সুরু করে দিলো। কিন্তু দুখিয়ার হৃদয়ে ব্যথাটা এতই গভীরভাবে আঘাত করেছিলো যে, অশ্রু তাহার জমে হোলো, কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হ'য়ে গেলো। আত্মীয়েরা যখন তার স্বামীর দেহ সংকারের জন্য নিয়ে গেলো, তখন তার গণ্ড বেয়ে এক ফোটাও জল পড়লো না, তার কণ্ঠ দিয়ে একটিও বিলাপের স্বর বেরুলো না, সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সবার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

(৬)

স্বামীর বিয়োগে দুখিয়া হয় তো এম্নিভাবেই শোকের কোলে ঢলে পড়তো যে, মরণ তাকে কোলে তুলে নিতে বাধ্য হতো। কিন্তু না—ভগবান যে তাকে মর্‌বারও অবসর দেননি। পৃথিবীতে তার স্বামীর চিহ্ন রাখবার জন্য তার পেটে ভগবান যে কি একটু গুঁড়ো দিয়েছেন, তা তিনিই জানেন। দুখিয়া এখন সেইটুকুকে মানুষ কর্‌বার আশায় বেঁচে রইলো।

ভীষণ ঝড় জলের পর সাগর যেমন প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে, দুখিয়ার চেহারাও এই শোকের ঝড়ের পর সেই রকম গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো।

ভগবানের সৃষ্টির চাতুরী সব চেয়ে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের মনে। কি যে উপাদানে তিনি এটাকে তৈরি করেছেন, তা ভাবতে গেলে জ্ঞান থাকে না। এটা একাধারে বজ্রের

চেয়েও কঠিন, আর ননীর চেয়েও কোমল—ছুঁচের ডগার চেয়েও সঙ্কীর্ণ, আবার আকাশের চেয়েও উদার। আর মানুষের মনের আশা, সেত আরও আশ্চর্য্যজনক। মানুষের অদৃষ্টা-কাশে দুঃখের কালো মেঘ যতই কেন ঘন হয়ে জমুক না—সংসারের সাগরপারে বিপদের উত্তাল তরঙ্গমালা তাকে যতই কেন বিপর্য্যস্ত করুক না কেন, হৃদয়ের উপর শোকের বজ্রাঘাত যতই কেন ভীষণ ভাবে আঘাত করুক না কেন, তার আশার তরু নব নব পল্লবে মুঞ্জরিত হয়ে উঠবেই।

দুখিয়াও তার আসন্ন মাতৃত্বের আশার নেশায় বিভোর হয়ে পড়লো। মনে মনে সে কার কচি কচি ঠোঁট দুটিতে অজস্র চুম্বন বর্ষণ করতো, কার ছোট হাত দুটী নিয়ে নিজের গলার চারিদিকে জড়িয়ে দিতো, শত সহস্র কৌশলে সে কার অদন্তের হাসি দেখ্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌তো। বিপদ কখনও একা আসে না—এই প্রবাদ-বাক্যটি সব জায়গায় ঠিক না খাট্‌লেও, দুখিয়ার দুরদৃষ্টক্রমে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘট্‌লো না।

আলো যেমন পতঙ্গকে কি একটা অজ্ঞাত প্রবল আকর্ষণে টান্‌তে থাকে যে, তার আসঙ্গলিপ্সার জন্য সে মরণকেও বরণ কর্‌তে দ্বিধা বোধ করে না; রূপও ঠিক তেম্নি একটা অজ্ঞাত অথচ ভীষণ আকর্ষণে মানুষকে টান্‌তে থাকে। এ আকর্ষণের বশে মানুষে তার ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত জ্ঞান—যা নিয়ে তার

মনুষ্যত্ব—তা সমস্তই হারিয়ে ফেলে। রূপের নেশায় মানুষকে এম্নিই উন্মাদ করে তোলে যে, তার আর কোনও দিকেই দৃষ্টি থাকে না। সে পশুর চেয়েও অধম হ'য়ে যায়।

দুখিয়ার স্বামীর সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত ছিল—তাঁর এক খুড়তুতো ভাই। আধুনিক শিক্ষার যা প্রধান দোষ, তা তাতে পূর্ণভাবেই প্রকটিত ছিল। চরিত্র তার আদৌ গঠিত হয়-নি। সংযম যে কাকে বলে, তা যেমন আজকালকার শতকরা নিরানব্বই জন শিক্ষিত লোকেরা জানে না, সেও জান্‌তো না।

প্রথম থেকেই সে দুখিয়ার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়েছিল। ভায়ের মৃত্যুতে তার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হলো। সে অবাধে প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢেলে দিল। এখন সে দিন-রাতই দুখিয়ার কথা ভাবে, আর চুরি করে তার রূপসুধা পান করে। রূপের নিশ্চয়ই একটা মাদক শক্তি আছে। তা না হ'লে তাতে এমন নেশা হয় কেন? এই নেশায় সে বিভোর হয়ে উঠলো। একদিন সে বিরলে দুখিয়ার কাছে তার কুৎসিৎ প্রস্তাব করে ফেল্‌লো।

মানুষে যে এমন নির্লজ্জ হতে পারে, তা দুখিয়ার জানা ছিল না; মানুষে যে এমন কুৎসিৎ কথা মুখে উচ্চারণ কর্‌তে পারে, তা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সে তার প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে উঠ্‌লো, ঘৃণায় তার মুখ বিকৃত হ'য়ে

পড়লো, রোষে ও ক্ষোভে তার চোখ দুটো যেন বেরিয়ে পড়বে বলে মনে হতে লাগ্‌লো। সে ঘৃণাভরে সে স্থান থেকে চলে গেলো, মুখে সে কিছুই বল্‌তে পার্‌লো না। লজ্জায় এ কথা সে কারও কাছে প্রকাশ কর্‌তে পার্‌লো না।

(৭)

মানুষের স্বার্থসিদ্ধির পথে যখন বাধা পড়ে, তখন সে হিংস্রজন্তুর চেয়েও ভীষণ হয়ে পড়ে। দুখিয়ার প্রত্যাখ্যানে তার দেবরও সেই রকম ভীষণ হ'য়ে উঠলো! সে মনে করেছিলো, দুখিয়া অবলম্বন-হীনা নারী; আজন্ম দুঃখের কোলে লালিত হওয়ায় সুখের মুখ দেখ্‌বার জন্যে পাগল; বুঝি যৌবন-বসন্তে প্রবৃত্তির মলয়-স্পর্শে সেও তার মতোই আকুল হয়ে উঠেছিলো। লম্পট সে—সতীত্ব যে কি নিধি, তা সে কি বুঝ্‌বে? হৃদয়ের রত্ন-সিংহাসনে স্বামীর মানসমূর্ত্তি স্থাপন ক'রে প্রেমফুলে তাঁর পূজায় সতীর যে কি সুখ, সংযমহীন চরিত্রহীন সে—সে কি তা কল্পনায়ও আন্‌তে পারে?

দুখিয়ার কাছে প্রস্তাব কর্‌বার সময়ে সে অনেকটা সাফল্যের আশা করেছিলো; কিন্তু তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে দেখে, সে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠলো।

সহায়হীনা অবলা নারী সে; তাকে জব্দ করা সে আর একটা কি ভারী কথা! দু-চার জন খলপ্রকৃতির লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সে দুখিয়ার নামে কলঙ্ক প্রচার করে তাকে গৃহ থেকে

তাড়িয়ে দিলে। সতীত্ব বজায় রাখ্‌তে গিয়ে দুখিয়া আজ কলঙ্কিনী ব'লে গৃহ থেকে বিতাড়িতা হ'লো।

লোকের বাড়ীতে কুকুর বেড়ালেরও স্থান হয়; কিন্তু কোনও আত্মীয়ার কলঙ্কিনী নাম প্রচার হ'লে—তা সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক—তার আর বাড়ীতে স্থান হয় না। বিশাল বিশ্বে দুখিয়ার আজ মাথা গোঁজবার মতোও একটু আশ্রয় নাই। তাকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র, বর্ষার অবিরাম বর্ষণ মাথা পেতে সহ্য কর্‌তে হবে। এক মুষ্টি অন্ন দিয়ে তার ক্ষুধার সান্ত্বনা করে, এমন একজনও এ পৃথিবীতে নাই। যদি অলক্ষ্যে সে কারও গৃহ-প্রাঙ্গণের এককোণে তার শ্রান্ত-দেহখানি ছড়িয়ে দিয়ে একটু বিশ্রামের চেষ্টা করে, তা হ'লে কেউ দেখ্‌তে পেলেই কুকুরের মত তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে যদি কারও দ্বারে এক মুষ্টি অন্নের আশায় হাত পাতে তো অজস্র কুকথা শুনে তার পেট ভরে ওঠে।

সময়ে সময়ে তার মনে হত, ওই যে গণ্ডক নদী কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে বয়ে যাচ্ছে, ও তো কুল কুল শব্দ করে তাকেই ডাক্‌ছে; যেন বল্‌ছে—'ওরে, পৃথিবীতে তোর আশ্রয় নেই, জুড়োতে চাস্‌ তো আয়, আমার শীতল জলে ডুব দে; তোর সমস্ত দুঃখের আগুন একেবারে নিভিয়ে দেবো।'

কিন্তু না—তাকে যে বাঁচতেই হবে। স্বামী যে তার

মাথায় কর্ত্তব্যের একটা প্রকাণ্ড বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। সে বোঝা যে তাকে বইতেই হবে।

সে অনেক করে ভিক্ষা করে প্রাণধারণ করে রইলো। কিন্তু অতখানি অত্যাচার তার দুর্ব্বল দেহে সইবে কেন? দুঃখে কষ্টে অনিদ্রায় অনাহারে অকালেই সে একটি পুত্র প্রসব করলে—মাঠের মাঝে একটি গাছের তলে পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হলো। পুত্রের মুখের দিকে চাইতেই—দুখিয়ার প্রাণের মধ্যে একটা সুখের স্পন্দন অনুভূত হলো। সে সব ভুলে গেলো; সে যে আশ্রয়হীনা সম্বল-হীনা, লোকের কাছে কলঙ্কিনী—সব ভুলে গেলো।

সে একদৃষ্টে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলো; কিন্তু এ কি—সে যে নড়েও না চড়েও না। দুখিয়া তার বুকে হাত দিয়ে দেখ্‌লে—তাতে স্পন্দনের লেশ মাত্রও নাই—একেবারে হিম। সঙ্গে সঙ্গেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। তার পর অনেকক্ষণ পরে বিকট হাস্যে সমস্ত প্রান্তর মুখরিত করে সে জেগে উঠ্‌লো, পুত্রের মুখের দিকে একবার চেয়ে তার পরে ঊর্দ্ধশ্বাসে একদিকে দৌড়ে গেলো।

সেই অবধিই সে পাগল। গণ্ডক নদীর তীরে তীরে জনশূন্য প্রান্তরে প্রান্তরে সে বেড়িয়ে বেড়ায়। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে—কখনও বিড়বিড় করে। ক্ষুধা পেলে আস্তাকুঁড় থেকে কুকুর তাড়িয়ে লোকের পরিত্যক্ত পচা অন্ন-ব্যঞ্জন আহার

করে। কখনও বা উচ্চকণ্ঠে রাস্তা দিয়ে প্রণয়-সঙ্গীত গাইতে গাইতে যায়—

"কাঁহা গয় মেরা প্রাণ পিয়ারে।
তুয়া লাগি রোয়ে রোয়ে
বসন তিতায়ল নয়ন আসারে।
ঢুড়তুঁহি দশদিশি হাম তুহুঁ লাগি,
রহি কতহিঁ রজনী অনিমিষে জাগি,
আও আও হিয়াপর হে নাথ হামারে।
আজু এ বসন্তে বহত মলয় ধীরে,
নাচত কুসুমকুল তরুবর শিরে,
আকুল করত পিক ডাকি কুহুস্বরে।
আও আও হিয়াপর হে নাথ হামারে॥"

দুখিয়া সঙ্গীত-বিদ্যার ধারও ধার্‌তো না—কিন্তু কথাগুলি তার প্রাণের আকুলতার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই তৃপ্তিসাধন কর্‌তো। সে যখন "আও আও হিয়াপর হে নাথ হামারে" গাইত—তখন অতি-বড় পাষাণের চোখেও অশ্রু দেখা দিতো।

কখনও বা সে প্রান্তর-মধ্যস্থিত বৃক্ষরাজিকে প্রিয় সম্বোধনে আলিঙ্গন কর্‌তে ছুটে যায়। কোমল দুটি বাহু দিয়ে তাকে সবলে বুকে চেপে ধরে, অজস্র চুম্বনে তাকে ধন্য করে তোলে।

সে অনেক দিনের কথা। এখন সে বৃদ্ধা। মাথার চুল তার

শণমুটি হয়ে গেছে। চক্ষু তার কোটরে প্রবেশ করেছে। অঙ্গের লাবণ্য তার বার্দ্ধক্যের জরা এসে অপহরণ করেছে। মজঃফারপুরে গণ্ডক নদীর তীরস্থিত গ্রামনিচয়ে মাঝে মাঝে এখনও তার দেখা পাওয়া যায়।

* * *

বিধাতার এ কঠোর অভিসম্পাত দুখিয়ার মস্তকে কেন বর্ষিত হ'লো, কেউ তা ভেবে স্থির কর্‌তে পারে না। যাঁদের দূরদৃষ্টি আছে, তাঁরাই কেবলমাত্র এই বোলে মনকে প্রবোধ দেন,—জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল!

নিরুদ্দেশ।

——:(‡∽‡:)——

(১)
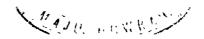
প্রায় ৩০ বৎসর হইল, নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রামে সুরেন ও সুশীল নামক দুইটি বালক আশৈশব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া এক বৃন্তে দুইটি ফুলের ন্যায় শোভা পাইত। কলিকাতার কোনও ধনাঢ্য জমিদারের জমিদারীভুক্ত গ্রামখানি গণ্ডগ্রামপদবাচ্য না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। উহা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। যানের মধ্যে গো-যান বা পাল্কী ব্যতীত সে গ্রামে যাইবার আর কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

গ্রামের চারি দিকে বিস্তৃত মাঠ। পশ্চিমাংশে মুসলমানপাড়া; সর্ব্বদাই কুক্কুটের কণ্ঠধ্বনিতে মুখরিত। মুসলমানপাড়ায় সারি সারি চালাঘর, মধ্যে মধ্যে খড়ের গাদি, ধানের মরাই, কর্দ্দমাক্ত জলবিশিষ্ট অপরিষ্কার পুষ্করিণী, তাহাতে হাঁস চরিতেছে। অল্প-

পরিসর মেটে রাস্তা ; মাঝে মাঝে রাস্তার পার্শ্বে গাবভেরেণ্ডার বেড়া ; পথের ধারে কোথাও গরুর ডাবা, কোথাও খুঁটিতে গরু বাঁধা রহিয়াছে। এ অঞ্চলে চাষবাসের কার্য্য মুসলমান কৃষকদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত।

মুসলমানপাড়া অতিক্রম করিলে একটি তেমাথা পথ দৃষ্টিগোচর হয়। পার্শ্বে একটি অত্যুচ্চ অশ্বত্থ গাছ। পূর্ব্বদিকের পথটি গ্রামের হিন্দুপাড়ার দিকে গিয়াছে। দক্ষিণদিকের পথটি অর্দ্ধ পোয়া দূরে একটি পুষ্করিণীর ধারে ডাক্তার বাবুর বাংলায় গিয়া শেষ হইয়াছে। ডাক্তার বাবু জমিদারের বেতনভোগী। তিনি চারি পাঁচ খানি গ্রামের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। উত্তর দিকের পথ দিয়া একটি গণ্ডগ্রামে যাওয়া যায়।

পূর্ব্বদিকে গ্রামের হিন্দুপাড়ার দিকের পথটি বেশ চওড়া। এই পথটি গ্রামের প্রধান পথ। পথের দক্ষিণ দিকে অনেক লোকের বাস আছে ও তিন চারিটি পুষ্করিণী আছে। উভয় পার্শ্বে জমিদারের কাছারী ও গোলাবাড়ী এবং বারোয়ারীর আট-চালা ; তথায় গ্রামস্থ 'আপার প্রাইমারি' স্কুল বসিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কুমোরের বাড়ী, কলুর বাড়ী, ময়রার বাড়ী ইত্যাদি কতিপয় লোকের বাড়ী আছে। বড় রাস্তা হইতে উত্তর দিকে আর একটি পথ গিয়াছে। এই পথ দিয়া কিছুদূর যাইলে বিস্তর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাড়ী ; অধিকাংশ বাড়ীগুলিই পাকা। গ্রামের মধ্যে

মিত্র ও বসুরা বর্দ্ধিষ্ণু। উভয়েরই পাকা দোতালা বাড়ী ও উভয় বাড়ীর সাম্‌নে বড় চণ্ডীমণ্ডপ।

বসুদিগের বাড়ীর উত্তর দিকে অর্দ্ধপোয়া দূরে 'বোস পুকুর'। এটি বেশ বড় পুষ্করিণী, জল খুব ভাল, গ্রামের অনেকেই এই পুকুরের জল পান করেন। গ্রাম হইতে একটি সরু পথ দিয়া এই পুষ্করিণীতে যাইতে হয়। পথের পশ্চিম দিকে বহুদূরব্যাপী খেজুরের বাগান, পূর্ব্বদিকে এক বিস্তৃত আম বাগান। শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত আমগাছগুলি এত ঘন যে, ভিতরে প্রবেশ করিলে আকাশ দেখা যায় না। আমবাগান শেষ হইলে খানিকটা ফাঁকা জায়গা পড়ে, তাহাতে পূর্ব্বদিকে একটি প্রকাণ্ড মাঠ দৃষ্টিগোচর হয়। এই মাঠের অপর পার্শ্ব দেখা যায় না। কেবলই মাঠ ধু ধু করিতেছে। মাঝে মাঝে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া এক একটি অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় ও দূরত্ব-নিবন্ধন অতিশয় ক্ষুদ্র দেখায়। বসুপুকুরের চারিদিকে উঁচু পাড়; পাড়ের উপর কলাবাগান।

(২)

সুরেন মিত্রদের ও সুশীল বসুদের বাড়ীর ছেলে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। সুরেনের পিতামাতা কেহই ছিলেন না। সে শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। তাহার অভিভাবক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশ, বয়স ২৫।২৬ বৎসর। সংসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

ব্যতীত ভ্রাতৃজায়া ও বিধবা খুড়ী। সুশীলের পিতামাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন।

সুরেনদের ও সুশীলদের বাড়ী পাশাপাশী। তাহারা একই দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। শৈশব হইতে এক সঙ্গে খেলা করিয়া এক সঙ্গে বেড়াইয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বড়ই ভালবাসা জন্মিয়াছিল। যখন উভয়ের পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তাহাদের এক সঙ্গে হাতেখড়ি হইল ও তাহারা একত্রে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতে যাইল। স্কুলের ছুটি হইলে তাহারা এক সঙ্গে খেলা করিত; এক সঙ্গে "বোস পুকুরে" স্নান করিত, সাঁতার দিত; এক সঙ্গে গ্রামের পথে ঘাটে বিচরণ করিত। আমের সময় আমবাগানে আম পাড়িত; ছুটির দিন গ্রামের এ-বাড়ী ও-বাড়ী করিয়া বেড়াইত। গ্রামের যেখানে যাহা ছিল, সকলই তাহাদের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিল। দত্তবাড়ীর উঠানের বড় কুলগাছটি, ভট্টাচার্য্যদের পেয়ারা গাছ, কলু বাড়ীর ঘানিগাছ, পতিত পাল কুমোরের চাক, চাকের তৈয়ারী মাটির খেলনা, তেমাথার অশ্বত্থ গাছ, খেজুর ও আম বাগান প্রভৃতি তাহাদের উভয়েরই অন্তরে অন্তরে গাঁথা ছিল।

সুরেনের মাতা ছিলেন না। সে সুশীলের মাতাকে মা বলিত। সুশীলের মাতা তাহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন এবং প্রায়ই সে সুশীলদের বাড়ী থাকিত।

উভয়ের যখন ১০ বৎসর বয়স, গ্রামস্থ স্কুল ছাড়িয়া তাহারা

নিকটস্থ গণ্ডগ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। দুই জনে এক সঙ্গে পূর্ব্বকথিত তেমাথা পথের দিকের পথ ধরিয়া এক ক্ষুদ্র মাঠ পার হইয়া স্কুলে যাইত। যে দিন স্কুল বন্ধ থাকিত, অভ্যাস-মত এক সঙ্গে বেড়াইয়া গ্রামের রাস্তা ঘাট বাগান পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতি জিনিসের আস্বাদ প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিত। তেমাথার অশ্বত্থ গাছের মাথায় বহুদিন ধরিয়া একটি শকুনির বাসা ছিল। সময়ে সময়ে দুই জনে অশ্বত্থতলায় আসিয়া শকুনিকে লক্ষ্য করিয়া হাততালি দিয়া গাহিত,—

"হাড়গিলেরে ভাই, চিঁড়ে কুটে খাই।
চিঁড়েয় বড় ধান, খোঁপা ধরে টান।
খোঁপায় বড় উকুন, নাক কাট্‌বার হুকুম।"

কোনও কোনও দিন ছুটি থাকিলে দুই জনে বোসপুকুরে পথের পূর্ব্ব দিকে যে মাঠ দেখা যায়, উহার কোনও বট বা অশ্বত্থ গাছ লক্ষ্য করিয়া বেড়াইতে যাইত এবং বহুদূর গিয়া সেই বৃক্ষতলে বসিয়া অনন্ত আকাশ ও মাঠ প্রাণ ভরিয়া দেখিত। তাহারা উভয়েই জন্মাবধি নিজ গ্রাম ও নিকটস্থ যে গ্রামে তাহাদের স্কুল ছিল, এই দুই গ্রাম ছাড়া জগতের আর কোনও অংশই দেখে নাই। তাহাদের বোধ হইত, মাথার উপর যে আকাশ দেখিতেছে, উহা এই দুইটি গ্রামের পর চারিদিকে যে মাঠ দেখা যাইত, তাহার অপর প্রান্তে ছোট ছোট গাছের সারির

পর গিয়া মাটিতে মিশিয়াছে। তাহাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই দুই গ্রাম লইয়াই ছিল।

(৩)

সুরেনের ও সুশীলের বয়স এক্ষণে ১৪ বৎসর। উভয়েই উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে।

আষাঢ় মাস। এক দিন রবিবার বেলা দ্বিপ্রহর হইতে ভারি বৃষ্টি হইতেছে। বেলা ১১টা হইতে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ক্রমে গাছের মাথা কটা হইল! সোঁ সোঁ করিয়া গভীর রবে ঝড় উঠিল। গাছের মাথাগুলি যেন ভূমি স্পর্শ করিতে লাগিল। ক্রমে ঝড় থামিয়া অজস্র মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এমন বৃষ্টি সচরাচর হয় না। গ্রামখানিতে যেন জলপ্লাবন উপস্থিত হইল। সুরেন দোতলা ঘরের জানালার উপর বসিয়া এই ভীষণ বৃষ্টি দেখিতে লাগিল। বৃষ্টিতে গাছপালা সব ঝাপ্‌সা হইয়াছে। দূরে ঘোষেদের প্রকাণ্ড জামগাছের মাথা ধোঁয়ার মত হইয়াছে। তাহাতে অজস্র বারিপাত হইতেছে। গাছটী মাথা নাড়িয়া যেন দারুণ যন্ত্রণা জ্ঞাপন করিতেছে। তেমাথার অশ্বত্থ গাছের মাথার কিয়দংশ দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। উহা ঝড়ে হেলিয়া পড়িয়াছে। এইরূপে বহুক্ষণ বৃষ্টি হইবার পর ক্রমে যখন বৃষ্টির তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিল, সুরেন দেখিল—চারিদিকে জল দাঁড়াইয়াছে ও স্থানে স্থানে স্রোত

বহিয়া যাইতেছে। সেই জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়িয়া বড় বড় বুদ্‌বুদ উঠিতেছে ও জলে মিশিয়া যাইতেছে।

বেলা চারটার সময় বৃষ্টি থামিল। সুরেন দৌড়িয়া সুশীলের বাড়ী যাইল। আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। অন্ধকার কাটিয়া আলো দেখা দিয়াছে। সুরেন ও সুশীল উভয়ে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইল; গ্রামের এ-পাড়া ও-পাড়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া জল দেখিতে লাগিল। দেখিল, ঘোষেদের জামগাছের একটি বড় ডাল ভাঙ্গিয়া তলায় পড়িয়া আছে। উহারা আনন্দে জামগাছের ডালের উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তার পর শকুনির অবস্থা জানিবার জন্য অশ্বত্থ গাছের দিকে যাইতে লাগিল। তথায় গিয়া তলা হইতে শকুনির পাখার ঝট্‌পট আওয়াজ শুনিতে পাইল। ঐ গাছের তলায় বসিবার জন্য চারিদিকে ইঁটের গাথ্‌নি ছিল।

দুই জনে সেইখানে অনেকক্ষণ বসিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিয়া দেখিল,—অশ্বত্থ গাছের অনতিদূরে একটি মাটীর ঢিপির উপর দীর্ঘশ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত এক সন্ন্যাসী আগুন জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন। সে সন্ন্যাসীকে গ্রামে ইতিপূর্ব্বে তাহারা কথনও দেখে নাই এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, উভয়ে যাইবার সময় সন্ন্যাসীকে দেখিতে পায় নাই। উভয়ে স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইল।

সুরেনের বুকের মধ্যে যেন কেমন একটা আতঙ্ক আসিল। সন্ন্যাসী বালক দুইটীকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। তাহারা সভয়ে নিকটে যাইলে, সন্ন্যাসী আপন হস্ত দ্বারা সুরেনের কপালে বিভূতির ফোঁটা দিয়া দিল। উভয়েই সভয়ে পলাইয়া আসিল। যখন উহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

(৪)

সেই রাত্রেই সুরেনের ভারি জ্বর হইল। তাহার দাদা ও ভ্রাতৃজায়া লক্ষ্য করিলেন,—সুরেন সমস্ত রাত্রি মাঝে মাঝে যেন বিভীষিকা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

প্রত্যূষে ডাক্তার আসিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—'জ্বর বড় গোলমেলে রকমের। হঠাৎ কোনও ভয় পাইয়াছে বোধ হয়।'

সমস্ত দিন সুরেন অজ্ঞান ও অচৈতন্য। গ্রামের অনেকে দেখিতে আসিল। কেহ কেহ বলিল,—"কাল বৃষ্টির পর উহারা দুই জনে জলে জলে অনেকক্ষণ বেড়াইয়াছিল; তাই বোধ হয় জ্বর হইয়াছে; শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।"

কিন্তু জ্বর কমিল না। ডাক্তর বাবু আসিয়া দুই বেলা দেখিয়া যান। পর দিন সুরেন প্রলাপ বকিতে লাগিল। সমস্ত দিন সে কত কি বলিল, কেহই তাহার কোনও অর্থ করিতে পারিল না।

সে একবার বলিয়া উঠিল,—"তোমার কোনও পরিবর্ত্তন নাই ; তোমায় দেখিলেই সকলে চিনিতে পারে। কিন্তু তুমি আমার চেহারার এত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও কি করিয়া আমাকে চিনিলে !" এইরূপ আরও দুর্ব্বোধ্য কথা বলিল।

সুশীলকে সকলে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্ন্যাসীর কথা অবগত হইলেন ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, গ্রামের আর সকলেই বলিল,—"কি, আমরা তো কোনও সন্ন্যাসীই দেখি নাই !" অনেকে অশ্বত্থ গাছের নিকট কথিত স্থানে গিয়া দেখিল, তথায় সন্ন্যাসী আসার কোনও চিহ্নই নাই।

বৃহস্পতিবার। সুরেনের আজ পাঁচ দিন হইল অসুখ হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইতেছে। ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন। দেখিলেন, সুরেনের অবস্থা বড় খারাপ। সকলেই বুঝিলেন, আর আশা নাই।

সন্ধ্যার পর সুরেনের বেশ জ্ঞান হইল। সুরেন চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার পর সুশীল তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে বলিল,—"ভাই সুশীল ! আমি এ জনমের মত বিদায় লইলাম ; আবার জন্মান্তরে দেখা হইবে।"

পরে সুরেন অশ্রুপূর্ণ লোচনে দাদার দিকে চাহিল। তার পর সব ফুরাইল। ১৪ বৎসর বয়সে সুরেন, দাদার বক্ষে দারুণ

শোক দিয়া, প্রাণসম চির-সুহৃৎ সুশীলকে কাঁদাইয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

সুরেনের মৃত্যুর পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশ শোকে পাগলের ন্যায় হইয়াছিলেন

সুশীলের অবস্থা কে বুঝিবে? তাহারা একবৃন্তে দুইটি ফুল ফুটিয়াছিল। প্রবল কালের বাত্যা আসিয়া অকালে একটিকে বৃন্তচ্যুত করিল। সুশীলের জীবনের সুখ ও শান্তি যেন চির-দিনের মত চলিয়া গেল।

(৫)

মানুষের যতই দারুণ শোক হউক না কেন, সময়ে তাহার হ্রাস হয়। তাহা না হইলে, সংসার অচল হইত। ক্রমে সুরেনের দাদা সুরেশের দারুণ শোক মন্দীভূত হইতে লাগিল। সুশীলও দেখিল, সুরেন ছাড়া সংসার চলে। কিন্তু সুরেনের স্মৃতি তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল।

দুই বৎসর পর সুশীল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পাঠ করিতে গেল। ছুটিতে সে যখন বাড়ী আসে, সুরেনের কথা মনে হয়। গ্রামের প্রত্যেক জিনিসই সুরেনের স্মৃতির সহিত জড়িত। বাড়ী ঘর বাগান পুকুর পথ—প্রত্যেক জিনিসেই সে সুরেনকে দেখিতে পাইত। কি করিয়া সে সুরেনকে একেবারে ভুলিবে!

ক্রমে সুশীল বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট আপিসে চাকরিতে নিযুক্ত হইল।

প্রায় ৩০ বৎসর হইল, সুরেনের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার দাদা সুরেশের সংসারে এখন অনেক লোক। সুরেশের এক্ষণে চারিটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। কন্যাদের সব বিবাহ হইয়াছে, কনিষ্ঠ পুত্রের ১৪ বৎসর বয়স। তাহার নাম—চারু। সে সুশীলের বড়ই প্রিয় ছিল। তাহাকে পাইয়া সুশীল সুরেনের শোক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। সে এখন উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়িতেছে। অপর পুত্রেরা সাবালক হইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

সুরেশ প্রায় ভাইকে ভুলিয়া গিয়াছে। সে যে অনেক দিনের কথা! এক্ষণে মনের মধ্যে একটি ক্ষীণ স্মৃতি আছে মাত্র। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গ্রামের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা একে একে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বালকেরা প্রৌঢ়ত্ব ও প্রৌঢ়েরা বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুশীল অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকেন। ছুটিতে বাড়ী আসেন মাত্র।

(৬)

আজি প্রায় এক মাস হইল, গ্রামের জমিদারের নিযুক্ত ডাক্তার বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। জমিদার কলিকাতা হইতে একজন এল-এম-এস পাশ করা ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। অল্প দিনেই তিনি গ্রামে আসিয়া পৌঁছিবেন।

এই স্থানে নূতন ডাক্তার বাবুর পরিচয় পাওয়া আবশ্যক। ডাক্তার বাবু প্রবোধচন্দ্র দত্ত দুই বৎসর হইল এল এম-এস পাশ করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী কলিকাতায়। তাঁহার পিতা-মাতা কেহই জীবিত ছিলেন না। তাঁহারা চারিটি সহোদর। তিনিই সর্ব্বকনিষ্ঠ, অপর ভ্রাতারা সকলেই চাকরি করিতে-ছেন। ডাক্তার বাবুর এখনও বিবাহ হয় নাই।

প্রবোধ বাবু ডাক্তার পাশ করিয়া দুই বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার পসার হইল না। তিনি অবশেষে খবরের কাগজে এই নূতন চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া এই পদ লইবার মনস্থ করিয়া কলিকাতায় জমিদার বাবুর নিকট এই পদের প্রার্থী হন। জমিদার মহাশয় তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করিয়া মাসিক ১০০৲ টাকা বেতন ধার্য্য করেন ও নায়েবকে পত্র লিখিয়া ডাক্তার বাবুর পৌঁছিবার দিন জ্ঞাপন করিয়া ষ্টেশনে গো যানাদির বন্দোবস্ত করিতে বলেন।

ডাক্তার বাবু নির্দ্দিষ্ট দিনে বেলা ৪টার সময় ষ্টেসনে গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলেন,—জমিদারের পাইক দুইটী গো-যান লইয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। ডাক্তার বাবুর মালামাল নামাইয়া এক ছইবিহীন গো-যানে বোঝাই করা হইল। ডাক্তার বাবু অপর একটী ছইযুক্ত গো-যানে উঠিলেন। ডাক্তার বাবুর গাড়ীর উপর প্রথমতঃ বিচালি পাড়া, তাহার উপর সতরঞ্চী বিছান রহিয়াছে;

মাথায় দিবার জন্য একটি বালিশও আছে। ডাক্তার বাবু গাড়ীতে উঠিলেন। ক্ষণিকক্ষণ শয়ন করিয়া পরে চারিদিক দেখিবার জন্য উঠিয়া হেঁটমুণ্ডে উপবেশন করিলেন; কারণ, সোজা হইয়া বসিলে ছইতে মাথা ঠেকে। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার বাবু কখনও গো-যানে উঠেন নাই। আশৈশব কলিকাতাতেই কাটাইয়াছেন; সুতরাং গো-যানে যাওয়া তাঁহার নিকট এক অভিনব ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল।

ডাক্তার বাবু গাড়ীতে বসিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। ষ্টেসনের পূর্ব্বদিকে কাঁচা রাস্তা দিয়া তাঁহার গাড়ী ক্রমে দুইটি ক্ষুদ্র গ্রাম অতিক্রম করিয়া একটি বিস্তৃত মাঠে আসিয়া পড়িল। এই মাঠটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা ও প্রস্থে দুই ক্রোশ। বিস্তৃত প্রান্তর দেখিয়া ডাক্তার বাবুর মন উল্লসিত হইল। তিনি জীবনে এত বড় মাঠ কখনও দেখেন নাই। বহু দূরে ধোঁয়ার মত গাছের সারি মাঠের প্রান্ত সীমা বলিয়া জানান দিতেছে। গো-যান উঁচু নীচু রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। এই মাঠ পার হইলেই আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত গ্রামের মুসলমানপাড়া।

(৭)

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডাক্তার বাবুর গাড়ী মুসলমান পাড়ায় আসিয়া পৌঁছিল। সাম্‌নে সাম্‌নে জমিদারের পাইক পাগড়ী বাঁধিয়া লাঠি হস্তে যাইতেছে। মুসলমানেরা রাস্তার ধারে সার বাঁধিয়া নূতন

ডাক্তার বাবুকে দেখিতে লাগিল। মুরুব্বীরা হস্তোত্তোলন করিয়া ডাক্তার বাবুকে সেলাম করিতে লাগিল।

মুসলমানপাড়ায় প্রবেশ করিয়াই ডাক্তার বাবুর যেন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ক্রমে সন্ধ্যার সময় গাড়ী তেমাথার অশ্বত্থ গাছের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। গাছটি দেখিয়া ডাক্তার বাবুর মনে হইল যে, এইরূপ চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত বসিবার স্থানযুক্ত গাছ তিনি যেন কোথায় দেখিয়াছেন। কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়াও কোথায় দেখিয়াছেন, মনে করিতে পারিলেন না। শত চেষ্টায়ও পুরাতন স্মৃতির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইলেন না।

ক্রমে ডাক্তার বাবু বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাংলা বেশ পছন্দসই। নায়েব বাবু আসিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার বাবুর আহারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নায়েব বাবুর সহিত ডাক্তার বাবুর গ্রাম সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। গ্রামে কত লোকের বাস, কয়টি পাড়া, কয়টি পুষ্করিণী, তাহাদের জল কেমন, কয়টি রাস্তা, প্রধান প্রধান লোকের নাম প্রভৃতি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। নিকটস্থ গ্রাম-সমূহেরও খবর লইলেন।

পরদিন গ্রামের অনেকে ডাক্তার বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নাম তিনি নায়েব বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের সহিত চাক্ষুষ আলাপ করিয়া ডাক্তার বাবু পরম প্রীতি-লাভ করিলেন।

তাঁহাদের সহিত গ্রাম-সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া ডাক্তার বাবু মানস-পটে গ্রামের একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইলেন।

গ্রামস্থ লোকেরা ডাক্তার বাবুর সহিত আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। তাঁহারা ফিরিয়া যাইবার সময় বলাবলি করিলেন,—"ডাক্তার বাবু বেশ লোক। কেমন মিষ্ট কথা! যেন আমাদের কত দিনের পরিচিত।" কেহ কেহ বলিলেন,— "হবে না কেন! বিদ্বান লোক—পাশ করা ডাক্তার!"

(৮)

ডাক্তার বাবু প্রায় পনের দিন আসিয়াছেন। প্রত্যহই ডিস্পেন্সারিতে বসিয়া ঔষধ দেন। এখনও গ্রামে কোনও 'কল' পান নাই। তবে নিকটস্থ গ্রামে তিন চার দিন 'কলে' গিয়াছেন। পাল্কী করিয়া 'কলে' যাইবার সময়, ডাক্তার বাবু যখন পূর্ব্বকথিত অশ্বত্থ গাছের নিকট দিয়া যাইতেন, তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইত। ডাক্তার বাবু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোনও কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেন না।

একদিন বৈকালে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইতেছে। এমন সময় সুরেশ বাবুর বাড়ী হইতে খবর আসিল যে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের বড় জ্বর, ডাক্তার বাবুকে একবার যাইতে হইবে। তিনি পাল্কী পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ডাক্তার বাবু পাল্কী করিয়া বাহির হইলেন। ডাক্তার

বাবু গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, তিনি মনের মধ্যে গ্রামের চিত্র যেরূপ অঙ্কিত করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে গ্রামটি অবিকল সেইরূপ। তিনি যেন চিরপরিচিত গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছেন।

যথাসময়ে ডাক্তার বাবু মিত্র-বাড়ী পৌঁছিলেন। দোতালা ঘরের বিছানায় চারু শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ডাক্তার বাবু রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, 'কোনও ভয় নাই, দুই এক দিনেই জ্বর কমিয়া যাইবে।' ডাক্তার বাবু যতক্ষণ ঘরে বসিয়া ছিলেন, ঘরটা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘরের প্রতি জানালা, কপাট, উপরে উঠিবার সিঁড়ি ভাল করিয়া বার বার দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর যাইবার সময় ডিস্‌পেন্সারীতে ঔষধ লইবার জন্য একজন লোক পাঠাইতে বলিয়া গেলেন।

আজ সন্ধ্যার সময় সুশীল বাড়ী আসিয়াছিলেন; তিনি নূতন ডাক্তার বাবুকে দেখেন নাই; তাই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি সুরেশ বাবুর বাড়ী গিয়া শুনিলেন,—ডাক্তার বাবু সেইমাত্র চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনি খানিকক্ষণ চারুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহাকে দেখিলেন। পরে কি মনে করিয়া একটি ছাতি লইয়া ডাক্তার বাবুর বাংলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

(৯)

ডাক্তার বাবু চাকরের মারফৎ চারুর ঔষধ পাঠাইয়া একা একটি চেয়ারে বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন! বৃষ্টি প্রায় থামিয়া গিয়াছে; কিন্তু আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন; ক্বচিৎ দূরান্তে ঝিল্লীরব শুনা যাইতেছে।

ডাক্তার বাবু ভাবিতেছিলেন,—গ্রামখানি, সুরেশ বাবুর বাটী, তাঁহার এত পরিচিত বলিয়া কেন বোধ হইতেছে? তিনি কি পূর্ব্বে এই গ্রামে আসিয়াছিলেন!

ডাক্তার বাবু পুরাতন স্মৃতির দ্বার উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে সুশীল তাঁহার কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। ডাক্তার বাবু একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি চেয়ারে বসিতে দিলেন ও নিজে পুনরায় উপবেশন করিলেন। পরে সুশীলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুশীল তাহার পরিচয় প্রদান করিলে, ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"মহাশয়, আপনাকে যেন বড় পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে!"

সুশীল বলিল,—"হ'তে পারে। কলিকাতায় কোথাও দেখে থাকবেন।"

ডাক্তার বাবু ইঁহাকে কোথায় দেখিয়াছেন—এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সুশীল বলিল,—"আপনি যে ছেলেটিকে

আজ দেখ্‌লেন, তাহার অবস্থা কেমন, বলুন তো! আমার মনে বড় ভয় হইয়াছে। ও ভাল হবে তো!"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"কেন? চিন্তার কারণ তো কিছুই দেখিতেছি না! সামান্য অসুখ আপনারা এত ভীত হইয়াছেন কেন?"

সুশীল উত্তর করিল,—"কেন ভয় হয় শুন্‌বেন? সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। এই বালকের সুরেন নামে এক কাকা ছিল। আমি ও সুরেন একবয়সী ছিলাম। সে আমার আশৈশব সঙ্গী ছিল। ঠিক এই বয়সে এই রকম এক দিন, আষাঢ় মাসে, সন্ধ্যার সময় সে আমাদের ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়। সেদিন'ও ঠিক এই রকম টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি হইতেছিল। তাই আমার ভয় হইতেছে, আবার যেন কোনও প্রিয়বস্তু আজ ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে।"

ডাক্তার বাবু খুব মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেছিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার কি অসুখ করিয়াছিল?"

সুশীল বলিল,—"এক দিন রবিবার খুব বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পর বৈকালে আমরা দুই জনে জলে জলে অনেকক্ষণ বেড়াই। তাহার পর আমাদের গ্রামে যে বড় অশ্বত্থ গাছ দেখিতেছেন, তাহার নিকটে একটি সন্ন্যাসী দেখিতে পাই। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সন্ন্যাসীকে গ্রামের আমরা দুই

জন ছাড়া আর কেহ দেখিতে পায় নাই। সেই সন্ন্যাসী সুরেনের কপালে বিভূতির ফোঁটা দিয়া দিল। বাড়ী আসিয়া তাহার ভারি জ্বর হইল। চার দিন পরে ঠিক সন্ধ্যায় সে মারা গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে বলিয়াছিল,—আবার জন্মান্তরে দেখা হবে। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা।"

ডাক্তার বাবু নিবিষ্টমনে শুনিতে শুনিতে দরজার বাহিরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন; বাহিরে অন্ধকারে যেন কাহাকে দেখিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার পর তাঁহার মনে অকস্মাৎ এক অতি পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। পরে তিনি সুশীলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—জন্মান্তরে তো আবার দেখা হইল। কিন্তু ভাই আবার বিদায় চাহিতেছি। ঐ দেখ, আমাকে আবার লইতে আসিয়াছে।"

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু দরজার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়াই ভূতলে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সুশীল সভয়ে দরজার দিকে তাকাইয়া দেখিল,—জটাজূটধারী সেই পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান।

সুশীল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সন্ন্যাসী সুশীলকে বলিলেন,—"ভয় পাইয়াছ? কোনও ভয় নাই!"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী সুশীলের গাত্রস্পর্শ করিলে, সুশীলের ভয় অপসৃত হইয়া হৃদয়ে সাহস আসিল।

পরে সন্ন্যাসী ডাক্তার বাবুকে তুলিয়া শয্যার উপর শয়ন করাইলেন এবং সুশীলকে বলিলেন,—"তোমার কোনও ভয় নাই! তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যাও।"

সন্ন্যাসীর আদেশে সুশীল চিন্তিত মনে বাড়ী ফিরিলেন। সারারাত্রি জাগিয়া কত কি চিন্তা করিলেন। কত দিনের কত কথা মনে উদয় হইল।

পরদিন প্রত্যূষে গ্রামের বহু লোক ডাক্তার বাবুর বাঙ্‌লায় আসিয়া ডাক্তার বাবুর বা সন্ন্যাসীর কোনও সন্ধান পাইলেন না। অনেক চিন্তা করিয়াও কেহ ডাক্তার বাবুর এই হঠাৎ নিরুদ্দেশের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না।

তারা

———∽‡ * ‡∽———

অত্রস্থ জজ আদালতে অনেক দিন ধরিয়া একটা খুনী মকদ্দমার বিচার চলিতেছিল। তাহার বিচার শেষ হইয়াছে। মকদ্দমাটি নানা রহস্যে পূর্ণ। তাহা কিন্তু বিস্তৃতরূপে এ পর্যান্ত কোনও বাঙ্গালা সংবাদপত্রেই প্রকাশ হয় নাই। 'ডেলি নিউজের' জনৈক সংবাদদাতা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন মাত্র। আমি তাহার কিয়দংশের বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে প্রদান করিতেছি।

এই মকদ্দমায়, রামনগরের দত্তবাড়ীর বুড়ো কর্ত্তাকে খুন করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার পুত্র শচীন্দ্রলাল অভিযুক্ত হন। জীবন চন্দ্র হালদার প্রধান সাক্ষী। জীবনচন্দ্র জমীদার রসময়ের বাড়ীতে চাকরী করিত,—মাসে দশটি টাকা বেতন পাইত। জীবনের স্ত্রী তারাসুন্দরী ব্যতীত তাহার সংসারে আর কেহ ছিল না। তারা রূপে-গুণে অপূর্ব্ব সুন্দরী।

তারার প্রভায় হঠাৎ একদিন জীবনচন্দ্রের জীবনগতি কিরূপে

ফিরিয়া গেল, তাহারই বিবরণ প্রদান করিতেছি। মকদ্দমার রহস্য তাহারই অন্তর্নিহিত।

*　　　*　　　*

রামনগরের দক্ষিণ প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরখানি ক্ষুদ্র হইলেও অতি পরিষ্কার ও নয়নের তৃপ্তিকর। প্রাঙ্গণতল এমন পরিষ্কাররূপে নিকান যে, তাহাতে সিন্দূর ফেলিয়া তুলিয়া লওয়া যায়। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটি তুলসী-বেদিকা। তুলসী-বেদিকা হইতে কয়েক হস্ত ব্যবধানে কয়েকটি ফুলের গাছ। বাড়ীর চারিধারে রাং-চিতার বেড়া। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার একটি মাত্র পথ। পথটি সরল গতিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া অপর এক পথের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পথটী অতি পরিষ্কার ও আবর্জ্জনাশূন্য। তাহাতে একগাছি তৃণ বা বৃক্ষের গলিত পত্র একটিও দেখিতে পাওয়া যায় না।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। গৃহে দীপ জ্বলিতেছে। চতুর্থীর কিশোর চন্দ্র, তারাদল সহ সমুদিত হইয়া পশ্চিম গগনপ্রান্তে শোভা বিস্তার করিতেছেন। এই প্রফুল্ল সময়ে, একটি ত্রয়োবিংশতি বর্ষীয়া রমণী সেই কুটীরমধ্যে একাকিনী উপবিষ্টা। রমণীর মস্তকের কেশদাম কর্ত্তিত; অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাও তৈল-নিষেক অভাবে রুক্ষ। পরিধানে জীর্ণ বসন। সুন্দর মুখখানি চিন্তারাহু-গ্রস্ত। দেখিলেই বোধ হয়, রমণী এক সময়ে অপূর্ব্ব সুন্দরী

ছিল; এক্ষণে অযত্নে ও দুঃখকষ্টের দারুণ পেষণে ঊষাকালীন শশধরের ন্যায় ম্লান ও লাবণ্যশূন্য। সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তি আকুল-নয়নে যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে একটি পুরুষ কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—"তারা, একলাটি চুপ্ করে বসে বসে কি ভাব্‌ছো?"

রমণী কহিল,—"এতক্ষণ তোমারই আশা পথ পানে চেয়ে আছি।"

পুরুষ।—কেন বল দেখি? আমি তো এমন সময় আর কোনও দিনই বাড়ী ফিরি না!

তারা।—আজ বিশেষ দরকার আছে; তুমি খানিক বিশ্রাম কর; পরে বল্‌ছি।

পুরুষ।—আমার বেশীক্ষণ দেরী করার যো নেই! এখনই বাবুর বাড়ী ফিরে যেতে হবে।

তারা।—না, আজ আর বাবুর বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। তোমাকে অনেক কথা বল্‌বার আছে। যা কখনও শোন-নি, আজ তোমাকে তাই শুনাব।

পুরুষ চমকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি সে কথা, তারা?"

তারা।—ব'স, বল্‌ছি। আচ্ছা, দত্তদের বুড়ো কর্ত্তার হত্যা-ঘটনার তদন্তের জন্য কে একজন বড়-দারগা আস্‌ছেন,—এ কথা সত্যি কি?

পুরুষ।—সত্য।

তারা।—এবারকার তদন্তে শচীন্দ্র বাবুর পক্ষে কিছু সুবিধা হবে, এরূপ আশা কর কি?

সেই পুরুষটি উদাসভাবে উত্তর করিল,—"কৈ, আর সেরূপ আশা করতে পারি?"

তারা।—কেন?"

পুরুষ।—পূর্ব্ববারের তদন্তে যারা যেরূপ প্রমাণ দিয়েছে, এবারও সেইরূপই প্রমাণ দেবে।

রমণী গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কিরূপ প্রমাণ দেবে?"

পুরুষ চমকিত ভাবে কহিলেন,—"আমি কি প্রমাণ দেব? আমি কি জানি না-জানি, কেউ তা জানে না। কিন্তু আমার দ্বারা শচীন্দ্র বাবুদের মন্দ বৈ ভাল হওয়ার কথা নাই!"

রমণীর বিষণ্ণ মুখমণ্ডলে ঘৃণার ছায়া প্রতিফলিত হইল। রমণী সেই পুরুষের মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"তুমি কাপুরুষ! মাসে দশটি টাকা বৈ তো নয়! সামান্য দশটি টাকার লোভে ধর্ম্ম খোয়াইতে বসিয়াছ? সেবার আমি জানিতাম না বলিয়া তুমি লুকাইয়াছিলে। যদি জানিতাম যে, তুমি জেনে-শুনে সত্য-ঘটনা লুকাইতেছ, তা-হ'লে তোমার দ্বারা সত্য প্রমাণ দেওয়াইয়া তবে ছাড়িতাম!"

পুরুষ বিস্মিত ও চমকিত হইল; কহিল,—"ধৰ্ম্ম খোয়াইয়া মনিবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বল? তোমার ভাব যে কিছুই বুঝ্‌তে পারি না!"

রমণী উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিল,—"কে মনিব। সেই পাষণ্ড নরঘাতী দুরাচার রসময়? যার নাম করিলে—যার ছায়া মাড়াইলে পাপ হয়, তারই ভাল করিতে গিয়া, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্ম্মশীল রামচন্দ্রের ন্যায় পিতৃভক্ত ভাই দুটির সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? পেটের দায়ে নীচ কার্য্য করিতেছ; কিন্তু মনে করিয়া দেখ,—তুমি কেমন লোকের সন্তান! আমার শ্বশুরের ধর্ম্ম-বল ছিল, সাহস ছিল। এক দারিদ্র্য-দোষে কি তুমি সব খোয়াইলে? কতদিন তোমায় বলিয়াছি—চল, এ গ্রাম ছাড়িয়া বিদেশে যাই; বিদেশে ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, সেও বরং ভাল; তবু এখানে থাকিয়া নীচ কার্য্য করিয়া শ্বশুরের মুখ ছোট করিতে নাই; কিন্তু তুমি শুনিলে না!"

পুরুষ অবনত মস্তকে নীরব রহিল, কোনও উত্তর করিল না। পাঠকগণকে বলা আবশ্যক যে, আগন্তুক পুরুষটি রসময় দাসের প্রিয় কর্ম্মচারী জীবন হালদার।

জীবনকে নীরব দেখিয়া, শরতের উষাকালীন নীলাকাশের ন্যায়, তারার গণ্ডস্থল ঈষৎ লোহিত রাগে রঞ্জিত হইল। আপন দক্ষিণ হস্তে মস্তকের খর্ব্ব কেশরাশি নাড়াচাড়া করিতে

করিতে তারা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—"শোন তবে; অনেক কাল বুকে আগুন চাপিয়া রাখিয়াছি। রাবণের চিতার ন্যায় সে আগুন বুকের ভিতর দিন রাত্রি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। বুক চিরিয়া সে আগুন আজ তোমাকে দেখাইব।"

জীবনচন্দ্র চকিত ও ভীত হইল। তারা আবার বলিতে লাগিল,—"তুমি জান যে, এ গাঁয়ে আমার চুলের ন্যায় দীর্ঘ চুল কাহারও ছিল না। আমার সমবয়সীরা আমার চুল দেখিয়া বলিত যে, এমন সুচিক্কণ কোঁকড়ান চুল বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রী-জাতি বসন-ভূষণের মায়া ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু চুলের মায়া সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। চুল স্ত্রী-জাতির প্রধান শোভা। বড় দুঃখে, বড় ক্ষোভে, আমি সে শোভা আপন হাতে নষ্ট করিয়াছি।"

তারার চোখে অশ্রু সঞ্চারিত হইল। চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে তারা কহিল,—"কেন করিয়াছি জান?"

জীবন পূর্ব্ববৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত। তাহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। জীবন চকিতে একবার তারার মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—নয়ন যেন ক্রমে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে—গণ্ডস্থলে প্রতিফলিত সেই লোহিতাভা যেন ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে। জীবন আর অধিকক্ষণ সে মুখের প্রতি দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিতে পারিল না।

তারা বলিতে লাগিল,—"এক সময় অভাগিনীর রূপের বড় খ্যাতি ছিল। দরিদ্রের স্ত্রী আমি—আমার আবার রূপ কেন? বিধাতা দরিদ্রকে কেন রূপ দেন, বলিতে পারি না। আমি ইচ্ছা করিয়া সে রূপ নষ্ট করিবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করিয়াছি। আমি তেল মাখা বন্ধ করিয়াছি, পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি; আমার হাসি-গল্প বন্ধ হয়েছে, রূপের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। স্বামীর ভালবাসা দৃঢ় করিবার জন্য, স্ত্রীজাতি রূপ বাড়াইতে কত না চেষ্টা করে; কিন্তু আমি সাধ করিয়া সে রূপে কালিমা মাখিয়া রাখিয়াছি। কেন তা করিয়াছি, জান?"

এই বলিয়া তারা, জীবনের মুখপানে এক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। জীবন পূর্ব্ববৎ বিস্মিত ও নিস্তব্ধ। তারা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল,—"আমার এত সাধের রূপনাশের মূল—সেই পাপাত্মা রসময়। সেই নরাধম, তাহার নায়েবের দ্বারা বলপূর্ব্বক আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, আমার সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সতীর ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-রক্ষা করিয়াছিলেন; তাই আজ তোমার মুখপানে নিঃসঙ্কোচে চাহিতে পারিতেছি; নতুবা কোন্ দিন নরকে ডুবিতাম। দত্তদের মেজবাবু সেদিন এই অভাগিনীর ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য অগ্রসর না হইলে, আজ আমার কি দশা হইত! ভগবান্ মেজবাবুর সুমতি দিয়াছিলেন, তাই এখনও আমি তোমার

স্ত্রী। জানি-না, কোন্ সূত্রে মেজবাবু সেই নরাধমের পাপ যড়-যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন! তখন তুমি, সেই নরাধমের কার্য্যেই স্থানান্তরে ছিলে।”

জীবন অধিকতর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। ক্ষণেক পরে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—“এত কাল কেন আমায় তা বল নাই, তারা? আর সেই দুর্ঘটনার পর যখন বাড়ী আসিলাম, তখনই বা তা বল নাই কেন?”

তারা।—বলি নাই, তোমার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া। তুমি দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন, প্রতিশোধ লইবার সামর্থ্য তোমার নাই। বলিলে, তোমার মনে দারুণ যাতনা হইত। প্রতিহিংসা লইতে অক্ষম ভাবিয়া, তোমার আপনার প্রতি ধিক্কার জন্মিত। চির-কালের জন্য তোমার সুখ-শান্তি বিলুপ্ত হইত। একদিনের জন্যও তুমি নিশ্চিন্ত মনে গৃহ-কর্ম্ম করিতে পারিতে না। প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার মনে হইত,—আবার কখন সেই পাপিষ্ঠ আমার সর্ব্বনাশ করে। গৃহবাস তোমার জেলখানাবাস হইয়া দাঁড়াইত।

জীবন ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল,—“এত দিন না বলিয়া কি ভাল করিয়াছ—তারা?”

তারা।—না বলিবার আরও এক কারণ ছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম, এ সংবাদ তোমার কাণে উঠিলে, তুমি রাগের মাথায় হয় তো কি একটা অনর্থ ঘটাইয়া বসিবে। তাহাতে

আমাদের নিজেরই বিপদ ঘটিত, সে নরাধমের কিছুই হইত না। আমরা দরিদ্র, সহায় নাই, সম্পৎ নাই; তাই বলি নাই। আজ যে বলিতেছি, তাহার কারণ এই—যিনি আমার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছ বলিয়া। আমি জানিয়াছি যে, সেই ঘটনার রাত্রে তুমিও সেই পাপিষ্ঠের সঙ্গে দত্তদের গৃহে উপস্থিত ছিলে। বুড়ো কর্ত্তাকে কে খুন করিয়াছে, তাহা তুমি সবিশেষ জান। তাই তোমায় বলিতেছি—সত্য বলিতে ভয় করিও না। যাহা জান, সত্য বলিও; তাহাতে মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হইবে না।

জীবনের মনে তুমুল তুফান উঠিল। জীবন অনুশোচনার তীব্রতাও কতকটা উপলব্ধি করিতে লাগিল। সেই দিন হইতে সত্য কহিতে তাহার মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জন্মিল।

জীবন উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিল,—"তারা, তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আর আমি মিথ্যা বলিব না, পাপিষ্ঠ রসময়ের ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটুক।"

এই বলিয়া জীবনচন্দ্র আপন মনে কি চিন্তা করিতে লাগিল।

... ...

যথাসময়ে আদালত-গৃহে জীবনচন্দ্র সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল। শচীন্দ্রলাল মুক্তি পাইলেন। হত্যাকারীর প্রতি দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ হইল।

বড়দিনের উপহার

-:*:-

(১)

ঘরের মধ্যে জানালার কাছে পরদার আড়ালে অন্ধকারে যে লোকটা লুকাইয়া ছিল, সে এই তৃতীয় বার উৎকণ্ঠিতভাবে ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সময় যে এত ধীরে ধীরে যায়, তাহার নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। পাঁচ মিনিটও হইয়াছে কিনা সন্দেহ, সে অতি কষ্টে জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিস্তব্ধ কক্ষে লুকাইয়া রহিয়াছে; কিন্তু পাঁচ মিনিট সময়ই তাহার নিকট যেন অনন্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

চিরাভ্যস্ত পাপীর ন্যায় তাহার স্থৈর্য্য ছিল না। তাহার বয়স প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর। জীবনের মধ্যে সে এই প্রথম স্বদেশের আইনের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়াছে। তাহার ঠোঁট দুটি শুকাইয়া গিয়াছে এবং নিশ্বাস একটু ধীরে ধীরে পড়িতেছে। ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, তাহার সঙ্কল্প বড় ভয়ানক। তাহার রিভলভারে একজন মানুষের বুঝি দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।

কক্ষটি বেশ বড় ও সুন্দররূপে সজ্জিত। দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর চিত্র বিলম্বিত রহিয়াছে। অগ্ন্যাধারের উপর সুনির্ব্বাচিত ছোট ছোট প্রতিমূর্ত্তি ঝক ঝক করিতেছে। মেজের উপর একটি কোমল বহুমূল্য গালিচা বিস্তৃত রহিয়াছে। এতদ্রূপ আরও নানা রকমের দ্রব্য-সামগ্রী গৃহ-মধ্যে যথাযথ বিন্যস্ত হইয়াছে।

কক্ষের এক কোণে কাল আবলুস-কাঠ নির্ম্মিত একটি টেবিল রহিয়াছে। কতকগুলি কাগজ, নীলকাচের 'ডোম'-বিশিষ্ট একটি ল্যাম্প, একটি স্ত্রীলোকের ফটো ও ফুলদানিতে একটি গোলাপ ফুলের তোড়া— টেবিলটির শোভা-বর্দ্ধন করিতেছে।

জন্ উইলিস্ নিজের পকেটে হস্ত প্রদান করিল। তাহার অঙ্গুলিগুলি রিভলভারের পশ্চাদ্ভাগে স্পর্শ করিল। যে ব্যক্তিকে হত্যা করিবার নিমিত্ত সে এখানে আসিয়াছিল, তাহার প্রতি তাহার হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র ছিল না। তাড়াতাড়ি কাজটি শেষ করিবার নিমিত্ত, মুখোমুখী দুই একটি কথা বলিয়া এবং তৎপরেই গুলি করিবার নিমিত্ত, তাহার একমাত্র প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল। অন্য লোকে ইহাকে হত্যা বলিতে পারে; কিন্তু সে ভালরূপই বুঝিয়া লইয়াছিল যে, ইহা প্রকৃত ন্যায়-বিচার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঘড়ি টিক্ টিক্ করিতেছিল। সহসা কক্ষের প্রান্তস্থিত অগ্ন্যাধারে একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড উপর হইতে পড়িয়া গেল।

তার পর, দূরাগত একটি শব্দ শ্রুত হইল ;—যেন বাটীর কোনও দ্বার উন্মুক্ত ও তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। পদশব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। লোকটীর সর্ব্বাঙ্গ শক্ত হইয়া উঠিল। সে তাহার লুকাইবার স্থান পরিত্যাগ করিয়া কক্ষ-মধ্যে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যিনি প্রবেশ করিলেন, তিনি একজন দীর্ঘকায়া সুন্দরী রমণী। তিনি সান্ধ্য-সাজে সজ্জিত। তাঁহার গলদেশে হীরার মালা, ক্লোকের শুভ্র লেসে অল্পমাত্র আবৃত। লোকটি পুনরায় তাহার লুকাইবার স্থানে প্রস্থান করিত, কিন্তু সে সময় আর ছিল না।

স্ত্রীলোকটি তাহাকে দেখিয়াই থামিলেন এবং কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি চান?"

লোকটি উত্তর করিল,—"আমি আপনার স্বামীর সহিত দুই একটা কথা কহিতে চাই।"

রমণী পুনরায় বলিলেন,—"আমার স্বামীর সঙ্গে? কিন্তু তিনি তো বলিয়াছিলেন যে, সেক্রেটারী ভিন্ন অপর কাহারও অদ্য রাত্রিতে আসিবার কথা নাই! তিনি কি জানেন যে, আপনি এখানে আছেন?"

লোকটী উত্তর করিল,—"না।"

সুন্দরী ল্যাম্প উজ্জ্বল করিয়া দিয়া লোকটিকে আরও ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। লোকটি দীর্ঘ ও কৃশ। যদিও তাহার বদনমণ্ডল অপরাধীর স্থায় ছিল না, তথাপি তাহার হাবভাব ও উত্তর-প্রদানে অস্থিরতা দর্শনে রমণী ভীতা হইলেন।

তিনি দ্রুতপদে ঘণ্টার দিকে যাইতেছিলেন ;—এমন সময় লোকটি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"আপনি ও ঘণ্টাটি বাজাইতে পাইবেন না! আপনার স্বামীকে আমার কতকগুলি কথা বলিবার আছে। তিনি যদি জানিতে পারেন যে, আমি এখানে আছি, তাহা হইলে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। আমি আপনাকে আমার কার্য্যে বাধা দিতে দিব না।"

রমণী মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখপানে চাহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কিরূপে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন।"

লোকটি বিকট স্বরে কহিল,—"জানালার মধ্য দিয়া।"

রমণী চীৎকার করিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু লোকটার হস্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

লোকটি বলিল,—"আমি আপনাকে ঐ ঘণ্টাটি বাজাইতে দিব না। আর যদি আপনি চীৎকার করেন, তাহা হইলে বুঝিতেই পারিতেছেন—কি হইবে! আপনার স্বামী পার্শ্বের

ঘরে আছেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে দৌড়াইয়া আসিবেন। তিনি দরজা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আমি তাঁহার বক্ষদেশে গুলি নিক্ষেপ করিব। বুঝুন—যদি চীৎকার করেন, তবে আপনিই আপনার স্বামীর প্রাণহন্ত্রী হইবেন।"

লোকটি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। রমণী পাণ্ডুবদনে ভীতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

লোকটির কথাগুলি বিফলে যায় নাই। রমণী চীৎকার করিতে বা আর কোনরূপে সংবাদ প্রচার করিতে চেষ্টা করিল না।

লোকটি বলিল,—"আপনি এই চেয়ারখানিতে বসুন এবং নিস্তব্ধ থাকুন। আপনি আসিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া, আমি বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু যখন আসিয়াছেন, তখন যাইতে দিব না।"

রমণী একটু আশান্বিতা হইলেন যে, লোকটির চেহারা বদমাইসের মত নহে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার স্বামীকে আপনার কিসের আবশ্যক ?"

লোকটি একটু হাসিল। হাসিটুকু বিকট ও শুষ্ক। তার পর বলিল,—"একটু ন্যায়-বিচারের কাজ করিতে। তবে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আপনি এখানে উপস্থিত থাকিবেন—বিশেষ তিনি যখন আপনার স্বামী। আপনার পক্ষে তাঁহার পদশব্দ শুনিয়াই জানালার নিকট যাওয়া ভাল।"

রমণী বড়ই ভীত হইলেন, লোকটির মুখ দেখিয়া তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"আপনি হত্যা করিতে আসিয়াছেন ?"

লোকটি অট্টহাস্য করিয়া উঠিল এবং বলিল,—"আমি আপনার স্বামীর জীবনান্ত করিতে আসিয়াছি—তাহা হত্যা বলিয়া গণ্য হইলেও হইতে পারে !"

রমণী ভয়ে উইঙ্কেলের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া বলিলেন,—"আপনি পাগল হইয়াছেন ! আপনি জানেন, হত্যাকারীদের কি শাস্তি ? আপনার ফাঁসী হইবে।"

লোকটি বলিল,—"বোধ হয়, নয় ! নীচে আমার বন্ধুগণ আমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। আমি পলাইতে চেষ্টা করিব। যদি না পারি, তবে নিজে গুলির দ্বারা আত্মহত্যা করিয়া ভিক্ষুকের মত নিশ্চিন্তে প্রাণত্যাগ করিব।"

লোকটি দরজার দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল।

রমণী একমনে কথাগুলি শুনিলেন। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই চীৎকার করিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহার স্বর যেন বন্ধ হইয়া গেল। লোকটি একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিল ; তিনি চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু স্বর যেন বাহির হইল না।

লোকটি ধীরভাবে বলিল,—"চীৎকার করিতে চেষ্টা করা বৃথা। তাঁহার আসিতে বোধ হয় বিশেষ বিলম্ব নাই।"

স্ত্রীলোকটি ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"আপনি কেন তাঁহাকে হত্যা করিতে চান ?"

লোকটি রূঢ়ভাবে বলিল,—"কারণ, তিনি ফিলিপ ষ্যাঙ্গস কোটিপতি ; আর আমি জন্ উইল্কিন্স ভিক্ষুক।"

স্ত্রীলোকটির সাহস যেন পুনরায় ফিরিয়া আসিল। তাঁহার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইল। তিনি আরও একটু সোজা হইয়া বসিলেন ও বলিলেন,—"আপনি তো মহা ভীরু ! আমার স্বামী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন, আর আপনি তাহা পারেন নাই ! তাই বলিয়া, চোরের ন্যায় আসিয়া, সম্পূর্ণ অসতর্কাবস্থায়, তাঁহাকে হত্যা করিবেন ? কথনই হইবে না। আমি মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইব,—যদি মারিতে চান, আগে আমাকে মারিবেন।"

লোকে বালকের কথা যেমন শোনে, উইল্কিন্সও ঠিক সেইভাবে তাঁহার কথাগুলি শুনিল, এবং বলিল,—"যদি জীবনকে আপনি এত তুচ্ছ মনে করেন, তবে ইচ্ছা করিলে তাহা বিপন্ন করিতে পারেন ; কিন্তু তথাপি আপনার স্বামীকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমার রিভলভারে ছয়টি কুটরী আছে এবং ইহা সযত্নে ঠাসা হইয়াছে।"

রমণী নিরাশ হইলেন। তিনি উৎকর্ণ হইয়া সেই চির-পরিচিত পদধ্বনি শুনিতে চেষ্টা করিলেন ; তাঁহার স্বামীর আসিতে আর কয়েক মিনিটের অধিক বিলম্ব নাই ! ঘড়ীর টিক্

টিক্ শব্দ ভিন্ন অন্য কিছুই গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নাই। তাঁহার মাথায় এক অদ্ভুত খেয়ালের উদয় হইল।

তিনি বলিলেন,—"আপনি টাকা চান? নিশ্চয় আপনি টাকাই চান। এই লউন, আমার হীরার হার। ইহা অতিশয় মূল্যবান—সত্যই মূল্যবান—ইহা দ্বারা আপনি ধনী হইতে পারিবেন।"

তাঁহার হস্তদ্বয় গলদেশে উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু লোকটীর ঘৃণাব্যঞ্জক সঙ্কেতে তাহা প্রতিনিবৃত্ত হইল।

লোকটি বলিল,—"আপনি আমার প্রতি বড় অবিচার করিতেছেন। আমি টাকা কিম্বা আপনার হীরার হার কিছুই চাই না। আমি চাই—আপনার স্বামীর জীবন! যদিও ভয়ানক কথা, তথাপি শুনিয়া রাখুন যে, দেশে শত শত স্ত্রী-পুরুষ আছে—যাহারা কল্য প্রাতে ফিলিপ য়্যাঙ্গসের মৃত্যু-সংবাদে অধিকতর নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনযাপন করিবে।"

রমণী ধীরে ধীরে বলিলেন,—"এ মিথ্যা কথা।"

লোকটির মুখ রক্তবর্ণ হইল। সে একটু তীব্রস্বরে বলিল,—"ইহা ধ্রুব সত্য। আপনার স্বামী কোটিপতির নামে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছেন। তিনি বিস্তর ধন-সঞ্চয় করিয়াছেন; আপনি জানেন,—কেমন করিয়া? শুনুন, আমি আপনাকে বলিতেছি। মিথ্যা কথা বলিয়া, প্রতারণা করিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া,

তিনি এই ধন সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি যে সকল শ্রমজীবী ব্যক্তিগণের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছেন, তাহাদেরই উদ্বৃত্ত অর্থে আপন ধনাগার পূর্ণ করিয়াছেন।"

এইবার রমণীর পাণ্ডুবদনের উপর দিয়া যেন ক্রোধের ছায়া চলিয়া গেল। তিনি কহিলেন,—"না, এ কখনই সত্য নয়, কখনই নয়!"

লোকটির দীর্ঘ ও কৃশ দেহ স্ফীত হইতে লাগিল। সে বলিল—"সুন্দরি, ইহা ধ্রুব সত্য! আপনার স্বামীর সুখ্যাতির পক্ষে কি আবার আমাকে বলিতে হইবে? দেশে কি সংবাদপত্র নাই? আপনি যেখানে যান, তথাকার বায়ু কি এর প্রতিধ্বনি আপনার কর্ণে পৌঁছায় না? আপনি আমার দিকে স্থির দৃষ্টি করিয়া, এ সকলের কিছুই জানেন না—এরূপ ভাণ করিতে পারেন? আপনার দেহে ধর্ম্মতঃ উপার্জ্জিত একখানিও হীরক নাই। আমার সে চিন্তা করিতে সাহস হয় না;—তবে বোধ হয় আপনাকেও আমার হত্যা করা কর্ত্তব্য।"

রমণী পুনরায় দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার আসায় অনেকক্ষণ বিলম্ব হইতেছে—ইহা ভাল কি মন্দের লক্ষণ?

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"তাহা হইলে আমাকে গুলি করুন। আমি ভীতা নহি।"

লোকটি মাথা নাড়িল এবং বলিল,—"না, আমার সহিত

আপনার কোনও বিবাদ নাই। আমি আপনার স্বামীকেই শেষ পাপ হইতে উদ্ধার করিতে যাইতেছি,—ঐ কাগজগুলি সহি করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে হত্যা করিতেছি।"

স্ত্রীলোকটি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ কাগজগুলি?"

লোকটি বলিল,—"সে সকল আপনি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না; এই মাত্র শুনিয়া রাখুন যে, যে সকল গর্হিত অনুষ্ঠানে আপনার দেহ [illegible] সুশোভিত হইতেছে, এবং যাহা দ্বারা ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে, ইহা তাহারই একজনের মুখপত্র।" সে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষুদ্বয় নত করিল। রমণীর চক্ষুদুটি একদৃষ্টে তাহার মুখের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি লোকটির [illegible] চিহ্ন অন্বেষণ করিতেছিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি ব্রিজপোর্ট মিল খরিদের কথা বলিতেছেন?"

লোকটি বলিল—"হাঁ। তাহা হইলে আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন, দেখিতেছি।"

স্ত্রীলোকটি বলিলেন,—হাঁ—হাঁ,—আমি কিছু কিছু জানি। আপনার সহিত ব্রিজপোর্ট মিলের কি সম্বন্ধ।"

লোকটির সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। সে কঠোর স্বরে তাড়াতাড়ি বলিল,—"তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ? উপরে ঈশ্বর জানেন! জানেন না কি

যে, উহা আমারই মিল! আমি জন উইল্কিন্স। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, সৈনিক বৃত্তি হইতে উদ্বৃত্ত ২০০ পাউণ্ড অর্থ সঙ্গে লইয়া আমি ব্রিজপোর্ট গিয়াছিলাম। আমি সৎপথে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলাম। শত শত ব্যক্তিকে কর্ম্ম দিয়াছিলাম। তাহারাও আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। আমি যখন ব্রিজপোর্ট গিয়াছিলাম, তখন উহা একটি সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল। আমিই উহাকে উন্নতিশীল নগরে পরিণত করিয়াছি। আমার কার্য্য—দেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল; আমার কর্ম্মচারিগণ উত্তম বেতন পাইত। আমি উন্নতিশীল, ধার্ম্মিক এবং মাননীয় ব্যক্তি ছিলাম। তার পর, আপনার স্বামী কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা দিলেন। যে উপায়ে মানুষে ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ আপনার জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি সাধনে সাহায্য করিতে পারে, তাহার কিছুই তিনি জানেন । তিনি রক্তপিপাসু জলোকার ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কাছে অর্থই সকলের রক্ত। একে একে তিনি আমার সমব্যবসায়ীদিগের সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইলেন। আমার অর্থও ছিল এবং ব্যবসায়ে লাভও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আপনার স্বামী যে সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহাতে সব বিচ্ছিন্ন হইল। এখন সর্ব্বস্ব গিয়াছে। আমার 'মিল' এই সপ্তাহের শেষে বন্ধ হইবে। তার পর যতদিন না তিনি কার্য্যারম্ভ করেন, ততদিন উহা বন্ধ থাকিবে। আপনি ঠিক

বলিয়াছেন, আপনার স্বামী সৌভাগ্যবান্, আর আমি দুর্ভাগ্য! তবে নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাকে কিছু মূল্য প্রদান করিতে হইবে।"

লোকটি কিছুক্ষণ নিস্পন্দ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

রমণী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি তিনি ঐ কাগজ সহি না করেন, তাহা হইলে?"

লোকটা বলিল,—"তিনি কখনই সহি করিতে পাইবেন না।"

স্ত্রীলোকটি বলিলেন,—"ওঃ! আপনি সে কথা মনে করিবেন না। সে বড় ভয়ানক! কিন্তু তাহাতে আপনারই বা লাভ কি? যদি আপনি তাঁহাকে হত্যা করেন, তথাপি এই কার্য্য যাহা হইবার—তাহাই হইবে। তাঁহার অবর্ত্তমানে অপর কেহ তাঁহার স্থান অধিকার করিবে। কাগজগুলি সহি হইবেই; তাঁহার দ্বারা না হইলে, অপরের দ্বারা হইবে। তবে আমাকে কয়েক মিনিট অবসর দিন,—তাঁহার সহিত কতকগুলি কথা বলিতে দিন। তাঁর উপর আমার কিছু ক্ষমতা আছে; অনেক সময় তিনি আমার ইচ্ছামত কাজ করেন। আমি তাঁহার সহিত তর্ক করিব।"

লোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল,—"অনেকে ফিলিপ ম্যাঙ্গসের সহিত তর্ক করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু কোনই ফল হয় নাই।"

স্ত্রীলোকটি বলিলেন,—"কিন্তু আমি তাঁহার স্ত্রী। জগতের অন্য কোনও লোক অপেক্ষা তাঁহার উপর আমার শক্তি অধিক। আমাকে দশ, পাঁচ বা অন্ততঃ তিন মিনিট সময় দিন।"

লোকটি হাসিয়া বলিল,—"তিন মিনিট!—ফিলিপ য়্যাঙ্গসের সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতে!"

রমণী তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া করুণস্বরে বলিলেন,—"আমি তাঁহার স্ত্রী। আমাকে একটু চেষ্টা করিতে দিন,—একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দিন। দুই চার মিনিটে আপনার বিশেষ কোনও ক্ষতি হইবে না! আপনি যদি ঐ পরদার আড়ালে দাঁড়ান, তাহা হইলে তিনি আপনাকে দেখিতে পাইবেন না। তিনি প্রায় অন্ধ।"

রমণী অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই অস্ফুট করুণাব্যঞ্জক শব্দ মুখ হইতে বাহির হইল। তিনি লোকটিকে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"তিনি আসিতেছেন; আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন। নিশ্চয়ই দিতে হইবে—নিশ্চয়ই!"

লোকটি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মুখে দুর্ব্বলতার কোনও চিহ্ন ছিল না; কেবলমাত্র চিন্তার রেখা অঙ্কিত ছিল। অবশেষে সে বলিল,—"ঐ ঘড়ী দেখুন। যেই ঘড়ী বাজিবে, অমনি আপনার স্বামীও গতায়ু হইবেন। যে পর্য্যন্ত না ঘড়ী বাজে, সে পর্য্যন্ত আপনাদের কার কি বলিবার আছে, শুনিব। ব্যস!"

লোকটি ধীরে ধীরে পরদার আড়ালে গিয়া লুকাইল। আগন্তুকের পদশব্দ বেশ স্পষ্ট শুনা গেল। রমণী একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত দ্বারদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"এই কয়েক

মার্গারেট একটু কাঁপিয়া উঠিলেন।

মার্গারেট।—"ফিলিপ! আমি আর উপহার চাই না। আমি অপেরা দেখ্‌তে যাচ্ছিলাম বটে; কিন্তু আমার মন বদ্‌লে গেছে। আমার সামান্য মাথা ধরেছে। আমি আজ আর যাব না; তার বদলে আজ তোমার সঙ্গে গল্প কর্‌ব।"

'সঙ্কল্প অতি উত্তম' বলিয়া ফিলিপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কহিলেন,—"বা! তা তো বেশ! আচ্ছা আমি এই কাগজগুলি সহি করিয়াই তোমার সঙ্গে বেশ করিয়া গল্প আরম্ভ করি।"

ফিলিপ কলম তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে সহি করিবেন, সেই স্থানটি চাপিয়া ধরিয়া মার্গারেট কহিলেন,—"আমি এই কাগজগুলি সম্বন্ধেই তোমাকে কিছু বলিতে চাই। তুমি ঐগুলি সহি করিও না।"

ফিলিপ।—"সহি কর্‌ব না? কেন—এ কথার মানে কি?"

মার্গারেট কাগজের সাদা জায়গাটী হস্তদ্বারা দৃঢ়ভাবে চাপিয়া রাখিয়া কহিলেন,—"ফিলিপ! তোমার বোধ হয় মনে আছে, যখন আপিস হইতে এইগুলি আসিয়াছিল, তখন এগুলি আমিই তোমায় পড়িয়া শুনাইয়া ছিলাম। তদবধি এইগুলির বিষয় আমি চিন্তা করিতেছি। তুমি সাত হাজার পাউণ্ড না এই রকম কত—লোকটির যা দেনা আছে তাই দিয়ে, এই সমস্ত কলকারখানা কিনিয়া লইতেছ!—নয়?"

ফিলিপ মাথা নোয়াইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ও বলিলেন,—"হাঁ। তা কি ?"

"ও গুলোর দাম কত।"

"তা প্রায় ১,৫০,০০০ পাউণ্ড হইবে !"

মার্গারেট একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভীতভাবে পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমদর্শন ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—অথবা ইহা তাঁহার কল্পনা মাত্র।

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার মনে হয়, এই লোকেরা—এই ব্রিজপোর্টের লোকেরা—তোমার হাতের মধ্যে নয় ? তাহারা তোমার বিরুদ্ধে থাকিলে কাজ চালাইতে পারিবে না। হয়, তাহাদের মিল বিক্রয় করিতে হইবে, নয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।"

ফিলিপ সম্মতি-সূচক মস্তকান্দোলন করিয়া কহিলেন,—"ফলতঃ, এই কাজটি এরূপভাবে দেখা শুনা হইয়াছে যে, তাহারা অন্যথাচরণ করিবার কোনও সুবিধার লেশ মাত্র পাইবে না।"

মার্গারেট।—"কিন্তু ফিলিপ, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তারা সবাই কিছু ধার্ম্মিক লোক নয় ? যাহারা এই কারখানা তৈয়ার করিয়াছিল, তোমার ব্যবস্থা যদি তাহাদের মনোমত না হয়, তাহ'লে তোমার ব্যবস্থা অস্বীকার কর্‌বার তাদের স্বত্ব আছে।"

"স্বত্ব!—স্বত্ব ছিল বটে; কিন্তু এখন তারা দায়ে পড়েছে।"

"আচ্ছা বল দেখি, ফিলিপ—এ কাজটা কি ন্যায়সঙ্গত?"

ফিলিপের ললাট কুঞ্চিত হইল। তাঁহার স্বর রুক্ষভাব ধারণ করিল। তিনি বলিলেন,—"ন্যায়সঙ্গত! তুমি কি বল্‌ছ—মার্গারেট? ন্যায়সঙ্গত!—আমি তোমার কথার মানে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

মার্গারেট কাগজগুলি তুলিয়া ধরিলেন। তাহার পর মধ্যখানে রাখিয়া বলিলেন,—"আমি এক লোকটির বিষয় ভাব্‌ছিলাম,—এর এতে যার নাম লেখা রয়েছে—[illegible]। [illegible] সৌভাগ্য-সাধনের জন্য এই [illegible] হচ্ছে। আমি ঐ ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্রের কথা ভাব্‌ছি। এটা করা কি ভাল? আমাদের আর টাকার প্রয়োজন কি?"

লোকে বালকের পানে যেমন ভাবে চায়, পত্নীর প্রতি ফিলিপ ঠিক সেইভাবে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন,—"মার্গারেট! টাকার দরকার সকলেরই আছে এবং অনেক টাকা যত পাওয়া যায়, অভাবও ততই বেড়ে যায়। আমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে আবার কথা কহিব! হ্যারিসন অদ্য রাত্রেই এই কাগজ-গুলি চায়।"

ফিলিপ চেয়ার সমেত একটু ঘুরিয়া বসিলেন। পুনরায় কলম উঠাইলেন এবং তাহা কালিতে ডুবাইলেন। মার্গারেট নিজ হস্তদ্বয়

তাঁহার হাতের উপর দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত করিলেন। তিনি পশ্চাদ্ভাগে ছায়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; মনে হইল,—তাহা [illegible] অগ্রসর হইতেছে। মার্গারেট ভয় পাইলেন ও বলিয়া উঠিলেন,—"ফিলিপ! ফিলিপ! তুমি সহি কর' না। আমার ইচ্ছা নয় যে, তুমি সহি কর।"

ফিলিপ এই প্রথম বার স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন প্রদর্শন করি-[লেন] [illegible] হইয়াছে।—কাগজগুলি সহি করিতেই হইবে [illegible] মাপাও।"

মার্গারেট কাতরভাবে বলিলেন,—"ফিলিপ! অমন কাজ ক'র না। মনে কর, এটা আমার একটা খেয়াল! আমাদের [illegible]। উকিলকে ডাকাইয়া তাহার কল ছাড়িয়া দাও, অথবা [illegible] যথার্থ মূল্য প্রদান কর।"

ফিলিপ ধীরে ধীরে তাহার স্ত্রীর কেশপাশ চাপড়াইয়া বলিলেন,—"প্রিয়ে! তুমি ব্যবসায়ের কিছুই জান না। বিক্রেতাকে যত কম দাম লওয়াইতে পার, তাহাই যথার্থ মূল্য। সামগ্রীর আসল মূল্যের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধই নাই—সে কথাই আলাহিদা।"

মার্গারেট প্রথমে ঘড়ীর দিকে পরে ঘরের পশ্চাদ্দিকে তাকাইলেন। তাঁহার সকল কথা ব্যর্থ হইল দেখিয়া, তিনি পাগলের মত হইলেন; তিনি বলিলেন,—"ফিলিপ! তুমি ভুল করিয়াছ। দেখ, আমি সর্ব্বদা আব্দার করিয়া তোমায় বিরক্ত

করি না। আমি এখন এই ভিক্ষা করিতেছি—তুমি আমার কথা শুন। দেখ, আমি নতজানু হইয়া ভিক্ষা চাহিতেছি। আমি এই লোকটির স্ত্রী-পুত্রদের কথা ভাবিতেছি। তুমি যদি আমার কথা না শুন; তবে তোমার প্রদত্ত এই সব হীরকখণ্ডগুলি তাহাদের অশ্রুজল বলিয়া বোধ হইবে। কখনই এ সকল পরিতে পারিব না; এ সকল জিনিষে আমার ঘৃণা জন্মিয়া যাইবে। ভেবে দেখ—ফিলিপ, তুমি যদি এক ব্যক্তি—জন উইল্কিন্স হইতে, আর আমি তোমার স্ত্রী, ভেবে দেখ, যদি আমাদিগকে কপর্দ্দকহীন হয়ে আবার জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হ'ত, তা হ'লে আমাদের কত কষ্ট হ'ত!"

ফিলিপ একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"দেখ প্রিয়তমে! তোমার তুষ্টির জন্য বল্‌ছি না; আমি তোমায় নিশ্চয় কোরে বল্‌তে পারি যে, আমি কখনই আমাকে এ অবস্থায় ফেল্‌তাম না।"

মার্গারেট।—"তা তুমি বল্‌তে পার না। তুমি কি ভেবে দেখ নি যে, আমরা—তুমি ও আমি—সময়ে সময়ে জীবনকে বড় অধিক সুখকর ও সরল বলে মনে করি! কিন্তু এ জীবন বড় রহস্যময়। কখন কি হয়, কিছুই বলা যায় না। আমাদের যদি আজ রাত্রে মর্‌তে হয়,—ফিলিপ তোমাকে কিম্বা আমাকে—তোমার কি মনে হবে যে, ঐ কাগজগুলি সহি করিয়াও তোমার হস্ত অকলঙ্কিত আছে।"

ফিলিপ।—"কেন নয়? আমাদের উচিত, আমরা নিজের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি।"

মার্গারেট।—"আর অপরের জন্য—ফিলিপ?"

ফিলিপ একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন,—যেন অতি কষ্টে আপনার অসহিষ্ণুতাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেছেন।

ফিলিপ কহিলেন,—"দেখ মার্গারেট, যাদের অত বুজরুকি আছে, তারা শীঘ্রই অধঃপাতে যায়। তুমি যে সব বিষয় কিছুই বুঝ না, তাই নিয়ে তর্ক ক'রছ। ব্যবসা একটা মহা যুদ্ধ, আর এর মহাস্ত্র হচ্ছে—মাথা আর উপ বুক্ত অবসর। যে ব্যক্তি এই উভয়ের ব্যবহার না করে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসার নিয়ম সকলেই বেশ ভাল করে বুঝে নেয়, আর উভয় পক্ষেই আপন আপন চক্ষু খুলে কাজ করে। কারও কিছু দয়া করা বা চাওয়া এর মধ্যে নাই। ব্যবসার সঙ্গে দয়া-দাক্ষিণ্য সংমিশ্রণ করিতে গেলে, পতন অবশ্যম্ভাবী। কাজ হাঁসিল ক'রবার সময়ে যে পশ্চাৎপদ হয়, তার কিছুতেই মঙ্গল নাই। যোগ্য ব্যক্তিরই জয় হয়; দুর্ব্বলের পরাজয় হয়। আমি তো আর কিছু নিয়মগুলি বাঁধি নাই! কিন্তু এই নিয়ম। যদি তুমি ব্যবসা কর, তোমাকে এই নিয়ম অনুসারে চল্‌তে হবে।"

ফিলিপ আবার একবার কলম উঠাইলেন।

নৈরাশ্য মার্গারেটকে মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চল করিয়া ফেলিল।

ঘড়ী বাজিতে আরম্ভ করিল। তিনি পশ্চাদ্দিকে চাহিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার মনে হইল—তিনি পদ-শব্দ শুনিতে পাইতেছেন। তিনি অদৃশ্য আগন্তুকের [illegible] আন্দোলন করিয়া আসিতে নিষেধ করিলেন। তার পর তিনি তাঁহার স্বামীকে বাহুদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করিলেন। তখন যেন তাঁহার একটু শান্তবোধ হইল।

তিনি বলিলেন,—"ফিলিপ, আমার কথা শুন। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী; চিরকাল তোমার সঙ্গে [illegible] করিয়া আসিতেছি। আমি তোমার কাছে এরূপভাবে কখনও কিছু [illegible] নাই। আমি ব্যবসার কিছু না জানিতে পারি, কিন্তু আমরা [illegible] সময়ে সময়ে সত্যকে দেখিতে পাই—তাহা যত অন্ধকারে থাকুক না কেন! আমি এখন সত্যকে দেখিতে পাইতেছি। আমার বোধ হচ্ছে, স্বর্গের দ্বার যেন উন্মুক্ত। এই সকল জিনিষ কিসের জন্য? এই সব সোণা হীরা মুক্তা—এই বিভবরাশি,—এ সব কিসের জন্য? আজ যদিও তুমি জগৎকে চালিত করিতে পার; কিন্তু কাল যে করাল কাল তোমায় গ্রাস করতে পারে! এই মুহূর্ত্তে তোমার মৃত্যু হইতে পারে, এই মুহূর্ত্তে আমারও মৃত্যু হইতে পারে; আবার আমাদের উভয়েরই মৃত্যু হইতে পারে। তখন তোমার নিয়মে কি করিবে? তখন বলবান ব্যক্তির দুর্ব্বলের উপর কি শক্তি থাকে? তখন কারও কথা

মার্গারেট।—"তোমার সম্মতি ?"

ফিলিপ হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি চিরদিনই বড়দিনের (ক্রিস্‌মাসের) উপহার নিজেই বাছিয়া লও। আমি পূর্ব্বের রীতি লঙ্ঘন করিতে পারি না।"

কাগজের টুকরাগুলি কার্পেটের উপর ফট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল। মার্গারেট নতজানু হইয়া নিরুদ্বেগের দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ফিলিপ!—"আমার বোধ হয়, তুমি তোমার ক্রিস্‌মাসের ক্ষুদ্র উপহারের প্রকৃত মূল্য জান না।"

মার্গারেট মাথা নাড়িলেন। তিনি উৎকর্ণ থাকায় গৃহমধ্যে লোকটির বহির্গমন ও জানালা বন্ধ করিবার শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন।

মার্গারেট বলিলেন—"খুব জানি। এ উপহারের আরও মূল্য আছে। ধন্য জগদীশ্বর!"

ফিলিপ নত হইয়া মার্গারেটকে চুম্বন করিলেন।

করুণার ধারা

(১)

শ্বেত-পদ্মদলে কৃষ্ণভ্রমরতুল্য ভ্রূযুগল আজ চিন্তাভারক্লিষ্ট। সম্রাট বাহাদুর-সা বিষম চিন্তান্বিত।

সম্মুখে স্বচ্ছ-সলিলা সরসী, সম্রাটের সুকান্তি বক্ষে ধারণ করিয়া, ষোড়শী সুন্দরীর ন্যায় গর্ব্বিতা এবং নববসন্তের বাত-হিল্লোলে ঈষদান্দোলিতা। বায়ু-বিচালিত কুসুম-স্তবক সম্রাটের পদতলে লুটাইয়া পড়িতেছে। নানাজাতীয় পুষ্পের সৌরভে চারিদিক আমোদিত। উদ্যান-মধ্যস্থ বাপীতটে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত বেদীর উপর বসিয়া সম্রাট চিন্তানিবিষ্ট।

বিবিধ-বেশ-বিন্যাস-বিভূষিতা বেগমেরা অদূরে পুষ্প চয়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। বিলাস-ঐশ্বর্য্য চারিদিকে হাসিয়া খেলিতেছে।

সম্রাটের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সম্রাট ভাবিতেছেন—দেশের অবস্থা। অসংখ্য আর্ত্ত-প্রজার করুণ-প্রার্থনা যেন তাঁহার প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত করিতেছে। দেশময় দারুণ হাহাকার উঠিয়াছে। হিন্দুস্থানের অসংখ্য প্রজা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। দেশের দারুণ দুর্দ্দিন।

পরপর কয়েক বৎসর দেশে ভাল ফসল হয় নাই। এ বৎসরও সূর্যদেবের খরকরতাপে সব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির অভাবে নদনদী-জলাশয় সকল শুকাইয়া মাঠ ধূধূ বালুকা-ময় হইয়াছে। তাই সম্রাট ভাবিতেছেন—"কিসে আমার প্রজাবৃন্দ আজ রক্ষা পায়!"

(২)

সুফিয়া বেগম নিকটে আসিয়া সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"জাঁহাপনা! আপনার শরীর কেন দিন দিন এত খারাপ হইয়া পড়িতেছে?"

সম্রাট নানারূপ ভাবে প্রায় একরূপ স্তব্ধ হইয়াছিলেন, সুফিয়া বেগমের সম্বোধন যেন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

সুফিয়া বেগম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার কোমল কণ্ঠস্বর যেন কিছুক্ষণ সে স্থানে ঝঙ্কৃত হইয়া রহিল। বেগম-সাহেবা আগ্রহের সহিত সম্রাটের মুখ প্রতি পলকহীন নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে সম্রাট মুখ তুলিয়া দেখিলেন—সম্মুখে অপ্সরা-সদৃশী সুফিয়া সুন্দরী। জিজ্ঞাসিলেন—"কি বলছিলে সুফিয়া?"

সুফিয়া।—জাঁহাপনাকে আজ বড়ই চিন্তিত দেখ্‌চি।

সম্রাট দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন,—"ঠিক বলেছ সুফিয়া, আজ আমি বড় চিন্তিত।"

সুফিয়া।—জাঁহাপনার শরীর দিন দিন যেন মলিন হয়ে যাচ্চে।

সম্রাট।—সুফিয়া! সমগ্র হিন্দুস্থান যে আমার জন্ম মলিন হয়েছে! আমার সাম্রাজ্যে সুখ কি?

সুফিয়া।—জাঁহাপনা তো প্রজার দুঃখ দূর করবার জন্ম ধনভাণ্ডার অবারিত করে রেখেছেন! প্রজাকে অদেয় আপনার তো কিছুই নাই!

সম্রাট।—আজ খোদার ভাণ্ডার শূন্য হয়েছে সুফিয়া! নহিলে, এই অমৃত-প্রসবিনী ভারতভূমির অসংখ্য সন্তান আজ অন্নাভাবে ও জলাভাবে রোগে শোকে প্রাণ বিসর্জন দিচ্চে কেন? আর আমি—তাদের সম্রাট হয়ে এই বিলাসের সমুদ্রে ভাসচি! ধিক আমার রাজত্বে! বোধ হয় বিধাতা আমার স্থায় দুর্বলের হাত থেকে রাজদণ্ড খসিয়ে নেবার জন্যই এ সব আমায় দেখাচ্চেন। আমার মনে হয়, আমার জীবন-বিনিময়েও যদি প্রজা রক্ষা হতো!

সম্রাট মুখ নত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

সুফিয়া।—জাঁহাপনাই তো বলে থাকেন, সবই খোদার ইচ্ছা। তাঁর করুণা ভিন্ন আর উপায় কি?

সম্রাট কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"ঠিক বলেছো সুফিয়া, তাঁর করুণা ভিন্ন আর উপায় নাই। তাঁর করুণার ভিখারী হ'তে হবে।" তারপর ঊর্দ্ধনেত্রে

আকাশপানে চাহিয়া যুক্তকরে ডাকিলেন,—"জগদীশ্বর! দুনিয়ার মালিক! সম্রাটের সম্রাট! কোন পাপে আমার প্রজা আজ তোমার করুণায় বঞ্চিত? খোদা উপায় করো—উপায় করো!"

উন্মত্তের ন্যায় সম্রাট সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

সুফিয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সম্রাটের মনের অবস্থা বুঝিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"হায়! সাম্রাজ্যে সুখ নাই। বিলাসে হৃদয়ের আশা মেটে না! এত বড় সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েও তাঁর প্রাণে আজ শান্তি নাই! আগে জানলে, সম্পদ ও সাম্রাজ্যের প্রার্থনা কে করতো! দীনহীন তরুতলবাসী প্রজাও আজ সম্রাটের অপেক্ষা কত সুখী।"

তাঁহার হৃদয় মধ্যে একটি করুণ-সঙ্গীত ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলই গরল ভেল।"

(৩)

দিল্লীর অনতিদূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। বৃক্ষ-তরুলতা তাপদগ্ধ হইয়া ঝলসিয়া গিয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে বসন্তের নবীন-মঞ্জরী আর শোভা পাচ্চে না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে সে প্রান্তর ক্রমশঃ লোকে লোকারণ্য

হইতে লাগিল। অসংখ্য লোক—রাজা-মহারাজ, দীন-দরিদ্র, ছোট বড়—যে যেখানে ছিল—প্রভাতে সকলে সে প্রান্তরে সমবেত হইয়াছে। সকলেরই নগ্নপদ এবং নগ্নমস্তক। হিন্দু মুসলমান আজ এক হইয়াছে, ধনী দরিদ্র আজ সমান হইয়াছে, শত্রুমিত্র আজ একত্র মিশিয়াছে—সমগ্র হিন্দুস্থান আজ ব্রতোপবাসী থাকিয়া যেন কোন পুণ্যব্রতের উদ্‌যাপনে উদ্বোধিত।

সম্রাট আজ সাধারণের বেশে, নগ্নপদে নগ্নমস্তকে সকলের সঙ্গে মিশিয়াছেন। কে বিশ্বাস করিবে যে, সদা-সুখৈশ্বর্য্য-সেবিত দিল্লীর সম্রাট আজ কাঙ্গালের বেশে কাঙ্গালের সঙ্গে মিশিয়াছেন! আজ অভাব ও ঐশ্বর্য্য যেন এক মাতৃগর্ভজাত সন্তানের মত একত্র মিশিয়াছে। কি অপরূপ দৃশ্য!

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল; সূর্য্যতাপে যেন অগ্নিকণা বর্ষিত হইতে লাগিল। এই অগণিত লোকসমুদ্রের মধ্যে কাহারও মস্তকে আবরণ নাই। রাজপুরুষদের সুন্দর মুখশ্রী, তাপদগ্ধে মসিময় হইয়া আসিয়াছে।

সম্রাট সেই লোকসমুদ্রের মধ্যস্থলে নতজানু হইয়া বসিয়া যুক্তকরে উদ্ধনেত্রে আকাশপানে চাহিয়া জগদীশ্বরকে ডাকিতেছেন। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। আহা! সে মূর্ত্তি কত উজ্জ্বল, কত জ্যোতির্ম্ময়! সে পুণ্যমুহূর্ত্তে সে মূর্ত্তির প্রতি চাহিবার ক্ষমতাও কাহারও নাই। প্রস্তর-

মূর্তিবৎ সম্রাট—স্থির অবিচলিত। কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছেন—"হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিতা জগতের নাথ, হে আল্লা, হে খোদা, হে প্রভু দয়াময়! আজ আমার এ কি পরীক্ষা! আমার নিরীহ প্রজা যে অনাহারে মরিতেছে! তোমার সন্তান—রাজরাজেশ্বরের সন্তান, কেন আজ এত কষ্ট পায় দয়াময়?"

কোথাও মৌলবীগণ কোরাণ পাঠ করিয়া জগতের শান্তি-প্রার্থনা করিতেছে, কোথাও ব্রাহ্মণমণ্ডলী সুললিত ছন্দে বেদোচ্চারণ করিয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কত জাতির কত প্রার্থনা, কত জনের কত কাতর ক্রন্দন—আজ করুণার ভিখারী হইয়াছে।

"দয়াময়! একবার দেশে শান্তি দাও। তোমার করুণার রাজত্বে এ কি দৃশ্য দেখাচ্ছ প্রভু! সমগ্র হিন্দুস্থান আজ অনলে দগ্ধ হচ্ছে! এক বিন্দু বারিবর্ষণ নাই—সুজলা সুফলা মাতৃভূমি আজ মরুভূমি হয়েছে দয়াময়! একবার দেশে শান্তিবারি বর্ষণ করো! দুঃখদৈন্য দূরে যাক!"

চারিদিকে কেবল প্রার্থনা—হিন্দু মুসলমান ধনী দরিদ্র সকলের সমবেত কাতর-প্রার্থনা—বৈশাখের উত্তপ্ত বায়ুকে প্রশান্ত করিয়া তুলিল। রৌদ্রদগ্ধ রক্তমূর্তি সম্রাটের গণ্ডস্থল কেবলই অশ্রুপ্লাবিত হইতেছে।

বৈকালে পশ্চিমাকাশে অকস্মাৎ এক খণ্ড মেঘের সঞ্চার

হইল। ক্রমশঃ উহা ঘনায়মান হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে আকাশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল—সূর্য্যের জ্যোতিঃ গ্রাস করিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

ক্রমশঃ বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। সম্রাট ও প্রজামণ্ডলী সমভাবে যুক্তকরে বসিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। ভগবানের করুণা যেন অজস্রধারায় দগ্ধ সংসারকে শান্ত করিতে লাগিল। মাঠ ভাসিয়া গেল। ক্ষেত্র ডুবিয়া গেল। জল প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিতে লাগিল। তখন সম্রাটের ধ্যান ভঙ্গ হইল।

সম্রাট উচ্চকণ্ঠে তখন বলিয়া উঠিলেন,—"পরমেশ! তোমার করুণার ধারা এইরূপেই বর্ষিত হয়। তোমার দেশকে তুমিই আবার সঞ্জীবিত করিয়া দিলে। ধন্য তোমার অপার করুণা! আজ আমি ধন্য, আমার প্রজাবর্গ ধন্য!"

... ...

সম্রাটের অন্তঃপুর-কক্ষে সুফিয়া সুন্দরীও তখন যুক্তকরে জগদীশকে ডাকিতেছিলেন। তাঁহার অপার করুণার কথা মনে করিয়া সুফিয়ার গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইতেছিল।

তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে একটি অস্ফুট সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইতেছিল,—

"তোমারি করুণা আমার জীবন-কুঞ্জে
সদা যেন রাজে গো!"

অভাগিনী

(দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।)

(১)

ত্রিপুরা জেলার রামনগর গ্রামে কায়স্থ-কুল-তিলক নকড়িচন্দ্র চৌধুরীর বাস। নকড়ি—ক্ষুদ্র পত্তনিদার। ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু তাঁহার ডাক-হাঁক সুদূর-প্রসারিত। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসিগণকে তাঁহার দোহাই মান্য করিয়া চলিতে হইত। নকড়িচন্দ্র পল্লীবাসিগণের অপরাধের বিচার ও দণ্ড-বিধান করিতেন। এক কথায়, নকড়ি বিচারক, সমাজপতি এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জনগণের ভাগ্য-নিয়ন্তা। কচিৎ কেহ তাঁহার হুকুম অমান্য করিলে, সদ্যঃসদ্য তাহার ভিটায় ঘুঘু চরিবার ব্যবস্থা হইত। নকড়ি বড় একটা লেখা-পড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার বল-বীর্য্যের ও শস্ত্র-নৈপুণ্যের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল।

নকড়ির দুই স্ত্রী। দ্বিতীয় পরিণয়ের বর্ষদ্বয় পরে নকড়ি প্রথমা স্ত্রীর ষড়যন্ত্রে দ্বিতীয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। বাটীর এক প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র একখানি কুটীরে সেই দুঃখিনী অশ্রুধারা সম্বল করিয়া কষ্টময় দিন যাপন করিতেছিল। যাহার মন্দভাগ্য, বিধাতা কেন তাহাকে অতুলনীয় রূপ প্রদান করিলেন? স্বামি-পরিত্যক্তা জীর্ণবাস-পরিহিতা কুললক্ষ্মীর অপূর্ব্ব রূপচ্ছটায় ভগ্ন কুটীরখানি দিন-রাত্রি আলোকিত ছিল।

(২)

দিনের পর রাত্রি—রাত্রির পর দিন আসে যায়, জগতে শত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, কিন্তু অভাগিনীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না। অভাগিনী একাকিনী স্থাণুবৎ কুটীর-দ্বারে বসিয়া দিবসের দীর্ঘ পলগুলি গণনা করে; বাহ্য-জগৎ ভুলিয়া অনন্তের চরণে হৃদয়ের কত আকুল প্রার্থনা ঢালিয়া দেয়। প্রভাতে অরুণ-রাগে যখন প্রকৃতি হাস্যময়ী মূর্ত্তি ধারণ করেন, জীব-জগৎ যখন প্রফুল্ল-চিত্তে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, বিহঙ্গমকুল মধুর কূজনে যখন প্রকৃতি-বক্ষে মাধুর্য্য-রাশি ছড়াইয়া দেয়; হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কুটীর মধ্যে যাইয়া অভাগিনী ভূমি-শয্যায় পড়িয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করে। মধ্যাহ্নে ঘুঘুপাখীর ললিত তানে কি এক নৈরাশ্য-লহরী চতুর্দ্দিকে ভাসিয়া বেড়ায়; অভাগিনীর নিরাশ-চিত্ত তখন আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

সন্ধ্যা আসিল। আকাশে নক্ষত্র-ফুল ফুটিয়া উঠিল। অভাগিনীর স্থির-দৃষ্টি নক্ষত্র-পানে ন্যস্ত। না জানি, অভাগিনী নক্ষত্র-পানে তাকাইয়া প্রাণে কি শান্তি লাভ করে! বুঝি বা, নীরব-ভাষায় নক্ষত্র-পুঞ্জের কাছে প্রাণের ব্যথা ব্যক্ত করে।

দিনান্তে স্বামীকে একটি বার দেখিবার জন্য অভাগিনীর কত আকুল চেষ্টা—কত প্রাণের আকিঞ্চন। কতদিন সাহসে বুক বাঁধিয়া, টিপিটিপি পা ফেলিয়া, বাড়ীর শয়নকক্ষ পানে চলিয়া যায়। সপত্নীর শ্যেন চক্ষু এড়াইতে পারে না; সপত্নীর কাছে বিদ্রূপ-বাণ উপহার পাইয়া, নিরাশ-চিত্তে অশ্রু-জলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া, কুটীরে ফিরিয়া আসে।

সপত্নী কর্ত্তৃক তাচ্ছিল্য সহকারে প্রদত্ত সামান্য চারিটী খাদ্য-সামগ্রীই অভাগিনীর জীবন-ধারণের একমাত্র সম্বল। নকড়ি নিয়ম করিয়া দিয়াছে, প্রতিদিন দুই বেলা চাল-ডাল চাহিয়া লইয়া স্বহস্তে রান্না করিয়া খাইতে হইবে।

(৩)

যাতনার উপর এক নূতন যাতনা, শত চিন্তার উপর এক অভিনব চিন্তা উপস্থিত হইল। অভাগিনী পাড়ার এক বৃদ্ধার মুখে শুনিল যে, নকড়ি ডাকাতির সংশ্রবে সংলিপ্ত। শুনিয়া অবধি তাহার ভগ্ন-হৃদয় অধিকতর ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বামীর বিপদাশঙ্কায় তাহার অস্থির চিত্ত অধিকতর অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিল,—

"তাঁহার কিসের অভাব? তবে কেন তিনি এমন ঘৃণিত কার্য্যে সংলিপ্ত থাকিবেন? ডাকাতি—কি ভয়ানক পাপ কার্য্য! পরধন লুণ্ঠন, পরের প্রাণ হনন—কি মহাপাতক! ইহাতে তো তাঁহার নিজের প্রাণ হারাইবার আশঙ্কাও পদে পদে। এমন কার্য্য কি তাঁহার দ্বারা সম্ভবে? রামমণি ঠাকরুণ মিথ্যা কথা বলিবেন!—ইহা তো কখনই সম্ভবপর নহে! তবে কি এই উপায়েই তিনি টাকাকড়ি সঞ্চয় করিয়াছেন?"

অভাগিনী আর ভাবিতে পারিল না। তাহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল।

অভাগিনী কত কি ভাবিতে লাগিল। সে কি করিবে? কি উপায়ে নকড়িকে এ বিপদ-সঙ্কুল পাপকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে,—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। স্বামীর সন্দর্শন-লাভ তাহার পক্ষে দুর্ল্লভ। যাহার ছায়া পর্য্যন্ত নকড়ির বিরক্তিকর, যাহার নামমাত্র শ্রবণে নকড়ি ঘৃণা-রোষে উন্মত্তবৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে, সে তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন করিবে! ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

কিন্তু তথাপি সেই দিন হইতে অভাগিনী, তাহার পক্ষে যতদূর সম্ভব, স্বামীর গতি-বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। অভাগিনী দেখিল,—রঘু ডাকাত সর্ব্বদা তাহার স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসে,— কখনও বা তাহার স্বামী নকড়ি, রঘুর সহিত পরামর্শাদি

করিবার জন্য তাহার কুটীর-সন্নিহিত গলি-পথে আসিয়া প্রতীক্ষা করেন। কখনও একক, কখনও বা সদলে আসিয়া রঘু গোপনে পরামর্শ করিয়া চলিয়া যায়। রঘু ডাকাতের নাম কে না জানে? রঘুর নামে ভয় পায় না, এমন কয় জন সে অঞ্চলে আছে?

(৪)

অনেক দিন অতীত হইল। স্বামীর বিপদ চিন্তায় অভাগিনী আপন দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া গেল। অনেক গাড়িয়া-ভাঙ্গিয়া অবশেষে অভাগিনী এক উপায় স্থির করিল।

অভাগিনীর কুটীরের কয়েক হস্ত ব্যবধানে সেই সঙ্কীর্ণ গলি-পথ। পথের উভয় পার্শ্ব জঙ্গলাকীর্ণ। এ পথে অন্য লোকের বড় গতিবিধি ছিল না। এই পথে একদিন প্রদোষ সময়ে অভাগিনী পতির প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সহসা রঘু ডাকাত তাহার সম্মুখে পড়িল। রঘু ডাকাত সেই গলি-পথ দিয়া একাকী যাইতেছিল। অন্ধকার পথ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া—কে এ রমণী? রঘু চমকিয়া উঠিল। এমন অপূর্ব্ব রূপ, রঘু জীবনে আর কখনও দেখে নাই।

রঘু ভাবিল,—"একি দেবী?—না মানবী!" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই কে মা?"

অভাগিনী রঘুকে চিনিল; করুণ-কণ্ঠে কহিল,—"আমি তোমার ধর্ম্ম-মেয়ে।"

রঘু ততোঽধিক বিস্মিত স্তম্ভিত।

রমণী কহিল,—"তুমি আমার ধর্ম্ম-পিতা। তোমার নিকট আজ একটী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।"

রঘুর বিস্ময়-প্রাবল্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে কহিল,—"তুই মা সাক্ষাৎ দেবী। মানুষের কাছে, বিশেষ ডাকাতের কাছে, দেবতার ভিক্ষা চাওয়া কি সম্ভব?—না, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি।"

রমণী।—"সম্ভব। ইহা স্বপ্ন নহে—সত্য। সত্যই তোমার অভাগিনী মেয়ে ভিক্ষা-প্রার্থী।"

"তবে বল মা, কি তোর ভিক্ষা।"

এই বলিয়া রঘু উত্তরের প্রতীক্ষায় নীরব রহিল।

রমণী মধুর কণ্ঠে কহিল,—"বাবা, প্রতিজ্ঞা কর, আর ডাকাতি করিবে না!"

রঘু বিষম ভাবনায় পড়িল; কহিল,—"মা, আমায় এ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিও না। বাপ-পিতামহের আমল থেকে এ ব্যবসা করে আস্‌ছি। তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর্‌লেও তাহা পালন কর্‌তে পার্‌ব না। আজন্ম অভ্যাস-দোষে তাহা করিতে বাধ্য হইব। প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি পালন করিতে না পারি, সে প্রতিজ্ঞায় কি ফল আছে, মা? তবে এক কথা, আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব,—এ ব্যবসা ছাড়তে পারি কি না?"

রমণী কহিল,—"কেন ছাড়্‌তে পার্‌বে না? চেষ্টায় কি না হয়?"

রঘু।—"মা, বলিয়াছি তো, এ আমার জনম-রোগ।"

রমণী দৃঢ়স্বরে কহিল,—"বাবা, জেনে রাখ, আমার এই পণ যে, আমি তোমাদিগকে এই মহাপাপ কার্য্য হইতে ফিরাইব।"

রঘুর মুখে ঈষৎ হাস্য-স্ফূরণ হইল; কহিল,—"যদি তা পারিস্ মা, তবে বুঝিব, সত্যই তুই দেবী।"

অভাগিনী ক্ষণেক পরে কহিল,—"বাবা, আর একটী ভিক্ষা। কর্ত্তাকে তোমাদের দল থেকে ছাড়িয়ে দাও।"

রঘু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি মা, তুই চৌধুরী মহাশয়ের ছোট স্ত্রী?"

রমণী বাষ্প-বজিড়িত কণ্ঠে কহিল,—"আমি তাঁহার পরিত্যক্তা দাসী। সে কথা যাক—বাবা! আমার মুখ পানে চেয়ে, তোমাদের এ ব্যবসা থেকে কর্ত্তাকে ছাড়িয়ে দাও।"

রঘু।—"কেন মা?"

রমণী।—"তিনি ডাকাতিতে লিপ্ত আছেন শুনে অবধি, আমি এক মুহূর্ত্তও স্থির হতে পার্‌ছিনে। এ কার্য্যে বিপদ পদে পদে। সেই ভাবনায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।"

রঘু।—"মা, তাঁর বিপদের কোনও সম্ভাবনা নাই। তিনি

অন্ধি-সন্ধি ফিকির-ফন্দি বলে দেন, আমরা ডাকাতি করি। তিনি ঘরে বসে ভাগ পান। তাঁর জন্য চিন্তা কি?"

রমণী।—"তাঁর জন্য চিন্তা কি? পরের লুণ্ঠিত অর্থ ভোগ করা মহাপাপ! তাঁর কিসের অভাব যে, তিনি অর্থ-লোভে পাপের পথে দাঁড়িয়েছেন।"

রঘু।—"পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাক্‌লে কি মা তোর মত স্ত্রীকে ত্যাগ কর্‌তে পারে? এমন স্ত্রীকে যে ত্যাগ কর্‌তে পারে, সে নরাধমের পক্ষে—"

রমণী বাধা দিয়া কহিল,—"বাবা, আমি চলিলাম। আমার সমক্ষে তাঁর নিন্দা করো না। তাঁর নিন্দা শুন্‌তে তোমার কাছে আসি-নি। নারীর পক্ষে স্বামী একমাত্র দেবতা। দেবতায় দোষ সম্ভবে না। আমি তাঁহার অযোগ্য। তাঁহার সেবা করিতে জানি না। তাই নিজের দোষে তাঁহার সেবা করিবার অধিকারে বঞ্চিত রহিয়াছি।"

রঘু নীরব নিস্পন্দ। অভাগিনী কুললক্ষ্মী এই অবসরে পলক মধ্যে অদৃশ্য হইল। রঘু কিয়ৎক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে চলিয়া গেল।

(৫)

রঘুর চিত্ত আজ অপ্রসন্ন—স্ফূর্ত্তিহীন। প্রাণের ভিতর রঘু যেন কিসের একটা আঘাত অনুভব করিতে লাগিল।

সেই রাত্রে জনৈক সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীতে ডাকাতি করিবার পরামর্শ স্থির হইয়া ছিল। রজনী গভীর হইতে না হইতেই এক দুই করিয়া দলের লোক রঘুর গৃহে আসিতে লাগিল।

দলের সকলে আসিয়া জুটিলে, রঘু কহিল,—"আজ আমি যাইব না। পার যদি, তোমরা কাজ সাবাড় করিয়া আইস।"

প্রধান অনুচর শঙ্করা কহিল,—"সরদার খুড়ো! জীবনে যা শুনি-নি, আজ তা তোমার মুখে শুনে অবাক হয়েছি। 'যাব না'—এমন কথা সরদারের মুখে শোভা পায় না!"

রঘু ঔদাস্য-ভরে কহিল,—"আজ আমার শরীর-মন ভাল নয়। যদি অনিচ্ছা-সত্ত্বে নিয়ে যাস্, তা হলে তোরা দল শুদ্ধ সকলে ধরা পড়বি।"

শঙ্করা হতাশ-চিত্তে কহিল,—"তোমাকে ছেড়ে ডাকাতি করা অসম্ভব। তবে না হয়, আজ নিরস্তই থাকা যাক।"

দলের কেহই রঘুকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইল না। কাজেই সে রাত্রির মত সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। ইহার পর সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

(৬)

হৃদয়ের শান্তি-উৎসাহ হারাইয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত রঘু কেমন এক রকম উদাসীনের ন্যায় দিন কর্ত্তন করিতেছিল। রঘু এই কয়েক দিন নকড়ির ছোট স্ত্রীর রূপ-গুণের কথাই ভাবিতেছিল :—

রঘু ভাবিল,—"যে নারী শত অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যে প্রাণ দিয়া নকড়ির ন্যায় নরাধমকে ভালবাসিতে পারে, সে নারী সামান্যা নারী নহে!"

রঘুর জীবনে যেন লোক-লোচনের অন্তরালে তিল তিল করিয়া পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে লাগিল। রঘু শোণিতলোলুপ নরঘাতী দস্যু; নরহত্যাকে মৃগয়ার ন্যায় প্রধান ব্যসন বলিয়া মনে করিতে চির-অভ্যস্ত। রঘু জোর করিয়া হৃদয়ের বিষাদ-অবসাদ দূর করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু হৃদয়ে পূর্ব্বের উৎসাহ-আনন্দ আর ফিরিয়া আসিল না।

এই ভাবে কিছুকাল গেল। সহচর অনুচরগণের উত্তেজনায় অবসাদগ্রস্ত চিত্ত আবার ডাকাতির উল্লাস-আনন্দে মাতিয়া উঠিল। মজ্জাগত চির-অভ্যাসের উপর ক্ষণিক জাগ্রত বিবেকের প্রভাব অধিক দিন স্থায়ী হইল না।

আবার পূর্ণোদ্যমে দেশে ডাকাতি চলিতে লাগিল! দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল! এখনকার মত তখন দেশে সুগঠিত বিচারাদালত ছিল না। দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূস্বামিগণই দেশের শান্তিরক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই স্বার্থের অনুরোধে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

ক্ষুদ্র হইলেও নকড়ির প্রবল প্রতাপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। নকড়ি যাহাদের নায়ক, তাহাদের জয় করিবার বড় কেহ ছিল না।

সুতরাং রঘু প্রমুখ ডাকাতদলের উত্তরোত্তর লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছিল। নকড়ি জানিত, রঘু প্রভৃতির যত বল-বিক্রম, এক মাত্র তাহার প্রসাদাৎ। গর্ব্বিত নকড়ি দলের ডাকাতগণকে বড় একটা গ্রাহ্য করিত না; তাহাদের প্রতি অনেক সময় অন্যায়াচরণ করিতেও অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। একমাত্র স্বার্থসাধন পক্ষে যতটুকু সদয়-ব্যবহার করা আবশ্যক, তদতিরিক্ত কিছু করা, নকড়ি দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিত। এক কথায় নকড়ি, রঘু ভিন্ন দলস্থ অপর সকলকে তৃণবৎ জ্ঞান করিত। সে জানিত, রঘু বিগড়াইয়া গেলে তাহার আয়ের পথ বন্ধ হইবে; অন্যবিধ বিপৎপাত হওয়াও বিচিত্র নহে। তাই রঘু'কে নকড়ি কতকটা খাতির করিত।

লুণ্ঠিত অর্থাদির প্রধান ও সার ভাগ নকড়ির প্রাপ্য। নকড়ি হাতে তুলিয়া যাহাকে যাহা দিত, তাহাতেই অপর সকলকে বাধ্য হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। নকড়ির এইরূপ ব্যবহারে অন্তরে অন্তরে দলস্থ সকলে তৎপ্রতি একান্ত বিরক্ত; কিন্তু কাহারও সে বিরাগ-বিরক্তি প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ছিল না। অন্তরের বিরাগ-বিরক্তি চাপা দিয়া দলস্থ সকলেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছিল।

(৭)

সহসা আগ্নেয়-গহ্বর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বাভাষে বুঝা গেল, অদূর ভবিষ্যতে প্রবল অনলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হইবে।

একদা গভীর নিশীথে রঘুর গৃহে দস্যু-দলের বৈঠক বসিল। —

রঘুর প্রধান অনুচর শঙ্করা কহিল,—"সরদার খুড়ো! তুমি যাই বল, নকড়ি বেটার অত্যাচার আর আমরা সহ্য করতে পারি নে।"

রঘু স্থির-কণ্ঠে কহিল,—"আজ হঠাৎ এ কথা কেন?"

শঙ্করা অপেক্ষাকৃত উন্নত-কণ্ঠে কহিল,—"আজ তো নূতন নহে! কত দিন তোমাকে বলেছি। না জানি, নকড়ি বেটা কি কুহকে তোমায় ভুলিয়ে রেখেছে!"

রঘু।—"শঙ্কর! সবই সত্য। কিন্তু একবার ভেবে দেখ দেখি, ওকে চটালে আমরা কয় দিন ডাকাতি ব্যবসায় চালাতে পারব?"

শঙ্করা কহিল,—"না পারি, লাঙ্গল ধরব। না হয়, মজুর খেটে খাব। তবু ও পাজি বেটার তোয়াক্কা রাখ্‌ব না। সে দিন কি শুন-নি, ও বেটা আমাদের কত গাল-মন্দ দিলে! এত অলঙ্কার-পত্র লুট করে আনি, সবগুলিই ও বেটা নিয়ে যায়! আমার বড় সাধ ছিল, বৌকে এক জোড়া রূপার তাগা দি! কসাই বেটার কাছে মুখ ফুটে ব'ল্‌লাম, বেটা তা দিলে না; অধিকন্তু যা ইচ্ছা, তাই ব'লে গাল-মন্দ দিলে। আর তো সহ্য করা যায় না!"

হীরা বলিল,—"এ সব তো আর নকড়ি বেটার বাপের ঘরের ধন-দৌলত নয় যে, আমাদের ন্যায্য-গণ্ডা দিতে ওর বুক ফেটে যায়! খুন ক'র্‌তে আমরা, হাঙ্গামা ক'র্‌তে আমরা, বিপদ ঘাড়ে নিতে আমরা, ও পাজি বেটা কিনা রাজার হালে তক্তে বসে বসে বার আনা-ভাগ নেবে। কেবল তাই নয়; আমাদিগকে আবার গাল-

মন্দ দেবে! আর সহ্য হয় না;—কিছুতেই সহ্য ক'রব না! না হয়, ডাকাতি ছেড়ে ঘরে ঘরে ভিক্ষে মেগে খাব; সেও বরং ভাল।"

দলস্থ আর আর সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"নকড়ি বেটাকে ছেড়ে যদি ডাকাতি কর্‌তে হয় কর্‌ব; নচেৎ, আজ থেকে ডাকাতির পায়ে দণ্ডবৎ।"

নকড়ি সম্বন্ধে রঘুরও অনুকূল ধারণা ছিল না। তাহার প্রতি রঘুর বিরাগ-বিরক্তি দলস্থ অপর সকলের অনুরূপই বটে। নকড়ির অবিচারে রঘু এক এক দিন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিত। কিন্তু রঘু বড় চতুর ছিল; তাই অবস্থানুযায়ী চলিবার চেষ্টা পাইত।

রঘু কহিল,—"তবে তোরা কি ক'র্‌তে বলিস্?"

শঙ্করা ও হীরা অগ্রসর হইয়া কহিল,—"আমরা বলি, নকড়ি বেটা এত কাল আমাদের ঠকিয়ে যে টাকাকড়ি সঞ্চয় করেছে, সে সকল আমরা লুটে আনি।"

উল্লাস-আনন্দে অপর সকলে "জয় মা কালী" রব করিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে সকলে আপন আপন হাতিয়ার স্পর্শ করিয়া শপথ করিল,—'নকড়ির বাড়ী লুণ্ঠন না করিয়া তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইবে না। স্থির হইল, পর রজনীতে সকলে নকড়ির গৃহ আক্রমণ করিবে।'

রঘু তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু কোনই ফল ফলিল না।

(৮)

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করিয়া একটা রমণী নকড়ির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিল,—"বাবা, তুমি শীঘ্র পালাও—নইলে তোমার প্রাণ যাবে।"

নকড়ি কহিল,—"খুলে বল না, কি হয়েছে? তোমার কথা যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে!"

রমণী কহিল,—"আর খুলে কি বল্‌ব, বাবা! তোমার দলের ডাকাতেরা আজ রাতে তোমার ঘরবাড়ী লুঠ ক'রে পুড়িয়ে দিবে। তোমায় খুন কর্‌বে ব'লেও তারা মতলব এঁটেছে। আমি চল্‌লাম, বাবা! তোমায় আমি সংবাদ দিয়েছি জান্‌লে আমায় দু' টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেল্‌বে।"

এই বলিয়া রমণী চলিয়া গেল।

রমণী অপর কেহ নহে;—রঘুর স্ত্রী। রঘু কি আপন স্ত্রীকে পাঠাইয়া নকড়িকে সতর্ক করিবার চেষ্টা পাইল? অথবা, রঘুর স্ত্রী, রমণী-সুলভ করুণার প্রভাবে, আপনিই আসিয়া এ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া গেল?

নকড়ি পলাইল না। তাহার আদরিণী স্ত্রী কত বুঝাইল, কত অনুরোধ করিল; কিন্তু নকড়ি পলাইতে সম্মত হইল না। আদরিণী আপন প্রাণ লইয়া প্রতিবেশীর ঘরে আশ্রয় লইল।

নকড়ি ভাবিল,—"ভেড়ার পালের ভয়ে পালাব? ছিঃ—"

(৯)

গভীর রজনী। প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ। নীরব শান্তি প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে বিসর্পিত। প্রকৃতি যেন দিবসের কার্য্যব্যস্ততার কোলাহলে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া অবসন্ন চিত্তে নিদ্রার অঙ্কে শায়িত।

সহসা ডাকাতগণ "জয় মা কালী" রবে নৈশ-গগন কম্পিত করিয়া নকড়ির প্রাঙ্গণ-মধ্যে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অকথ্য ভাষায় গালি-বর্ষণ করিতে লাগিল।

রঘু প্রথমে আসিতে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ডাকাইতদের উত্তেজনা-বশে এই লুণ্ঠন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে বাধ্য হয়।

অভাগিনী, আপন কুটীর মধ্যে থাকিয়া দস্যুদের আক্রমণের বিষয় সকলই শুনিতে পাইল। তাহার বড় ভয়-ভাবনা হইল। ভাবিল,—'এ তো শুভ লক্ষণ নহে! যাহারা তাহার স্বামীর হুকুমে পরিচালিত, আজ তাহারা এ কি ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প সাধন করিতে উত্তেজিত হইয়াছে!'

অভাগিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না, লজ্জা-ভয় দূরে ঠেলিয়া ত্রস্ত-ব্যস্তে আসিয়া রঘুর সম্মুখে দাঁড়াইল।

রঘু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে বিমর্ষ-ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। সহসা সম্মুখে অভাগিনীকে দেখিয়া বিস্মিত-কণ্ঠে কহিল,—"তুই এ সময় এখানে কেন, মা?"

দুঃখিনী কহিল,—"তোমরা এ বেশে এখানে কেন, বাবা !"

রঘু নীরব।

অভাগিনী কহিল,—"বাবা ! তোমার মেয়ের মুখপানে চেয়ে তোমার দল নিয়ে চলে যাও। বাবা, জান না কি, আমি চির-দুঃখিনী। দুঃখের উপর আর দুঃখের বোঝা চাপাইও না।"

রঘু কহিল,—"পতি বর্ত্তমানেও তুই তো মা চির-অভাগিনী।"

অভাগিনী কাঁদিয়া ফেলিল ; কহিল,—"আমার পূর্ব্ব-জন্মের পাপের ফলে কষ্ট ভোগ করিতেছি। তাঁর কি দোষ, বাবা ! তিনি আমার দেবতা। বাবা, দয়া করে আমায় ক্ষমা ভিক্ষা দাও।"

রঘুর মন একটু নরম হইল। রঘু আর এক পদও অগ্রসর হইল না ! প্রাণের ভিতর এক অভাবনীয় আঘাত অনুভব করিয়া রঘু নীরবে আপন মনে ভাবিতে লাগিল।

এতক্ষণ নকড়ি নীরবে গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। সহসা নকড়ি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রাঙ্গণ-তলে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সগর্ব্বে কহিল,—"কি ! উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুক্কুর-দলের এত দূর স্পর্দ্ধা ! দাঁড়া, এখনই সব বেটাদের জুতা পেটা ক'রে তবে ছাড়ব।"

এই বলিয়া নকড়ি অগ্রসর হইয়া আসিল। অমনি শঙ্কর কয়েক পদ সরিয়া আসিয়া, নকড়ির বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া, শাণিত বর্শা উত্তোলন করিল।

আর এক মুহূর্ত্ত! অমনি পলক মধ্যে সেই চিরদুঃখিনী কুললক্ষ্মী ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে পশ্চাতে রাখিয়া বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইল! শঙ্করের শাণিত বর্শা অভাগিনীর বক্ষ বিদীর্ণ করিল। নকড়ি প্রাণ-ভয়ে কোথায় অদৃশ্য হইল।

(১০)

বর্শাবিদ্ধা কুললক্ষ্মী প্রাঙ্গণ-তলে পতিত হইল; খর-বেগে শোণিত-প্রবাহ বহিতে লাগিল। রঘু হায় হায় করিয়া উঠিল। ধর্ম্ম-মেয়ের পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া শোণিত-স্রোত রোধ করিতে কত নিষ্ফল চেষ্টা করিল।

অভাগিনী ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—বাবা, শেষ ভিক্ষা, কর্ত্তাকে ক্ষমা ক'রও!"

প্রস্তরে বারি সঞ্চার হইল। রঘু কাঁদিয়া ফেলিল। চক্ষু-জল মুছিতে মুছিতে কহিল,—"মা, তুই অসম্ভব সম্ভব করে তুল্লি। কেহ কখনও রঘুর চক্ষে জল দেখে নাই। মা, ইহাই কি তোর ইচ্ছা ছিল?"

রঘু বালকের ন্যায় 'মা মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে কহিল,—"তুই ভাগ্যবতী, তোর বাক্যই সফল হউক। আজ থেকে ডাকাতি পরিত্যাগ ক'র্লাম। আজ থেকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'ল!"

* *

নগেনের মা ডাকিলেন,—"বাবা নগেন! ভাত-বাড়া হয়েছে, এস।"

"যাই মা" বলিয়া নগেন বাহিরে আসিল।

আহারাদি সমাপনান্তে নগেন ও সুরমা ঘরে আসিল। এখন কোথায় দুটো ভালবাসার কথা হবে—তা না, সেই তুলার কথা। তবে কথাবার্ত্তাটা একটু মিঠে রকমেরই হইতেছিল।

কথা কহিতে কহিতে নগেন বলিল,—"আমার পাঞ্জাবীটা বার করে দাও তো।"

"কেন?"

"যাই—একটু ঘুরে-ফিরে আসি।"

এই বলিয়া নগেন, পাম্প-শু-টি পায়ে দিয়ে কোঁচার খুঁট দিয়ে দুই একবার ঝেড়ে নিল।

সুরমা বাক্স সমস্ত তোরঙ্গ হইতে পাঞ্জাবী আনিয়া দিয়া বলিল,—"এত রাত্রিতে না বেরুলেই কি নয়? আজ কি নম্বর ধর্‌বে মনে করেছ?"

"দেখি, আড্ডায় যাই; খগেন-টগেনরা কি ধরে দেখি। আর না হয়, তুমিই একটা নম্বর বলে দাও; যা থাকে কপালে, তাতেই ধ'রব! আগে একটা নম্বর 'ব্যাক্' ক'রে যা হোক কিছু হ'তো; এখন পাঁচ জনের মতলবেই গেলুম।"

সুরমা কোনই উত্তর দিল না। নগেন দেখিল,—রাত্রি প্রায় নয়টা

বাজে। 'ফিগারের' দর কমিয়া আসিতেছে। অতএব আর বাজে সময় নষ্ট করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, নগেন উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরমা আর স্থির থাকিতে পারিল না। কাতর স্বরে কহিল,—"তোমার পায়ে পড়ি; আজ আর যেও না।"

এই বলিয়া সুরমা নগেনের হাত ধরিল।

অগত্যা নগেন বসিল; বলিল,—দেখ কাল ১০এর 'চান্স' বড্ড বেশী। ১০ উঠবেই উঠবে। এক বৎসরের মধ্যে ৫এর পর ১০ ছ'বার উঠেছে। আজকে ১০এ ৩৫৲ টাকা ধ'রে আসি। কি বল? কথার উত্তর দিচ্ছ না যে!"

বোধ হইল যেন সুরমা মনে মনে বলিতেছে—"জুলা-খেলায় আগুন লাগুক।"

"কি গো! একেবারে বোবা হ'লে যে! রোজ যে নম্বর বলা হয়! আজ তোমার কথা মত ধরবো বলছি; তাই গুমর হলো!"

"না—না, গুমোর নয়! তবে যদি একান্তই আবার ধরবে, তবে ১০এই ধর!"

নগেন একটু আনন্দিত হইয়া বলিল—"সেই ঠিক। দেখ্‌ব তোমার কথা! লোকে বলে—সতী-স্ত্রীর কথা কখনও মিথ্যা হয় না। এই সঙ্গে আমার সে পরীক্ষাটাও হবে। আমার প্রতিজ্ঞা—যদি এই নম্বরে 'পেমেণ্ট' পাই, তবে আজীবন তোমায় বুকে করে রাখ্‌ব; কখনও অবজ্ঞার চক্ষে দেখ্‌বো না।"

এই বলিয়া নগেন টাকা লইয়া শেঠ চাঁদের দোকানে চলিয়া গেল। সুরমা ভয়-হৃদয়ে শয্যায় আসিয়া শুইল।

(২)

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই পথে সুরেশের সহিত নগেনের সাক্ষাৎ হইল। সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"এত রাত্রে ভাই কোথায় চলিয়াছ ?"

"যাবে ? চল না !"

"কোথায় ?"

"শেঠ চাঁদের দোকানে তুলা-খেলা দেখ্‌তে !"

"তুলা-খেলা ! হাঁ—হঁ, শুনেছি বটে ; তুলা-খেলা নিয়ে আজকাল সহরে বড়ই হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে। কিন্তু খেলাটা কি, আমি এ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পারি-নি।"

"খেলাটা অতি সহজ—অতি সুবিধাজনক। এ খেলায় দুই চারি দিনের মধ্যেই 'চান্স' ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা। এক থেকে দশ পর্য্যন্ত দশটা নম্বর আছে। সেই নম্বরের যে কোনও একটা নম্বরে টাকা ধরা যায়। কিন্তু ঠিক নম্বরটাতে টাকা ধর্‌তে পার্‌লে, একটা টাকায় আট টাকা, দশ টাকা—এমন কি, তের টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যেতে পারে।"

"আচ্ছা সে নম্বরটা কি করে ঠিক হয় ?"

"আমেরিকায় যে দিন যে কয় গাঁইট তুলা বিক্রয় হয়, রয়টার

কোম্পানী ও গ্রিফিথস্ কোম্পানী এখানে সেই সংবাদ প্রচার করেন। যত গাঁইট বিক্রয় হইবে, তাহার শেষ অঙ্কটী সেই নির্দ্দিষ্ট নম্বর। মনে কর, যদি ২০১ গাঁইট তূলা বিক্রয় হয়, নির্দ্দিষ্ট নম্বর হইবে—এক। ২০৫ গাঁইট তূলা বিক্রীত হইলে, নম্বর—পাঁচ। ২১০ গাঁইট বিক্রীত হইলে নম্বর হইবে শূন্য অর্থাৎ দশ; ইত্যাদি। প্রতি দিন প্রাতে সেই নম্বর জানিতে পারা যায়। যে নম্বর উঠিবার সম্ভাবনা অর্থাৎ favourite সে নম্বরের দাম কম হইয়া যায়; আর যে নম্বর উঠিবার সম্ভাবনা নাই, তাহার দর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। যে নম্বর উঠিবার আশা কেহ করে নাই, সে নম্বরও সময় সময় উঠিয়া থাকে। বুঝে ধর্‌তে পার্‌লে, তাতেই অদৃষ্ট ফিরে যেতে পারে।"

বন্ধু বলিল,—"এ ভাই জুয়া খেলা। এতে ভদ্রলোকের যাওয়া উচিত নয়! তোমাকেও আমি যেতে নিষেধ করি! তুমি ঘরে ফিরে যাও!"

আবার সেই নিষেধ! গৃহে পত্নী নিষেধ করে, পথে বন্ধু বাধা দেয়;—নগেনের মন একটু চঞ্চল হইল। কিন্তু পরক্ষণেই নগেন কহিল,—"আচ্ছা কাল আমি তোমায় সব বোঝাব। তূলা-খেলা জুয়া-খেলা নয়। সহরের অনেক স্ত্রীলোক ও ঝি-চাকর দ্বারা নম্বর ধ'রে বেশ দু'টাকা লাভ করে থাকে।"

এই বলিয়া নগেন গন্তব্য-স্থানে প্রস্থান করিল।

(৩)

আপিসে ৮টার সময় হাজির হইতে হয় বলিয়া ৭টার পূর্ব্বে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রিয়া নগেন আপিসে চলিয়া গেল। বেলা দশটার সময় চাপরাসীকে নম্বর জানিতে পাঠাইয়া দিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"হুজুর! কিন পড়্কি গিরা।"

নগেনের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে চাপরাসীকে বলিল,—"এই টেণ্ডারঠো লেকে জলদি পোর্টকমিশনরমে যাও। এক দম বড় সাহেবকা হাতমে দেও। লে যাও—দেরী মত করো। এগারও বাজনেকা আগাড়ি লাগনা চাই।"

"কায়সে হোই, হুজুর! আউর তো তের মিনিট বাকি হায়।"

"পয়সা লেও। ট্রাম পর চড়কে চলা যাও। যাস্তি বাৎ মত কিও। এগার বাজনেকা আগাড়ী লাগ্‌না চাই।"

চাপরাসী চলিয়া গেলে, নগেন স্ত্রীর নামে একখানি চিঠি লিখিল।

সেই চিঠিখানি আফিসের একজন পিয়নের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে কহিল,—"এই চিঠিখানা আমার বাড়ীতে গিয়ে দিয়ে আয়। আর বলে আয়—আজ আমার মন ভাল নয়। যেতে একটু রাত্তির হবে।"

পিয়ন পত্র লইয়া নগেনের বাড়ীতে চলিয়া গেল।

নগেনের আর কোনও কাজই ভাল লাগিল না। টিফিনের

সময় বাহিরে গিয়া শুনিল,—আজ নম্বর 'গড়বড়' হয়ে গিয়েছে। সকালে সকলেই জান্তো ১০ উঠেছে, কিন্তু এখন আবার শুন্‌ছে ৫। এই ব্যাপারে নগেনের মনটা বড়ই দমিয়া গেল। আপিষের ছুটীর পর নগেন বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিল।

(৪)

আপিস হইতে বাড়ী আসিয়া নগেন শুনিল;—সুষমা বাপের বাড়ী গিয়াছে। ইহাতে তাহার রাগ আরও বাড়িয়া গেল।

নগেনের মা বলিলেন,—"বৌমার ভাই এসে অনেক ক'রে বল্‌লে যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রেখে যাইবে। তা বাবা, তুমি খাওয়া দাওয়া ক'রে একবার যাও; গিয়ে এখনই নিয়ে এস। তার দিদি অনেক দিনের পর কয়েক ঘণ্টার জন্য এসেছে; একবার দেখা ক'রবে বল্‌লে; আমি কি করে না বলি, বল!"

"এই খেটে-খুটে এসে এত রাত্রিতে কি আর ভবানীপুরে যাওয়া পোষায়? তোমাদের যেমন কাজ! চুলোয় যাক্—আমি আর এখন কোথাও যেতে পার্‌ব না। ভাত টাত খেয়ে নেওয়া যাক।"

এই বলিয়া নগেন একেবারে বিছানায় গিয়া শুইল।

খাওয়া-দাওয়ার পর মায়ের অনুরোধে নগেন ভবানীপুরের দিকে চলিল। ইহাতে তাহার নিজের ঠিক ইচ্ছা ছিল কি না, তা ভগবানই জানেন।

নগেন যখন শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছিল, তখন নগেনের শ্বশুর শ্যামাপদ বাবু সদর ঘরে বসিয়া মক্কেলদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। নগেনকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"এস বাবা, এস। ওরে হরে! বাড়ীতে খবর দে—জামাই বাবু এসেছে।"

ঠিক্ এই সময়ে বাড়ীর ভিতর হইতে ভয়ানক কান্নাকাটির শব্দ শুনা গেল। 'কি হলো কি হলো' বলিতে বলিতে শ্যামাপদ বাবু তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ক্রমে বাড়ী শুদ্ধ সকলেই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নগেন খানিকক্ষণ হতভম্বের মত বসিয়া থাকিয়া পরে ব্যাপার কি জানিবার জন্য বাড়ীর ভিতর গেল। গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বুকের মধ্যে হঠাৎ অত্যন্ত আঘাত লাগিল। দেখিল—চার পাঁচ জনে ধরাধরি করিয়া সুরমাকে দালানে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহার গলায় দড়ি জড়ান রহিয়াছে। দেহ একেবারে নিস্পন্দ। তখনই ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল। নগেন প্রথমে ভাবিয়াছিল,—তাহার দেখার ভুল হইয়াছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহার সে ভ্রম দূর হইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন—"আর আশা নাই! অনেকক্ষণ হইল প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে।"

নগেনের ভগ্ন-হৃদয় এই আকস্মিক দারুণ আঘাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল।

(৫)

পরদিন সকালে নগেন ভগ্ন হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল। সুরমার মৃত্যুর কথা শুনিয়া নগেনের মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করা দূরের কথা, নগেন নিজেই আপনার ঘরে গিয়া কাঁদিতে বসিল; ভাবিতে লাগিল,—"কেন এমন হইল? কৈ তাকে তো আমি তেমন কোনও কথা বলি নাই!" একবার ভাবিল,—"বোধ হয়, শ্বশুর বাড়ীতে কেহ কিছু বলিয়াছে। কিন্তু তাতে এমন হবে কেন?"

বেলা বাড়িয়া গেল। নগেনের সে দিন আর আপিস যাওয়া ঘটিল না। কোনও খবরও দেওয়া হইল না।

১১টার সময় ডাকপিয়ন আসিয়া নগেনের হাতে একখানি রেজেষ্টারি চিঠি দিল। শিরোনামা দেখিয়াই নগেন চমকিয়া উঠিল। এ কি! এ যে সুরমার হাতের লেখা! তবে কি সুরমা বেঁচে আছে? তাড়াতাড়ি টিকিটের উপর 'ডেট ষ্ট্যাম্প' দেখিল। তাহাতে বুঝিল, চিঠিখানা ৫টার সময় ভবানীপুরে পোষ্ট হইয়াছে। তখন ভাবিল,—'তা কি হয়! সে যে স্বহস্তে সুরমার মুখাগ্নি ক'রেছে।'

নগেন পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল। প্রথমেই দেখিল এক-খানা "তুলা-খেলার" রসিদ। ১০ নং এ ১৫৲ পনের টাকার দরে ১৫০৲ টাকা পাওয়া। অমনি যেন শত-বৃশ্চিক-দংশনের

মধ্যে শত্রুভাব পরিলক্ষিত না হইলেও, হরিশঙ্কর অন্তরে অন্তরে কালীশঙ্করের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। কালীশঙ্কর সদনুষ্ঠান দ্বারা যতই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিলেন, ততই তাঁহার প্রতি হরিশঙ্করের হিংসা-দ্বেষ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হরিশঙ্কর স্থির বুঝিলেন,—"কালীশঙ্করের যত সব সদনুষ্ঠান দয়া ধর্ম্ম—এক মাত্র দশ জনের নিকট হরিশঙ্করকে নির্ম্মম নিষ্ঠুর রূপে প্রতিপন্ন করিয়া অপদস্থ করার মতলব ভিন্ন আর কিছু নহে। নতুবা সাত আনা হিস্যার মালিক হইয়া কোন্ সাহসে দয়া-ধর্ম্ম দেখাইতেছে!"

নীচাশয় হরিশঙ্করের চক্ষে কালীশঙ্করের অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কালীশঙ্করের অনুষ্ঠিত এক একটী জনহিতকর কার্য্যের সংবাদ হরিশঙ্করের কর্ণগোচর হয়, আর অমনি হরিশঙ্কর নাসিকা কুঞ্চন ও [illegible] ভঙ্গ করিয়া মুখে বিড় বিড় করিতে থাকেন। তাঁহার [illegible] মুখমণ্ডলে ও ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয়ে রক্তিম-রাগ ফুটিয়া উঠে, কুঞ্চিত-ললাট-দেশে হিংসার জ্বলন্ত-বাহ্নি যেন ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে।

একদিন হরিশঙ্কর একাকী উপবিষ্ট। সহসা জনৈক ভৃত্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"দানধর্ম্মে ছোট কর্ত্তার কি দৃঢ়-মতিগতি! তিনি আজ দুইটী অনাথা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বহু টাকা খরচ করে সৎপাত্রে অর্পণ করেছেন! ভগবান তাঁহাকে—"

ভৃত্য তাহার বক্তব্য শেষ করিতে পারিল না।

হরিশঙ্কর মর্দ্দিত-লাঙ্গুল শার্দ্দূল-বৎ গর্জ্জন করিয়া হতভাগা ভৃত্যকে আক্রমণ করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েক ঘা বসাইয়া দিলেন।

ভৃত্য বিস্মিত স্তম্ভিত! অবশেষে, প্রভুদত্ত আঘাতের তীব্র স্বাদ অনেকক্ষণ নীরবে বহন করিতে না পারিয়া, বিকট-রবে চীৎকার করিয়া রঙ্গভূমি হইতে সরিয়া পড়িল!

তাহার বিকট চীৎকারে পরিবারস্থ বহু লোক সমবেত হইল।

হরিশঙ্কর পলায়িত ভৃত্যের উদ্দেশে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন,—"পাজি বেটার কতদূর বেয়াদবি দেখ! অকথ্য কথা আমার সমক্ষে প্রকাশ করিতে বেটার একটু সঙ্কোচ-বোধ হ'ল না!"

সমবেত পরিজনবর্গ প্রকৃত ব্যাপারখানা যে কি, বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হরিশঙ্করকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না।

হরিশঙ্কর ক্রোধ-বিকম্পিত পদে বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, হরিশঙ্কর-প্রদত্ত আঘাতের তীব্র স্বাদ হতভাগ্য ভৃত্যের হৃদয়ে অনেক দিন জাগ্রত ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিশঙ্কর বৈঠকখানায় ফরাসের উপর তাকিয়ায় পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া আলবোলার নল মুখে দিয়া মনের সুখে ধূমপান করিতেছেন! অদূরে পৃথক তক্তপোষে দুই জন আমলা হিসাবের খাতা লিখিতেছে।

এমন সময় দূরবর্ত্তী বিনোদপুর মহালের আট দশ জন প্রজা উপস্থিত হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া অভিবাদন করিল। ইহাদের অঙ্গ শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ বসন, মুখে দারিদ্র্যের কৃষ্ণছায়া পরিস্ফুট।

হরিশঙ্কর পলক-তরে চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া পূর্ব্ববৎ নীরবে ধূম-পান করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ পথপর্য্যটনে প্রজাগণ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত; তাহাদের পদযুগল দেহভার-বহনে অক্ষম। প্রজাগণ জোরে শ্বাস টানিয়া কক্ষতলে বসিয়া পড়িল। কিন্তু কেহই তাহাদিগকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অবশেষে নিধিরাম মণ্ডল সাহসে ভর করিয়া কক্ষতলে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে কহিল,—"হুজুর, আমরা বিনোদপুর মহালের নাতান প্রজা। বিপদে পড়ে মনিবের আশ্রয় ভিক্ষে করতে এসেছি।"

এই সময় হরিশঙ্কর উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন।

নিধিরাম বলিতে লাগিল,—"হুজুর, গেল বছর মোদের ভাল ফসল হয়-নি। ইহার উপর গো-মরকে হালের গরু সব মারা গেছে। টাকাকড়ি যোগাড় করে হালের গরু কিনতে পারি-নি; কাজেই এবার সময়-মত জমী আবাদ করতে পারি-নি। ভগবান মোদের উপর ষোল আনা বিমুখ। এবার যা কিছু ফসল হয়েছিল, বন্যার জলে তাও ভাসিয়ে নিয়েছে। গেল বছরকার খাজানা ধার কর্জ্জ করে মায় সুদ এক রকম আদায় দিয়েছি। কিন্তু হুজুর, এবার নিরুপায়! দুবেলা সকল দিন আহার জুটে না!"

বলিতে বলিতে ক্লান্তি বশতঃ নিধিরামের কণ্ঠ কম্পিত হইল। নিধিরাম বিশ্রাম-লাভ-মানসে ক্ষণতরে নীরব রহিল।

হরিশঙ্কর এতক্ষণ পরে মুখব্যাদান করিলেন। কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—"এ সব তো মামুলি কাঁদুনি। নূতন কিছু বলিবার থাকে তো গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে সংক্ষেপে বলে ফেল।"

দুঃস্থ প্রজাগণ এতক্ষণ যে ক্ষীণ আশাটুকু পোষণ করিয়া আসিতেছিল, হরিশঙ্করের কর্কশ স্বরে ও বিকৃত মুখ-ভঙ্গিতে সে ক্ষীণ আশাটুকু বিলুপ্তপ্রায় হইল।

ভয়ে ভয়ে নিধিরাম আবার বলিতে লাগিল,—"হুজুর, একে মোরা না খেতে পেয়ে মর্তে বসেছি, ইহার উপর নায়েব মশায় মাথট আদায় জন্য মোদের উপর বড়ই জোর জুলুম আরম্ভ করে দিয়েছেন। দু'দিন কাছারী-গারদে মোদের কয়েদ করে রেখেছিলেন। শেষে সিদ্ধি মণ্ডলকে জামিন দিয়ে খালাস পেয়ে তবে হুজুরের নিকট ছুটে এসেছি। হুজুর মা-বাপ, দয়া করে এবার রক্ষা করুন।"

হরিশঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার গুরুভার দেহের আন্দোলনে বিশাল ফরাস ভূমিকম্পবৎ কাঁপিয়া উঠিল! প্রজাগণের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল! নিধিরাম মণ্ডল সন্ত্রস্ত চিত্তে পশ্চাৎ সরিয়া পড়িল।

হরিশঙ্কর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—"পাজি বেটারা, বজ্জাতি করে এখানে মায়া-কান্না কাঁদতে এসেছিস্! যদি মাগ-ছেলে নিয়ে ভিটেয় থাকতে চাস্, তাহলে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে মাথটের টাকা দিয়ে ফেল্। নতুবা হাড়মাস শুদ্ধ ঠাঁই হবে, নিশ্চয় জানিস্।"

এই বলিয়া হরিশঙ্কর অদূরস্থিত জনৈক আমলাকে কহিলেন,—"রামতারণ, নায়েবের রিপোর্টখানি আর এক বার পাঠ কর দেখি।"

আদেশানুসারে নায়েবের প্রেরিত রিপোর্ট রামতারণ পাঠ করিতে লাগিলেন। যথা,—"হুজুরের আদেশের মর্ম্ম মহালের প্রজাবৃন্দকে বহু পূর্ব্বেই জানান হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত একটা প্রজাও মাথট দিতেছে না। যে সকল সাভান প্রজা অনায়াসেই মাথট আদায় দিতে সক্ষম, তাহারাও যখন হুকুম মত মাথট আদায় দিতেছে না, তখন নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে, প্রজাগণ মাথট না দেওয়ার পক্ষে জোটবন্দী হইয়াছে। হুজুরের আদেশ পালন করিতে না পারিয়া ভীত হইয়াছি। গ্রামের মণ্ডল প্রজাগণের কুপরামর্শেই প্রজাগণ এতদূর সাহসী হইয়াছে। বিনোদপুরের নিধিরাম মণ্ডল, শঙ্খগাছির কেনারাম, চণ্ডীগাছীর এনায়েত উল্লা প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রজা ভিতরে ভিতরে কুমন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। পরস্পর শুনিতে পাইলাম,—নিধিরাম মণ্ডল অপর কতিপয় প্রজা সঙ্গে করিয়া মাথট আদায়

মহকুপ পাইবার আশায় হুজুরের সদনে যাইতেছে। এক্ষণে যেরূপ আদেশ হয়। ইতি।"

আর কি রক্ষা আছে? জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল। হরিশঙ্করের ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্র চক্ষু হইতে অনল-কণারাশি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। নিধিরাম প্রভৃতি প্রজাগণের আত্মা-পুরুষ কাঁপিয়া উঠিল। ভীত সন্ত্রস্ত নিধিরাম ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহের এক প্রান্তে যাইয়া দাঁড়াইল। হরিশঙ্করের কর্কশ কণ্ঠ পঞ্চমে আরোহণ করিল। তাঁহার সে উচ্চ কণ্ঠ-নিনাদ নীরব রজনীতে অনেক দূর সংবাহিত হইল।

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"নিধে বেটার মাংস যে দিন কুকুরকে দিয়ে খাওয়াব, সে দিন দেশের লোক বুঝ্তে পার্বে, আমার হুকুমের বিরুদ্ধে গোপনে কুমন্ত্রণা করার পরিণাম-ফল কি ভয়ানক! রামতারণ, এখনই নায়েবের নামে পরোয়ানা লিখিয়া উপস্থিত কর।"

আজ্ঞামাত্র আজ্ঞাবহ ভৃত্য রামতারণ কাগজ কলম হস্তে পরোয়ানা লিখিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

হরিশঙ্কর বলিলেন,—"নায়েবকে লিখিয়া দাও, ঊর্দ্ধ সংখ্যা দুই সপ্তাহ মধ্যে মাথট কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া যেন ইরশাল করেন। যে সকল প্রজা মাথট দিতে আপত্তি করিবে, তাহাদের ঘর-বাড়ী পুড়াইয়া আমার এলাকা হইতে দূর করিয়া

দেওয়া হউক। আমি টাকা চাই; কৈফিয়ৎ চাই না। নায়েবকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দাও যে, আমার আজ্ঞা অপালনের পরিণাম-ফল নায়েবের পক্ষেও অণুমাত্র শুভ হইবে না।"

রামতারণ পরোয়ানা লিখিয়া উপস্থিত করিলে হরিশঙ্কর ক্ষিপ্রহস্তে তাহাতে খস্ খস্ করিয়া স্বাক্ষর করিলেন। নিধিরাম প্রভৃতি দুঃস্থ প্রজাগণের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পরোয়ানা প্রাপ্তি মাত্র দুর্দ্দান্ত নায়েব তাহাদের প্রতি কত যে অমানুষিক অত্যাচার করিবে, মনে করিয়া তাহারা শিহরিয়া উঠিল।

মনিবের দণ্ডের ভয় ভুলিয়া গিয়া নিধিরাম অগ্রসর হইয়া বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠে যুক্তকরে কহিল,—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! গরীব প্রজাকে রক্ষা করুন। রাক্ষস নায়েবের হস্তে ফেলিয়া আমাদিগকে প্রাণে মারিবেন না। আপনি মনিব, প্রজার মা-বাপ! ইচ্ছা হয়—আপন হাতে কেটে ফেলুন! এই শির পাতিয়া দিতেছি। হুজুরের পরোয়ানা পাইবামাত্র নায়েব আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া ঘর-দোরে আগুন ধরাইয়া দিবে,—স্ত্রী-কন্যার উপর জুলুম করিবে। কাল মাগ ছেলে উপবাসে আছে; আজ যে তাদের অদৃষ্টে কি ঘটেছে, বল্‌তে পারি-নে। আজ দিনমানের মধ্যে মোদের মুখে এক বিন্দুও জল পড়ে-নি। বড় আশায় না খেয়ে এই দীর্ঘ পথ হেঁটে মনিবের কাছে এসেছি। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!"

এই বলিয়া নিধিরাম ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গী অপর প্রজাগণও আবেগভরে কাঁদিতে লাগিল।

পাষাণ-হৃদয় হরিশঙ্কর অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। কহিলেন,—"বেটা পাজি, শৃগাল হয়ে বাঘের সহিত লড়াই করতে উদ্যত হয়েছিস্। নিজে মরতে বসেছিস, সঙ্গে সঙ্গে কুমন্ত্রণা দিয়ে অপর দশটা বোকা প্রজাকে মৃত্যুর মুখে টেনে নিচ্ছিস্? দেখ্‌বো—বেটাদের কে রক্ষা করে!"

নিধিরাম যুক্তকরে কহিল,—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! যদি কাউকে কুপরামর্শ দিয়ে থাকি, তবে জেন্ত কেটে ফেলুন—এখনি দণ্ড কবুল করিতেছি। বিনা দোষে প্রাণে মারিবেন না। নায়েব মিথ্যা করে মোদের বদ্‌নাম করেছেন।"

হরিশঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"বেটা, ছোট মুখে বড় কথা বল্‌তে আস্‌ছিস্! আমার নায়েব মিথ্যাবাদী, আর তুই বেটা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। জমাদার! এই বজ্জাত বেটাদের আমার চক্ষুর সম্মুখ হ'তে এখনি দূর করে দাও।"

জমাদার রামসিংহ আজ্ঞামাত্র নিধি প্রভৃতি প্রজাগণকে গলা ধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দিল।

শ্রান্ত ক্লান্ত প্রজাগণের মধ্যে দুইটী প্রজা প্রাঙ্গণ-তলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। নিধিরাম হাহাকার করিয়া উঠিল। রাম-সিংহের নিকট হইতে জল চাহিয়া লইয়া মূর্চ্ছিত প্রজাগণের

মুখ-চোখে সিঞ্চন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তাহাদের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। বহু কষ্টে উঠিয়া, প্রাঙ্গণ পার হইয়া, তাহারা পথিমধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর পর্য্যটন-ক্লান্ত প্রজাগণ অধিক দূর যাইতে পারিল না। তাহারা মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এত রাত্রে অপরিচিত স্থানে কোথায় কাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে, ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া পড়িল।

জমাদার রামসিং অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। নিধিরাম অগ্রসর হইয়া অশ্রু মার্জ্জনা করিতে করিতে রামসিংকে কহিল,—"জমাদার সাহেব! এ গরীব প্রজাগণের প্রতি তুমি একটু তাকাও। ভগবান তোমার প্রতি খুসী হইবেন।"

রামসিংহ কহিল,—"হামি কি কর্‌বে? হামি তো নকরি কর্‌তে আসিয়াছে! তোহাদের হামি কি কর্‌তে পারিবে।"

নিধিরাম কহিল,—"তোমার কাছে আর কিছু চাইনে; তুমি একবার হুজুরকে জিজ্ঞাসা করে এস, এই রেতের বেলায় কোথায় কার কাছে দু'টো খেতে পাবো! দেশে তো থাক্‌তে পাবো না, নিশ্চয়। কিন্তু আজকের মত আমাদের দু'টো খেতে দেন। শেয়াল-কুকুরে হুজুরের অন্ন খেয়ে বেঁচে আছে। আমরা প্রজা, মনিবের দুয়ার হতে উপোস করে চলে যাবো! ইহাই কি তাঁর হুকুম? এই কথাটী মাত্র তুমি জেনে এস।"

রামসিংহের পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইল। রামসিংহ হরিশঙ্কর সমক্ষে প্রজাদিগকে খাইতে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাইল।

হরিশঙ্কর তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"আমার গৃহে অন্নসত্র খুলি-নি। এখানে ও সব কিছু হবে না। বাজারে দোকান আছে, দোকানে চাল-ডাল কিন্‌তে পাওয়া যায়। বাজারে চলে যেতে বল্‌গে। ফের আমাকে যেন একই বিষয়ে বিরক্ত কর্‌তে এস না!"

রামসিং যাইয়া প্রজাগণের নিকট হরিশঙ্করের আদেশের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিল। নিধিরাম হতাশের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অনেকক্ষণ পথিমধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল! অবশেষে তাহার মনে পড়িল যে, কালীশঙ্করের কতিপয় প্রজা, ইহাদের সঙ্গে খাজনা মহকুপের প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া নিধিরাম মনে মনে স্থির করিল যে, ছোট কর্ত্তার সরকারে যাইয়া তাহার গ্রামবাসিগণের সহিত মিলিয়া কোনরূপে রাত্রিটা কাটাইয়া দিবে। এই স্থির করিয়া নিধিরাম সঙ্গিগণের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিল। শুনিয়া জনৈক সঙ্গী কহিল,—"আপন মনিব শেয়াল-কুকুরের ন্যায় তাড়িয়ে দিলেন। ছোট কর্ত্তার কাছে কোন্ মুখে আশ্রয় প্রার্থনা কর্‌ব? আমরা তাঁর প্রজা নই; তিনি যে আশ্রয় দিবেন, কেমন করে বিশ্বাস কর্‌ব?"

নিধিরাম কহিল,—"আয় না একবার গিয়েই দেখি। সেথানেও স্থান না পাই, গাছতলা তো আছেই! ছোটকর্ত্তার দয়ার শরীর। আমার মন ডেকে বল্‌ছে—ছোট কর্ত্তার ঘরে আমরা স্থান পাবো।"

"তবে চল"—এই বলিয়া সকলে কালীশঙ্করের গৃহাভিমুখে রওনা হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিশঙ্করের ভার্য্যা জয়সুন্দরী জনৈক ঝির মুখে শুনিতে পাইলেন,—বিনোদপুর-মহালের কতিপয় প্রজাকে বড়-কর্ত্তা এই রাত্রি-বেলায় দূর করিয়া দিয়াছেন। তাহারা সারাদিন উপবাসী। কয়টী অভুক্ত প্রাণীকে সেই রাত্রিকালে গৃহস্থ-ভবন হইতে বিদূরিত করা মহা অধর্ম্ম। জয়সুন্দরীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

তিনি সুন্দরী ঝিকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার হস্তে এক ধামা চিড়া-মুড়কি ও দুইটী টাকা দিয়া কহিলেন,—"বিনোদপুর-মহালের প্রজাদিগকে দিয়ে আয়। আহা! উহারা সারাদিন পথ চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; পথে কিছু খায়-নি। উহাদিগকে বলিস্, চারটী চিড়া-মুড়কি মুখে দিয়ে এই টাকা দুটীতে দোকান থেকে চাল ডাল কিনে রান্না করে খাওয়া-দাওয়া সেরে দোকানেই যেন শুয়ে

থাকে। আর আমার হয়ে উহাদিগকে বলিস্,—রাগের বশে মনিব দুটা শক্ত বলেছেন, উহারা যেন মুন্নি না করে। দেখিস্, কর্ত্তা যেন ঘূণাক্ষরে জান্‌তে না পারেন।”

চতুরা সুন্দরী-ঝি কহিল,—“তা, মা-ঠাকরুণ, জান্‌তে না দিলে কর্ত্তা কেমন করে জান্‌তে পার্‌বেন? তুমি মা নিশ্চিন্ত থাক। আহা! মা-ঠাক্‌রুণের কি দয়ার শরীর!”

এই বলিয়া সুন্দরী-ঝি টাকা দুটা অঞ্চল-কোণে বাঁধিয়া ধামা হস্তে যাত্রা করিল। পাছে কর্ত্তা জানিতে পারেন,—এই আশঙ্কায়, জয়সুন্দরী অস্থির-চিত্তে সুন্দরী ঝির নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সুন্দরী-ঝি বহির্ব্বাটীতে যাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের বারেন্দার উপর ধামাটী রাখিয়া বৈঠকখানার দিকে চলিল। বৈঠকখানার মুক্ত-বাতায়ান-পথে উঁকি মারিয়া দেখিল,—গৃহাভ্যন্তরে হরিশঙ্কর ও দুইটী আমলা ভিন্ন অপর একটী প্রাণীও নাই। সুন্দরী ইহার পর জমাদার রামসিংহের সন্ধানে চলিল। জমাদার সাহেবের বাস-ভবন,—বৈঠক-খানা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে।

সুন্দরী-ঝি, জমাদার সাহেবের গৃহদ্বারে যাইয়া দেখিল,—জমাদার সিদ্ধি-সেবনে মজগুলচিত্তে দড়ির ছাউনি দেওয়া বংশ-নির্ম্মিত খাটিয়ায় বসিয়া রাসভ-স্বরে ভজন-গান করিতেছে। সুন্দরী-ঝির আগমনে চকিতে জমাদার সাহেবের ভজন-গীতির বিরতি হইল।

বিকট হাস্য করিয়া জমাদার সুন্দরী-ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"রূপ-ঝি, তবে কি মনে করে?"

সুন্দরী-ঝি, জমাদারের প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল,—"আর কি মনে করে! অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই। আজ এখন সময় পেয়েছি; তাই তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি।"

"বেশ—বেশ! বড্ড সুখবর শুনালে। গোলামকে যে মনে রাখিয়াছ, গোলামের নছিবের জোর কহিতে হইবে।"

সুন্দরী।—"তোমায় কি ভুল্‌তে পারি? তুমি যেমন ভুলে যাও। আমরা মেয়ে-মানুষের জাত;—মনের মত মানুষ পেলে, তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুল্‌তে পারি না। যাক্, এত রাত্ হয়েছে, এখনও ঘুমাওনি কেন?"

জমাদার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল,—"রূপ-ঝি আমার শয়ন ভোজন সকলই তুমি। আঁখি মুদিলে তোমারই চন্দ্রবয়ান মনে পড়ে; আর নিদ হতে চম্‌কে উঠি।"

সুন্দরী মৃদুহাস্য-সহকারে কহিল,—"ইস্! এত! যাও! জানি—জানি! তুমি যত আমায় মনে কর, তা ভগবানই জানেন। আচ্ছা, যাক। আজ ক'টাকা পেলে?"

জমাদার কহিল,—"কৈ, আজিকার দিনটা একেবারে বর-বাদে গিয়েছে; একটা আধেলাও আজ মিল্‌ল না!"

সুন্দরী বিস্মিতভাবে কহিল,—"বল কি! তবে না বিনোদ-পুরের প্রজারা এসেছিল? কর্ত্তা নাকি তাদের জুতা পেটা ক'র্‌তে তোমায় হুকুম দিয়েছিলেন? আমি তো মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছি, এই সুযোগে তুমি দু'চার টাকা মেরে নিয়েছ! ওরা কোথায়? ওদের কি কয়েদ রেখেছ?"

জমাদার।—"না, রূপ-ঝি! কর্ত্তা তাদের তাড়িয়ে দিল, আমি আর কি করে টাকা পাব। আজ রাতটা যদি থাকৃত, তাহলে কিছু-না-কিছু আদায় কর্‌তে পার্‌তাম।"

সুন্দরী।—"ওরা কোথায় গেল? ওদের কি কিছু খেতে দিয়েছিলে?"

জমাদার।—"কর্ত্তা কিছুতেই উহাদের খাইতে দিল না। আমি আর কি কর্‌ব।"

সুন্দরী দুঃখের ভাণ করিয়া কহিল,—"তবে তো সত্যি সত্যি আজ তোমার কু-প্রভাত হয়েছিল! একটী কাণা কড়ি পর্য্যন্ত পাও-নি?"

এই বলিয়া অনুরাগগ্রস্ত জমাদারের প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মুচকি হাসিয়া কহিল,—"তবে এখন আসি।"

জমাদার ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল—"রূপ-ঝি, যদি দয়া করিয়া আসিয়াছ, তবে আর আধা ঘড়ি-খানেক বসিয়া যাওনা কেন? আমাকে জীবন-ভোর কেবলই কি কাঁদাবে?"

সুন্দরী-ঝি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"না, তোমায় আর কাঁদাব না। অনেক কাঁদিয়েছি, তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে।"

জমাদার পুলক-বিহ্বল চিত্তে হাঁ করিয়া সুন্দরী-ঝির মুখপানে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। জমাদার যেন স্বর্গের চাঁদ সদ্য সদ্য হাতে পাইল। আনন্দ-বিহ্বল-চিত্তে কি বলিতেছিল। প্রাণের কথা জিহ্বাগ্রে রহিয়া গেল। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। জমাদারের ব্যগ্র-নয়ন সুন্দরীর পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল।

যাইতে যাইতে সুন্দরী আপন মনে বলিতে লাগিল,—"পোড়ার মুখো মিন্সের কেমন আস্পর্দ্ধা! এই তো রূপ! রূপের বালাই লয়ে মরি। মাথায় টাক, হুলা-বিড়ালের ন্যায় লম্বা লম্বা গোঁপ; গাল-ভরা দাড়ি; মিট্‌মিটে কটা চোখ!—কি বিতিকিচ্ছি চেহারা! মিন্সের বামন হয়ে চাঁদ ধর্‌তে সাধ! আমি সুন্দরী-ঝি, যার রূপের খ্যাতি ঘরে ঘরে, কত সুপুরুষ রসিক জন যার কৃপা-ভিখারী; সে কিনা জমাদারের ন্যায় একটা মর্কট বানরকে চরণে আশ্রয় দিবে?—অসম্ভব!"

জমাদারের প্রভাত কু বা সু যাহাই হউক না কেন, কিন্তু সুন্দরী-ঝির সত্য সত্য আজ সুপ্রভাত হইয়াছিল। সুন্দরী অনায়াস-লভ্য এক ধামা চিড়া-মুড়্‌কি আত্মসাৎ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া, অদূরবর্ত্তী এক প্রতিবেশিনীর গৃহে উপস্থিত হইল। উন্মুক্ত-দ্বার, গৃহমধ্যে এক পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্কা রমণী আপন মনে

গুণগুণ-স্বরে গান করিতেছিল। কে জানে, তাহার প্রাণের ভিতর কত কি ভাবের লহরী খেলিতেছিল।

সুন্দরী-ঝি ক্ষিপ্রগতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—"সই, আমার ধামাটী যত্ন করে রেখে দিও। দেখিও, খাবার জিনিষগুলি নষ্ট না হয়। এখন আর কোনও কথা নয়। রাত পোহালে সব বল্‌ব।"

এই বলিয়া সুন্দরী চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সুন্দরী ফিরিয়া আসিল। জয়সুন্দরী সুন্দরীকে দেখিয়া কহিলেন,—"আগে বল্ দেখি বাছা, প্রজাদের জলখাবার-গুলি ও টাকা দুইটী দিয়ে এসেছিস্ তো!"

সুন্দরী।—"ও মা, সে কি কথা গা! দিয়ে আসি-নি! তবে কি আমি সেগুলি খেয়ে ফেলেছি! এই দেখ না!"

এই বলিয়া সুন্দরী আপন অঞ্চল-প্রান্ত ঝাড়িয়া দেখাইল; বলিল,—"দেখ্‌লে তো মা, খেয়েও ফেলি নি, বেঁধেও আনি-নি।"

জয়সুন্দরী ধীর-কণ্ঠে কহিলেন,—"আমি তো বাছা তোর উপর কোনও সন্দেহ করি-নি! মিছামিছি কেন কথা বাড়াস্।"

সুন্দরী কহিল,—"কাকে সন্দেহ ক'র্‌বে, মা? আমি কি সন্দেহ করবার লোক! যদি তেমন লোক বলেই জান, তবে মা

এখনি বিদেয় করে দাও! গতর খাটিয়ে খাওয়া বৈ তো নয়! মুখের কথা ছাড়বামাত্র ঢের ঢের গেরস্থ লুফে নেবে।"

সুন্দরী ঝির ভাবগতিক দেখিয়া জয়সুন্দরী অবাক হইয়া গেলেন। ক্ষণেক পর কহিলেন,—"অত বক্‌ছিস্ কেন? প্রজাদের খাবারগুলি দিতে গিয়ে না জানি কর্ত্তার কাছে ধরা পড়েছিস্, এই ভয়ে এতক্ষণ কত ভাবনা হয়েছিল। আমি তো বাছা তোকে অনুযোগ করি-নি?"

সুন্দরী-ঝি।—"সুন্দরী-ঝি অনুযোগের লোক কিনা, তাই অনুযোগ ক'র্‌বে! বল তো মা-ঠাক্‌রুণ! কালে ভদ্রে কবে কোন্ মন্দ কাজ করেছি?"

জয়সুন্দরী।—"যা—যা, খাওয়া দাওয়া সেরে শোগে যা।"

সুন্দরী।—"শোব না তো কি পাড়ায় পাড়ায় বেড়াতে যাব? আমি পাড়া-বেড়ানি কিনা, তাই রেতের বেলায় পাড়া বেড়াতে যাব! ছি—ছি! কি ঘেন্না!—কি ঘেন্না! আমরা দাসী বাঁদী বলে, মনিব তুমি যা খুসি তা বলে ফেল! তুমি মনিব, দুটো মন্দ বল্‌লে, সয়ে নিলাম। কিন্তু দশে পাঁচে শুন্‌লে কি মনে কর্‌বে? মনে ক'র্‌বে না কি যে, মাগীর সোমত্ত বয়স;—লাজ নেই, সরম নেই, জাত-কলঙ্কের ভয় নেই; রেতের বেলায় পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে কত কি অকম্ম কুকম্ম করে! কি লজ্জা!—কি লজ্জা! আমি যাব কোথা!"

জয়সুন্দরী রাগ করিতে জানেন না। ঝি-চাকরেরা বেশী বাড়াবাড়ি করিলে তিনি ইচ্ছা করেন যে, রাগ করিবেন—তাহাদিগকে শাসন করিবেন। কিন্তু কেমন তাঁহার স্বভাব, কাহাকেও ক্রোধভরে কোনও কথা বলিতে পারেন না। সুন্দরী ঝির আচরণে তিনি বিরক্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাহাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিতে পারিলেন না। সুন্দরী-ঝির প্রথর রসনা কলের গাড়ীর ন্যায় কেবলই চলিতে লাগিল।

অবশেষে জয়সুন্দরী বিরক্তিভরে কহিলেন,—"পোড়ারমুখী, বড় বাড় বেড়েছিস! ফের কথা বল্‌বি তো দেখ্‌বি।

এই বলিয়া জয়সুন্দরী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

জয়সুন্দরী চলিয়া গেলে, সুন্দরী-ঝি আপন মনে হাসিতে হাসিতে কহিল,—"চিড়া-মুড়কি ও টাকা দুইটী হজম কর্‌তে গিয়ে, কথার তুবড়ী ছুটাইয়া মা ঠাক্‌রুণের সন্দেহ করার পথ বন্ধ করে দিয়েছি। বলিহারি বুদ্ধি! ঝক্‌ঝকে আস্ত দুটী টাকা, আর টাট্‌কা টাট্‌কা চিড়া-মুড়কি অনায়াসে লাভ হল। কর্ত্তা যেরূপ, মা-ঠাক্‌রুণ তেমন হলে আমাদের এ বাড়ীতে তিষ্ঠান ভার হত। মা-ঠাক্‌রুণের স্নেহ-মমতায় দাসী-বাঁদীরা এ গৃহে টিকিয়া আছে। মা-ঠাক্‌রুণের ন্যায় মনিব সচরাচর জুটে না। মা আমার রূপে গুণে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। এত যে আবল-তাবল কত কি বক্‌লেম, কৈ, মা-ঠাক্‌রুণ তো রাগ কর্‌লেন না! অন্য মনিব হ'লে ঝাঁটা

মেরে মুখ ভোঁতা করে দিতেন। কিন্তু কেমন যে বিধাতার বিচার! —এমন সোণার প্রতিমাকে কিনা একটা রাক্ষসের ঘর ক'রতে হয়েছে। দয়া নেই, মমতা নেই, দান নেই, ধর্ম্ম নেই, কথাবার্ত্তা কাট কাট। কেবল টাকা—কেবল টাকা! যক্ষি—যক্ষি! এমন স্বামীর হাতে প'ড়ে কে কবে সুখী হতে পারে! মা-ঠাকুরুণ কর্ত্তার আচার-ব্যাভারে বুকে ব্যথা নিয়ে রাত দিন ভাব্‌তে ভাব্‌তে শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেলেন! কিন্তু আমি সুন্দরী-ঝি, নিশ্চয় বল্‌ছি—মা-ঠাকুরুণ যদ্দিন বেঁচে আছেন, এ বাড়ীর লক্ষ্মী-শ্রী তদ্দিন বজায় থাক্‌বে। মা-ঠাকুরুণের যদি ভাল মন্দ হয়, তা হ'লে এ বাড়ী দু'দিনে শ্মশান হবে! যাই—চাট্টি খেয়ে একটু শুইগে যাই।

এই বলিয়া সুন্দরী কি বিড়বিড় করিতে করিতে রান্না-ঘরে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কালীশঙ্কর রায় কাছারি-গৃহে উপবিষ্ট। কক্ষতলে কতিপয় প্রজা মাদুর-শয্যায় বসিয়া আপন আপন প্রার্থনা গোচর করিতেছে। কক্ষান্তরে আমলাগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদনে নিরত। এমন সময় বিনোদপুর মহালের তাঁহার নিজ জিম্মার কতিপয় প্রজা কাছারি-গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি-ভরে অভিবাদন করিল। কালীশঙ্কর রায় তাহাদের নিকট স্থানীয় স্বাস্থ্য ও ফসলাদির অবস্থা-সংক্রান্ত কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পরিণাম।

কেনারাম মণ্ডল বিনীতভাবে যুক্তকরে কহিল,—"হুজুর, ফসলের অবস্থা ও আমাদের দুর্দ্দশার কাহিনী গোচর করতেই মনিবের সাক্ষাৎ এসেছি। গেল বৎসর ফসল হয়-নি। বিলাটী জমী দেবতার জল অভাবে জ্বলে গিয়েছিল। ইহার উপর গো-মরকে চৌদ্দ আনা গরু মারা গেছে। এক এক জন গৃহস্থের খালি গোয়াল-ঘর দেখে চক্ষের জল ধরে রাখা দায়। হালের গরু অভাবে এ বছর ঠিক সময়ে ফসল বিনাট করতে পারি নি। যা কিছু আউস ধান হয়েছিল, বন্যার জলে ভাসিয়ে নিয়েছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে হাহাকার। বার-আনা আন্দাজ প্রজার দু'বেলা ভাত জুটে না। এর মধ্যেই অনেককে উপোস করতে হয়েছে। দেবতার কোপে আমরা গরীব প্রজা মরবার পথে দাঁড়িয়ে আছি। তিন তিন সনের খাজানা বাকি। নায়েব মশায় খাজানা তলব করছেন। নিরুপায় হয়ে হুজুরের কাছে এসেছি। হুজুর মা-বাপ! রাখতে হয় রাখুন, না হয়—যমের হাতে তুলে দিন। প্রজা আমরা, সব তাতেই প্রস্তুত আছি।"

কেনারাম মণ্ডল নীরব হইল। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া কালীশঙ্কর ব্যথিত হইলেন; কহিলেন,—"কেনারাম, তবে তো তোমরা বড় কষ্টে পড়েছ!"

এমন সময়ে হরিশঙ্করের বিতাড়িত প্রজাগণ কাছারি-গৃহে প্রবেশ করিল।

কালীশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহারা কে? কি প্রয়োজনে আসিয়াছে?"

কেনারাম কহিল,—"ইহারা বড়কর্ত্তার প্রজা; ইহাদের অবস্থাও আমাদেরই মত। মনিবের কাছে দুঃখ-দুর্দ্দশা গোচর কর্‌তে এসেছিল।"

কালীশঙ্কর কহিলেন,—"উত্তম, ইহাদিগকে বস্‌তে বল। কেনারাম, তোমাদের প্রার্থনা শুনে রাখ্‌লেম। তোমরা দীর্ঘ পথ হেঁটে হয়রাণ হয়েছ। খাওয়া-দাওয়া সেরে আজকের মত বিশ্রাম করগে। কাল প্রাতে আমার হুকুম পাবে।"

কেনারাম কহিল,—"হুজুর, আপনি আমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর কর্‌লেন কি না, ইহা জান্‌তে না পার্‌লে, মুখে গ্রাস তুল্‌তে পার্‌ব না। হুজুর, দয়া করে হুকুম শুনিয়ে দিন, আমরা নিশ্চিন্ত মনে পেট পূরে খেয়ে শুয়ে থাকিগে। হুজুর, অনেক দিন পেট পূরে খেতে পাই-নি। এই তিন বছর আধ পেটা খেয়ে কোনরূপে প্রাণে বেঁচে আছি।"

কালীশঙ্কর, কক্ষান্তরে উপবিষ্ট জনৈক আমলাকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন যে, নায়েবকে লিখিয়া দাও,—"বিনোদপুর মহালের প্রজাগণের দেয় হাল-বকেয়া খাজনা এবারকার মত মহকুপ রহিল। ইহারা আমার চির-অনুরক্ত। ইহারা কোনও কালেও খাজনা বাকি রাখে নাই। গত দুই বৎসর, ইহাদের ফসল

হয় নাই ; কাজেই ইহারা নিরুপায় হইয়া খাজনা বাকী রাখিতে বাধ্য হয়েছে। যখন সংস্থান হইবে, তখন ইহারা খাজনা আদায় দিবে।' আর একটী কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়া দাও যে,—'আমার প্রজাগণের মধ্যে একটী প্রাণীও যেন অনাহারে মারা না যায়। তৎপ্রতি যেন নায়েব নিয়ত লক্ষ্য রাখেন। তেমন কাহারও অবস্থা ঘটিলে, সরকারী তহবিল হইতে যেন সাহায্য করা হয়।"

হুকুমের মর্ম্ম অবগত হইয়া কেনারাম-প্রমুখ প্রজাগণ আনন্দ-ভরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অপরদিকে হরিশঙ্করের বিতাড়িত নিধিরাম প্রভৃতি আপন মনিবের নিষ্ঠুরতা ও ছোটকর্ত্তার প্রজা-গণের উপর পিতৃবৎ দয়ার বিষয় ভাবিয়া অন্তর্দাহনা করিতে লাগিল। এমন পাষণ্ড-হৃদয় মনিবের এলাকায় বাস করিতে হইতেছে বলিয়া, তাহারা আপন আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার

আদেশানুসারে আমলা নায়েবের নামে পরোয়ানা লিখিয়া উপস্থিত করিলে, কালীশঙ্কর দস্তখত করিয়া দিলেন।

কালীশঙ্কর জানিতেন যে, হরিশঙ্কর প্রজাগণকে কখনও সরকার হইতে খাইতে দেন না। তিনি নিধিরাম প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহাদের খাওয়া-দাওয়া হইয়াছে কিনা।"

উত্তরে নিধিরাম জানাইল যে,—"ইহাদের এখনও আহার হয় নাই।"

কালীশঙ্কর, কেনারাম মণ্ডলকে কহিলেন,—"তবে তোমাদের সঙ্গেই উঁহাদের রান্না করিও। আমাদের উভয় সরকার তো একই বটে!"

নিধিরাম মণ্ডল দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে কহিল,—"হুজুর, আপনারা উভয়েই আমাদের মনিব। মহাল বাটোয়ারার পূর্ব্বে তো আমরাও হুজুরের প্রজা ছিলাম! আমাদের কপাল মন্দ! তাই বড়কর্ত্তার অংশে আমাদের জমীজমা পড়েছে। রামরাজ্যে বাস করা আমাদের অদৃষ্টে নাই। আর হুজুরের—"

কালীশঙ্কর বাধা দিয়া কহিলেন,—"আর দেরি করিও না। ভাণ্ডার হইতে চাল ডাল লইয়া রান্নার উদ্যোগ দেখ।"

ইহার পর কালীশঙ্কর ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া কুড়ি জন প্রজার চাল, ডাল ও তরকারি দিতে আদেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে প্রজারা বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

রসনা-পরম্পরায় এ সংবাদ হরিশঙ্করের কর্ণে সংবাহিত হইল। তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"ইহা আর কিছুই নহে। আমার প্রজাগণের নিকট আমাকে হৃদয়হীন ও কৃপণাধম প্রতিপন্ন করিয়া আমার প্রতি প্রজাগণের বিদ্বেষ বিরাগ জন্মাইয়া দেওয়া; আর নিজের যশঃ-খ্যাতি প্রচার করা। দশ জনে জানুক,—ছোট-

কর্ত্তা দয়ার অবতার; পরের প্রজাকেও অকুণ্ঠিত-চিত্তে খাইতে দেন। তাহা না হইলে আমার প্রজা, আমার দয়া হ'ল না, ক্ষুদ্র তুচ্ছ ওর দয়া হ'ল! আচ্ছা দেখ্‌ব! এইরূপ দান ও দয়ার কার্য্য কতদিন নির্ব্বিঘ্নে চলে। ফেলেকে পথের ভিখারী করে তবে ছাড়ব। আর সেই দুষ্ট পাজী প্রজাগণ একমাত্র আমার অপযশ রাষ্ট্র করার মানসে ছোটকর্ত্তার কাছে কাঁদ্‌তে গিয়েছিল; তা নইলে এক রাত্রি না খেয়ে থাকা কারো পক্ষে অসম্ভব বা অসাধ্য নয়! এমন তো অনেকেই ঘটনা-বশতঃ এক বেলা কি দু'বেলা উপোস ক'রে থাক্‌তে বাধ্য হয়! বেটারা যেমন পাজী, যেমন আমার কলঙ্ক প্রচার কর্‌তে একটুকু ইতস্ততঃ করে নাই, তেমন বেটাদের সর্ব্বাগ্রে দেশ-ছাড়া ক'রে তবে আমার অন্য কাজ।"

সেই মুহূর্ত্তে হরিশঙ্কর, বিনোদপুর মহালের নায়েবের উপর কড়া পরোয়ানা প্রেরণ করিলেন,—"দুষ্ট প্রজাগণকে যে উপায়ে হউক, দেশ ছাড়া করিতে নায়েব যেন অণুমাত্র ইতস্ততঃ না করেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা মামলা-মকদ্দমার ভয়ে যেন তাঁহার আদেশ-পালনে ত্রুটি না হয়।"

যথাকালে পরোয়ানা নায়েবের হস্তগত হইল। মনসা-দেবী ধূপ-ধূনার গন্ধ পাইলেন; আর কি রক্ষা আছে? হতভাগ্য প্রজাগণ নায়েবের অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া

ঘর-দ্বার ফেলিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। নায়েব তাহাদের যথা-সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল। জোত-জমা সরকারের খাসভুক্ত হইল। প্রজাগণের বাগানের ফলাদি নায়েব-গৃহিণীর রসনার তৃপ্তি-সাধনে পর্যাবসিত হইল। দুগ্ধবতী গাভী সকল দুগ্ধদানে নায়েব নন্দনগণের দেহের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। নায়েবের মহেন্দ্রযোগ উপস্থিত। দক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া হরিশঙ্কর নায়েবকে আশাতিরিক্ত পুরস্কৃত করিলেন। মহালে দানবের নৃত্যাভিনয় চলিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরিশঙ্কর নিভৃত-কক্ষে জনৈক প্রিয় কর্ম্মচারীর সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন। অনেকক্ষণ মন্ত্রণা চলিতে লাগিল।

অবশেষে হরিশঙ্কর কহিলেন,—“দেখিও—যেন ভুলিও না। শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, তোমাকে প্রস্তাবিত কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিতে হইবে, প্রতি মুহূর্ত্তে ইহা মনে রাখিও। বলা বাহুল্য যে, এই কার্য্যটী সুচারুরূপে শেষ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতে পারিলে, তোমাকে প্রচুররূপে পুরস্কৃত করিব। তুমি জান যে, বিশ্বস্ত কর্ম্ম-চারীর কার্য্য-দক্ষতা আমার নিকট কখনও অপুরস্কৃত থাকে না।

কর্ম্মচারী কিয়ৎক্ষণ আপন মনে চিন্তা করিয়া কহিল,—“মনিবের আদেশ-পালনে কখনও ত্রুটি কর্‌ব না। কিন্তু—”

হরিশঙ্কর বাধা দিয়া কহিলেন,—“ইহাতে আবার কিন্তু কি?

তুমি কি প্রস্তাবিত কার্য্যটী দুঃসাধ্য মনে কর? তা যদি ক'রে থাক, তবে তোমার বড় ভুল।"

কার্য্যটী প্রকৃতই গুরুতর। অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য বটে। হরিশঙ্কর কোনও কাজই অসাধ্য বা দুঃসাধ্য মনে করেন না। তাঁহার ধারণা, যাহার লোক-বল ও অর্থ-বল আছে, জগতে কোনও কার্য্য তাহার নিকট অসাধ্য নহে। অসাধ্য দুঃসাধ্য অসম্ভব প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ একমাত্র অভিধানের কলেবর-বর্দ্ধক।

কর্ম্মচারী বিনীতভাবে কহিল,—"আপনি যাহার নাম করিলেন, তাহাকে প্রস্তাবিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করান সহজ হইবে না। নিরীহ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি সহজে কি এমন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে? যদিও ভয়ে ভয়ে আপাততঃ সম্মত হওয়া বিচিত্র নহে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাল ঠিক রাখা সন্দেহস্থল।"

হরিশঙ্করের মুখভঙ্গী বিরক্তিভাব ধারণ করিল। তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কণ্ঠে কহিলেন,—"তুমি লোকচরিত্র-পাঠে অনভ্যস্ত বলিয়া এরূপ সংশয়াশঙ্কা পোষণ করিতেছ। যথার্থ ধর্ম্ম-ভীরু লোক বিষয়-জগতে অতি দুর্লভ। অনেকে ধর্ম্মের ভাণ করে। স্থূলদৃষ্টি মানুষ তাহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিণামে অনেক স্থলেই প্রতারিত হয়। অর্থের মোহিনী-শক্তি অতি প্রবল। চক্‌চকে রজত-মুদ্রা চক্ষু সমক্ষে ধারণ করিলে অনেকেরই ধর্ম্মজ্ঞান বন্যার স্রোতে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যায়।"

হরিশঙ্কর আরও বলিলেন,—"জীবনে তিনি অনেকেরই ধর্ম্ম-জ্ঞান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষার ফলে একটীও খাঁটী বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। তিনি বহু ধর্ম্ম-ভীরু লোককে গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। আর্থিক পুরস্কার অতি অল্প লোককেই প্রদত্ত হইয়াছে। এ সকল বিষয়ে বংশদণ্ডই অতি কার্য্যকরী। তিনি কর্ম্মচারীকে সতর্ক করিয়া দিলেন, সহজে কোনও আর্থিক পুরস্কার স্বীকার করা না হয়। বংশদণ্ডের সাহায্যে ঠাণ্ডা গারদের ব্যবস্থা ভ্যাস দ্বারা তাহাকে কার্য্য সুপ্রবৃত্ত করিতে হইবে। ইহাতেই কর্ম্মচারীর কার্য্য-কৌশলের ও কৃতিত্বের পরীক্ষা পাওয়া যাইবে।

কর্ম্মচারী কহিল,—"যে আজ্ঞে, তাহাই হইবে। অত্যাচার-উৎপীড়নের ভয় প্রদর্শন দ্বারাই কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিব।"

"কেবল ভয় প্রদর্শন নহে; আবশ্যক হইলে, সত্য সত্যই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।"

এই বলিয়া হরিশঙ্কর ঈষৎ হাস্য-সহকারে কর্ম্মচারীর প্রতি এক গর্ব্বাত্মক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

হরিশঙ্কর অবশেষে কহিলেন,—"আমার সমস্ত কর্ম্মচারীর মধ্যে একমাত্র তোমাকেই বিচক্ষণ কার্য্য-কুশল বলিয়া জানি। তোমার কার্য্য-নৈপুণ্য বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষিত। তুমি মন-প্রাণে যত্ন করিলে, যত কেন গুরুতর ও সঙ্কটসঙ্কুল কার্য্য হউক না কেন, অচিরে তাহা

অল্পায়াসে সুসম্পন্ন হইবে। তুমি জান না যে, এত কাল কি এক তীব্র অনল হৃদয়-মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া আসিতেছি। যে দিন—থাক্, এক্ষণে আর সে কথা ব'লে কাজ নেই। সময় পাইলে বুক চিরিয়া তোমায় দেখাইব।"

ইহার পর কর্ম্মচারী বিদায় গ্রহণ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হরিশঙ্কর, চিন্তাভারগ্রস্ত-চিত্তে পর্য্যঙ্ক-শয়নে অঙ্গ ঢালিয়া, আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ভূত ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের কত ঘটনার ক্ষীণ স্মৃতি তাঁহার হৃদয় মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই একটার পর একটা—শত চিন্তা তাঁহার হৃদয় দ্বারে উঁকি মারিতে লাগিল।

অতীতের কুক্ষিগত বাল্যকালের কত ক্ষীণ স্মৃতি আজ যেন উজ্জ্বলরূপে তাঁহার মনশ্চক্ষু সম্মুখে প্রতিফলিত। বাল্যে কে কখন তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিল, রহস্যচ্ছলে কে কখন তাঁহার প্রতি বিদ্রূপের তীব্র বাণ বর্ষণ করিয়াছিল, কখন কোন্ ক্রীড়াভূমে কোন্ বালক তাঁহার অপেক্ষা সমধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল, পঠদ্দশায় বিদ্যালয়ে পাঠ বলিতে না পারায় শিক্ষক মহাশয় কোন্ দিন তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছিলেন, কালীশঙ্কর অনর্গল পাঠ বলিতে পারিয়া কেমনভাবে শিক্ষকের

প্রশংসা-বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে সহপাঠিগণের শ্রদ্ধানুরাগ অর্জ্জন করিয়াছিল এবং তাহার আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপ কখন্ কোন্ দুষ্ট বালক তাঁহার প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টির সহিত বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তাঁহাকে মর্ম্মপীড়িত করিয়াছিল,—এইরূপ কত দিনের কত ঘটনার স্মৃতি তাঁহার মানস-পটে চিত্রিত হইল। বাল্যে তিনি যে ঘটনা বা ঘটনার স্মৃতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে ব্যগ্র ছিলেন, কাল সাহচর্য্যে আজ সে সকল স্মৃতি বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট কলেবরে গুরুভারে তাঁহার বক্ষের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে।

একদিন কালীশঙ্কর তাঁহাকে খেলায় হারাইয়া বাজী জিতিয়াছিলেন, আর সমবেত বালক-বৃন্দ করতালি-সহ উপহাসের উচ্চ হাসি হাসিয়া তাঁহাকে ক্রীড়াভূমি হইতে পলাইয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছিল। আর একদিন জনৈক বালক পাখীর বাসা হইতে কয়টী পক্ষিশাবক পাড়িয়া আনিয়াছিল; হরিশঙ্কর সেই বালকের নিকট হইতে দুইটি শাবক চাহিয়া লইয়া শাবকদ্বয়ের পা বাঁধিয়া খেলা করিতেছিলেন; হঠাৎ কালীশঙ্কর তাহা দেখিয়া অতি নিষ্ঠুরের কার্য্য বলিয়া তাঁহার উপর কত ঘৃণাসূচক অনুযোগ বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট শাবকগুলি কৃষক বালকের নিকট হইতে লইয়া যত্নপূর্ব্বক বাসায় রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর সমবেত বালক-বৃদ্ধগণের প্রশংসা-বৃষ্টির

মধ্যে কালীশঙ্কর তাঁহার প্রতি কি এক গৌরবাত্মক দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে শত বৃশ্চিক-বাণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন, আর হরিশঙ্কর তাহাতে কতই না লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

যৌবনে গ্রামের যুবতীগণ হরিশঙ্করের ছায়া মাত্র সন্দর্শনে ভয়ে দূরে সরিয়া পড়িত; কালীশঙ্করের সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। হরিশঙ্কর তখন ভাবিতেন—তাঁহার পিতা বড় জমিদার, হরিশঙ্কর তাঁহার তেজস্বী পুত্র, সুতরাং সকলে তাঁহাকে ভয় করে সম্মান করে; আর কালীশঙ্করের পিতা তেমন বড় জমিদার নহেন; কালীশঙ্কর নিজে নিরীহ, মেয়েলী স্বভাব, কেহ তাহাকে গ্রাহ্যই করে না'—সকলে তাহাকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করে। হরিশঙ্কর এখন বুঝিলেন, সে তাঁহার ভ্রম ধারণা। কালীশঙ্কর এ প্রদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হৃদয়ে দেবতার আসনে উপবিষ্ট, আর হরিশঙ্কর সকলের ঘৃণার ও ভয়ের পাত্র। শোণিত-লোলুপ শার্দ্দূলকে লোকে ভয় করে, কিন্তু ভালবাসে না।

হরিশঙ্কর নিশ্চয় বুঝিলেন,—কালীশঙ্কর জীবিত বা পদস্থ থাকিতে হরিশঙ্কর এ দেশে কখনও যশ-প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন না। কালীশঙ্করের ধ্বংস-সাধনকল্পে হরিশঙ্কর হৃদয়ের শোণিত-তুল্য প্রিয় অর্থরাশি অজস্র ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।'

হরিশঙ্কর আর ভাবিতে পারিলেন না। হিংসার তীব্র দংশনে তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র হলাকর্ষণের ন্যায় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া, অস্থিরভাবে কেবলই এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ মন অবসন্ন। চিন্তার দারুণ পেষণ বিস্মৃতিতলে ডুবাইবার মানসে, তিনি নিদ্রার আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিদ্রা আসিল না। তাঁহার হৃদয় মধ্যে কত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে লাগিল।

হরিশঙ্কর আবার ভাবিলেন,—"কেবল অর্থরাশিই তাঁহার; একমাত্র সঞ্চিত অর্থরাশির উপরই তাঁহার পূর্ণ অধিকার আছে। ইহা ছাড়া এ গৃহের একটী প্রাণীর উপর তাঁহার অধিকার নাই। যিনি ধর্ম্মপত্নী, যাঁহাকে জীবনের সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও তাঁহার আপন নহেন; সেই ধর্ম্মপত্নীও তাঁহার হৃদয়ের অনুরূপ কার্য্য করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। যাহাতে তাঁহার বিরাগ, তাহাতে জয়সুন্দরীর প্রবল অনুরাগ; যাহাতে তাঁহার অনুরাগ, তাহাতে জয়সুন্দরীর দারুণ ঘৃণা! তিনি যাহা চাহেন, পত্নী তাহা চাহেন না। প্রাণের বেদনা জয়সুন্দরী কখনও বুঝিলেন না, কখনও বুঝি-বেন না। জয়সুন্দরী দরিদ্রের দুহিতা, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি দরিদ্রের মত নহে। জয়সুন্দরী চান—তাঁহার গৃহ সদা জন-কোলাহল-পূর্ণ থাকুক; জয়সুন্দরীর ইচ্ছা—যেযখন আসে,

প্রসাদ পাউক। কিন্তু হরিশঙ্কর তো এমন অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারেন না! হরিশঙ্কর সাত পুরুষের বনিয়াদী জমিদার; তিনি তো আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, জগতের আবর্জ্জনা-স্বরূপ কতকগুলা কুপোষ্য প্রতিপালন করিতে যাইয়া তাঁহার চিররুদ্ধ ভাণ্ডার-দ্বার খুলিয়া দিতে পারেন না!”

হরিশঙ্কর ও জয়সুন্দরী প্রকৃতিগত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জয়সুন্দরী তাই নিজেও সুখী হইতে পারিলেন না, হরিশঙ্করকেও সুখী হইতে দিলেন না। হরিশঙ্কর দেখিলেন,—ছেলে দুইটার মতিগতিও ভাল নহে; তাহারা যেন তাহাদের গর্ভধারিণীর প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হরিশঙ্করের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে।

হরিশঙ্কর বলিয়া উঠিলেন,—“যাক্! আমার অতুল ক্ষমতা অপরিমিত ধনরাশিই আমার একমাত্র সুখের নিদান। অন্য সুখ চাই না; আমার পক্ষে সুপাপ্যও নহে। ভক্তি-ভালবাসা প্রেম-যশঃ-প্রতিপত্তি আমার পক্ষে স্বপ্নের জিনিস। স্বপ্নরাজ্যের জিনিস বাস্তব-রাজ্যে মিলিবে না, নিশ্চয়। লোকনিন্দায় বা সমাজ ভয়ে কাপুরুষেরাই ভীত হয়। সমগ্র সমাজের অবিসংবাদিত প্রশংসা-লাভ কাহারও ভাগ্যে কখনও ঘটে না। আমার ভাগ্যেও ঘটিবে না। প্রশংসার জন্য লালায়িতও নহি। কালীশঙ্করের উন্নত মস্তক খর্ব্ব করিতে পারিলে, তাহার দানধর্ম্মের পথ রোধ করিতে পারিলে, আমার জীবনের চরম সুখ

হইবে। যে জাল বিস্তার করিয়াছি, তাহাতে কালীশঙ্কর রূপ নির্ব্বোধ মীন অচিরে আবদ্ধ হইবে। তখন এ দেশের লোক বুঝিতে পারিবে, বুদ্ধি-ব্যাপারে কালীশঙ্কর বড়, না—হরিশঙ্কর বড়!"

নবম পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী সখি-সম্ভাষণে চলিয়াছেন। পরিধানে কাল ফিতেপেড়ে শাড়ী, কপালে টিপ, অধরোষ্ঠ তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত, অঞ্জন-শোভিত চক্ষুর্দ্বয়ে অপাঙ্গ দৃষ্টি, পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী, বর্ণ শ্যাম। সুন্দরী হেলিয়া দুলিয়া তাহার সই রঙ্গিনীর নিকট গমন করিল।

সুন্দরীকে দেখিয়া রঙ্গিনী সহাস্য-মুখে ডাকিল,—"সই।"

"কিলো সই!"

"মজার কথা সই!"

"কে হয়েছে জলসই?"

"খাবে নাকি ফলার দই?"

"দূর, বালাই তা কেন?"

"তবে এই না বল্‌লি—বড় মজার কথা?"

রঙ্গিনী কহিল,—"বড় মজার কথাই বটে! শুনে তুই হেসে গড়াগড়ি যাবি।"

সুন্দরী।—"আগে বল্‌-না, শুনি।"

রঙ্গিনী বিস্মিতভাবে কহিল,—"তুই কি ইহার মধ্যে কিছুই শুনিস্ নি ?"

সুন্দরী।—"শোনা কথা, কি নূতন কথা, পরে ব'লব। আগে বল্‌না ভাই!"

রঙ্গিনী মুচ্‌কে হাসিয়া কহিল,—"গ্রামে ঘরে ঘরে এত ঢাক-ঢোল বেজে গেল; তুই কিছু শুন্‌লি না ? তুই কি কাণের মাথা খেয়ে বসে আছিস্ ?"

সুন্দরী—"অবাক কর্‌লি যে ভাই! তোর দিব্বি! আমি কিছুই শুনি নাই।"

রঙ্গিনী।—"নে, নেকামি করিস্-নে। তুই কি আর এ সব খবর রাখিস্-নে।"

সুন্দরী বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে কহিল—"নে ভাই, এত গুমর ভাল নয়। বলতে হয়, ব'লে ফেল। আমার হাতে ভাই ঢের কাজ আছে। না বলিস্, চ'লে যাই; তুই একলাটী বসে বসে মজার কথাটী হজম করতে থাক।"

রঙ্গিনী বাধা দিয়া কহিল,—"তোর সাথে ভাই কথা বলে সুখ নেই। কথা বল্‌তে না বল্‌তে কাজ আছে বলে বায়না ধর্‌লি। শোন্ তবে। দেখিস্ ভাই,—চুপ্ চুপ্! কারো কাছে বলিস্‌নে! বড় ঘরের বড় খবর—চুপ্ চুপ্! কে এসে আবার শুন্‌তে পাবে। দেখিস্ ভাই! আমার বড় গা কাঁপ্‌ছে। চুপ্ চুপ্, ও বাড়ীর

ছোটকর্ত্তা, আর সেই পোড়ারমুখী বেহায়া মাগী বিনোদিনী। চুপ্‌—চুপ্‌, কি ঢলা-ঢলিটাই না কর্‌লে! তিন ছেলের বাপ্‌! ভগবতীর ন্যায় রূপবতী স্ত্রী ঘরে! তার এম্‌নি ব্যাভার! ওমা! কি ঘেন্না—কি ঘেন্না!"

সুন্দরী বিস্মিতভাবে কহিল,—"বলিস্‌ কি সই! এও কি সম্ভব? সত্যি বল্‌ছিস্‌—না, রঙ্গ কর্‌ছিস্‌?"

রঙ্গিনী সাগ্রহে কহিল,—"সত্যি ভাই! তোর চোখের মাথা খাই, যদি ইহার এক বিন্দু মিথ্যে হয়। আবার কেলেঙ্কারি কত! ছোটকর্ত্তা সেই বেহায়া মাগীকে দুই হাজার টাকার গয়না দিয়েছেন, ছোট মা-ঠাকুরুণ তা শুনে গোঁসাভরে কবাট দিয়ে অন্নজল ত্যাগ করেছেন! তিনি বলেন,—এ প্রাণ আর রাখ্‌বেন না। পোড়ার-মুখী বিনোদিনীর গুমর দেখে কে? সে কি আজকাল আর যার তার সঙ্গে কথা কয়—না, মাটীতে পা দেয়?"

সুন্দরী ঝি যেন আকাশ হইতে ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বিস্ফারিত-নেত্রে রঙ্গিনীর মুখপানে দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিয়া, চিবুকে হস্তার্পণ করিয়া সুন্দরী কহিল,—"ওমা, ভিতরে ভিতরে এত সব হ'য়ে গেল, আমি কিনা বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পারি-নি?"

সহসা সুন্দরীর ধর্ম্মজ্ঞান-জলধিতে বাণ ডাকিয়া উঠিল। কলিকালে যে লোকের পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, ইন্দ্রিয়-বশে

জগতের লোক যে পাপ-জলধির অগাধ জলে নিমজ্জিত, এইরূপ পাপের ফলে যে জগতী-তলে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, জল-প্লাবন, নারীবৃন্দের অকাল বৈধব্য, মানবজাতি অল্পায়ু, বসুন্ধরা শস্যদানে কুণ্ঠিতা ইত্যাদি দুর্লক্ষণ ঘটিতেছে,—সুন্দরী তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল।

অবশেষে দৃঢ়তা-সহকারে কহিল,—"কালীশঙ্করের মত লোকের যখন এইরূপ অধঃপতন, তখন সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা যে অধর্ম্মের কাজে পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করিবে না, ইহা আর বিচিত্র কি ?"

সুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল,—"সই, দেখে শুনে লোকের সঙ্গে আর মিশ্‌তে ইচ্ছে হয় না। একলাটী ঘরের কোণে চুপ ক'রে বসে থাকা,—সেই ভাল। আজকাল পাপের হাওয়া যেরূপ জোরে বহিতেছে, আপন বাঁচিয়ে থাক্‌তে হ'লে, ঘরের কোণে ব'সে ইষ্টনাম জপ করাই সার কর্ম্ম। যাই ভাই, বাড়ী গিয়ে আপন কাজ নিয়ে থাকি। এ সব পাপ কথা শুন্‌লেও পাপ !"

এই বলিয়া সুন্দরী চলিয়া যাইবার ভাণ করিল। রঙ্গিনী বাধা দিয়া কহিল,—"যাস্‌নে সই, মজার খবর তো এখনও বলা হয়-নি !"

সুন্দরী বিস্মিতভাবে কহিল,—"দেখিস্ ভাই, মাথা খাস্,

কেউ যেন জান্‌তে না পারে। আসল মজার কথা এই,—"মতি ঘোষ নাকি 'তার ভাদ্রবউকে ছোটকর্ত্তা কয়েদ রেখেছেন' বলে থানায় এজাহার করেছে। পুলিশ এলো ব'লে। দেখিস্ ভাই, চুপ্ চুপ্। পোড়ারমুখী বিনোদিনী ছোটকর্ত্তার বালাখানা দখল ক'রে ব'সে আছে! চুপ্ চুপ্, আমার ভাই বড় ভয় করে।"

সুন্দরী কহিল,—"এই বিনোদিনীই না লম্বা ঘোম্‌টায় মুখ ঢেকে লোক্‌কে জানাত—সে বড় লজ্জাবতী! মুখে আগুন—মুখে আগুন! আচ্ছা সই, মতি ঘোষ যে নালিশ করেছে, তুই তা কি ক'রে জান্‌লি?"

রঙ্গিনী গর্ব্বস্ফীত-বক্ষে কহিল,—"আমার বাবুটিকে বড়কর্ত্তা খুব ভাল বাসেন। কর্ম্মচারিগণের মধ্যে আমার বাবুর মত বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী বড়-সরকারে দ্বিতীয় কেউ নেই। দেখিস্ ভাই, চুপ্ চুপ্! মতি ঘোষ বিপদে পড়ে জাতি-কুল বাঁচাবার আশায় বড়কর্ত্তার আশ্রয় নিয়েছে। বড়কর্ত্তাও নাকি তাকে সাহায্য কর্‌তে সম্মত হয়েছেন। বড়কর্ত্তা এ সব পাপকার্য্যের ধার ধারেন না। ছোটকর্ত্তার ব্যাভারের কথা শুনে বড়কর্ত্তা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন। দেখিস্ ভাই—চুপ্ চুপ্। এ সকল গোপন খবর, আমার বাবুর নিকট শুনেছি। নৈলে কি বড়-ঘরের বড়-কথা যে সে লোকে জান্‌তে পারে?'

সুন্দরী ঔদাস্যভরে কহিল,—"আমি ভাই, এ সকল খবরা-

খবরের ধার ধারি না। কাণের কাছে কেউ বল্‌তে লাগ্‌লে; তাতেও কখনও মন দিই না। কাজ কি ভাই, পরের কথায় থেকে? নিজে যদি ভাল থাকৃতে পারি, তাই চের।"

এই বলিয়া সুন্দরী চলিয়া গেল।

সুন্দরী বড়-সরকারে না গিয়া, একেবারে পল্লীভ্রমণে যাত্রা করিল। তখন অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা। সুন্দরী গ্রামের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া সকলকে বলিয়া আসিল যে, বিনোদিনী ছোট-কর্ত্তার রক্ষিতা। এ সংবাদ গ্রামের ঘরে ঘরে প্রচার করা যেন সুন্দরীর কর্ত্তব্য কাজ। সুন্দরী সুচারুরূপে কর্ত্তব্য পালন করিয়া, সন্ধ্যার কৃষ্ণচ্ছায়া ভেদ করিয়া বড়-সরকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। সকলের আহার শেষ হইয়াছে। এইবার জয়সুন্দরী আহার করিতে বসিবেন। এমন সময়, দুইটি পুত্র সঙ্গে লইয়া, এক ভিখারিণী গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল।

ভিখারিণী অশ্রু মার্জ্জনা করিতে করিতে কহিল,—"মা, কাল থেকে ছেলে দু'টি খেতে পায়-নি। ক্ষুধার জ্বালায় ওরা অস্থির হয়েছে। মা, তুমি দয়াময়ী, তাই তোমার কাছে এসেছি। আমার ছেলে দু'টিকে চাট্টি খেতে দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।"

উত্তরের প্রতীক্ষায় ভিখারিণী সজল নেত্রে জয়সুন্দরীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

জয়সুন্দরী আহারে বসিতেছিলেন। ভিখারিণীর কথা শুনিয়া আহার্য্য দ্রব্য সমস্তই ভিখারিণীর পুত্রগণের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। ভিখারিণীকেও কহিলেন,—"তুমিও বাছা, আর একখানি পাত পাড়িয়া ব'স। আমি তোমার জন্যও ভাত নিয়ে আসছি। রান্নাঘরে আরও চাট্টি ভাত আছে।"

এই বলিয়া, রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া, যে ভাত-ডাল ছিল— আনিয়া, জয়সুন্দরী ভিখারিণীকে খাইতে দিলেন।

উহারা অতি ব্যগ্রতা-সহকারে আহার করিতে লাগিল। জয়সুন্দরী দেখিলেন,—ভিখারিণী এক সময় পরমা সুন্দরী ছিল, দুঃখকষ্টের পেষণে অঙ্গের লাবণ্য কোথায় মিশিয়া গিয়াছে। ছেলে দু'টির আকৃতিও ভদ্রবংশীয়ের ন্যায়;—ভিখারীর সন্তানের মত নহে। জয়সুন্দরী বুঝিলেন,—ভিখারিণী এক সময় সুখের দিন দেখিয়া থাকিবে। তাহার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের বিষয় মনে করিয়া, জয়সুন্দরীর বৃহদায়তন চক্ষুপ্রান্তে অশ্রু সঞ্চারিত হইল।

এই সময়, সহসা হরিশঙ্কর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভিখারিণীকে ও তাহার পুত্র দুইটিকে আহার করিতে দেখিয়া, হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহারা কে? ইহারা এখানে খাচ্ছে কেন?"

জয়সুন্দরী স্বামীর প্রকৃতি জানিতেন। তাঁহার ভয়-ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি সঙ্কুচিত কণ্ঠে কহিলেন,—"আহা! এরা অনাথ—নিরাশ্রয়, কাল থেকে খেতে পায়-নি। দেখ-না একবার, খেতে না পেয়ে, এরা কেমন শুকিয়ে গিয়েছে! বুকের হাড়গুলা জির্‌জির্ ক'র্‌ছে। আমি যা খেতেম, তা না খেয়ে, এদিগে খেতে দিয়েছি।"

"বড় সৎকর্ম্মই ক'রেছ!" এই বলিয়া হরিশঙ্কর কোপকুটিল নয়নে জয়সুন্দীরর প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

জয়সুন্দরী কহিলেন,—"অপরাধ ক'রে থাকি, যে দণ্ড হয়—দিও। কিন্তু আগে এদের খাওয়া হ'য়ে যাক্।"

এই বলিয়া যেখানে সেই তিনটি প্রাণী আহার করিতেছিল, জয়সুন্দরী সেই দিকে চলিয়া গেলেন।

হরিশঙ্কর রোষভরে গর্‌গর্ করিতে করিতে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া জয়সুন্দরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আহারান্তে ভিখারিণী, দেবতার নিকট জয়সুন্দরীর মঙ্গল-কামনা করিয়া, চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। জয়সুন্দরী, ভিখারিণীর হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন,—"এই টাকা দুটিতে ছেলেদের কাপড় কিনে দিও।"

ভিখারিণী অশ্রু মার্জ্জনা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণে চলিয়া গেল।

জয়সুন্দরী, শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, গুরুতর অপরাধিনীর ন্যায় ভয়ে ভয়ে স্বামীর মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, স্বামীর নয়নাগ্রে ক্রোধের রক্তিম রাগ পরিস্ফুট।

জয়সুন্দরী ধীর মধুরকণ্ঠে কহিলেন,—"তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? আমি নিজে যা খেতেম, ছেলে দুটিকে মাত্র তাই দিয়েছি।"

হরিশঙ্কর কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—"বড় কৈফিয়ৎ দিতেই শিখেছ! যা হোক, তুমি ওবেলা খাবে তো!'"

জয়সুন্দরী।—"তুমি নিষেধ কর, ওবেলাও না হয় খাব না।"

বিকৃতকণ্ঠে হরিশঙ্কর কহিলেন,—"আমি তো আর চব্বিশ ঘণ্টা চৌকী দিতে আস্‌ব না যে, তুমি কি খেলে বা না খেলে দেখ্‌তে পাব? হয় তো এক বেলাই তিন বেলার সুদ আসল আদায় ক'র্‌বে।"

জয়সুন্দরীর নয়নে অশ্রুসঞ্চার হইল। তিনি ইহার কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না; নীরবে অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া অঞ্চলপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।

হরিশঙ্কর কহিলেন,—"শুন জয়সুন্দরী! কত দিন তোমায় নিষেধ করেছি যে, আমার গৃহে যেন কখনও অপব্যয় না হয়, বাজে লোককে যেন আমার গৃহে পাত পাড়্‌তে দেওয়া না হয়। কিন্তু আমার সে আদেশ ও সতর্ক-বাক্য তুমি বার বার অবজ্ঞা

ক'রে আস্‌ছ। ধন্য তোমার সাহস! স্ত্রী-জাতির এত স্পর্দ্ধা—এত সাহস ভাল নয়! আর একটি কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমায় বিয়ে ক'রে ঘরে এনেছি ব'লে অবশ্য চোর-দায়ে ধরা পড়িনি। তোমার যা খুসী, তাই ক'র্‌বে;—আমার নিষেধ বাক্য গ্রাহ্য ক'র্‌বে না! মনে রেখ, আমার সংসার জাহান্নামে দেবার অধিকার অবশ্য তোমায় দিই নি।"

জয়সুন্দরী অশ্রু-মার্জ্জনা করিতে করিতে কহিলেন,—"আমি তোমার সংসার ছারখার ক'র্‌বো! আমি তবে তোমার পর?"

হরিশঙ্কর।—"তুমি আমার 'আপন' হ'তে ঢের বিলম্ব।"

জয়সুন্দরী।—"তিনটি প্রাণীকে খেতে দিয়েছি; ইহাই আমার গুরুতর অপরাধ! যাক্, 'পর'কে তবে কেন আর ঘরে রেখেছ? তাড়িয়ে দাও;—তোমার সংসার বজায় থাক্।"

হরিশঙ্কর।—"অভিমান ক'রে কাজ নেই। মনে রেখ, যাকে তাকে খেতে দিবে—এমন অধিকার তোমায় প্রদান করি নাই।"

জয়সুন্দরী।—"আমি তোমার সহধর্ম্মিণী। এ সংসারের উপর আমারও একটুকু আধটুকু অধিকার আছে। একবার যে অধিকার দিয়েছ, তা তো এখন কেড়ে নিতে পা'র্‌বে না?"

হরিশঙ্কর কি উত্তর প্রদান করিবেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে না পারিয়া কহিলেন,—"বলি, পিত্রালয়ে কয় দিন এমন দান ও দয়ার কার্য্য করা হ'য়েছিল?"

সবল হস্ত-নিক্ষিপ্ত শেলাঘাতের ন্যায় এই বিদ্রূপোক্তি জয়সুন্দরীর মর্ম্ম বিদ্ধ করিল।

জয়সুন্দরীর মনে হইল—তাঁহার পিতা দরিদ্র বটেন; তিনি দরিদ্রের দুহিতা, ইহাও সত্য; কিন্তু তাঁহার দরিদ্র পিতার গৃহদ্বার হইতে কোনও দিন কোনও অভুক্ত ভিখারী বিতাড়িত হয় নাই। তাঁহার পরম শত্রুও এমন অপবাদ দিতে সাহসী হইবে না। তাঁহার পিতা দরিদ্র হইলেও, তিনি মানুষ ছিলেন; তাঁহার হৃদয় ছিল, দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল, ধর্ম্মবল ও সৎসাহস ছিল। অন্যায় স্বার্থসাধন করিতে যাইয়া তিনি কখনও পরের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করেন নাই। প্রতিবেশীর হৃদয়-শোণিত-সিক্ত অর্থরাশি তিনি কখনই আপনার কামনার বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিতেন না! তাঁহার যাহা ছিল এবং যাহা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, এমন অমূল্যরত্ন লক্ষপতিরও নাই। জীর্ণ দেহ পরিত্যাগে তাঁহার পবিত্র আত্মা স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার পবিত্র নাম গৃহদেবতার ন্যায় ঘরে ঘরে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কত লক্ষপতি জীবন ধন্য করিতেছে।

জয়সুন্দরী কহিলেন,—"জয়সুন্দরী দরিদ্রের কন্যা বটে; কিন্তু দরিদ্রের ধর্ম্মপত্নী নহে।"

নির্লজ্জ হরিশঙ্কর কহিলেন,—"তুমি দরিদ্রের স্ত্রী নও—সত্য;

কিন্তু মাঝে মাঝে পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিতে হয়। একেবারে ধাঁ ক'রে বৃক্ষের আগডালে আরোহণ করতে নাই। ওজন ঠিক্ রাখ্তে না পেরে, হঠাৎ 'পপাত ধরণীতলে' হওয়াও বিচিত্র নহে।"

জয়সুন্দরী।—"কিসে তোমার বিশ্বাস হয়, বল; আমি তাই ক'র্তে প্রস্তুত আছি। তোমার পাদস্পর্শ ক'রে শপথ কর্ছি, ও বেলা কেন, যতদিন সাধ্য উপোস্ ক'রে থাকব। তবেই তো তোমার সংসার বজায় থাক্বে?"

জয়সুন্দরী কাঁদিতে কাঁদিতে পতির চরণ ধারণ করিতে গেলেন।

হরিশঙ্কর একটু সরিয়া দাড়াইয়া কহিলেন,—"না, ইহাতে অপব্যয় দূর হইবে না। উপোস্ ক'রে থাক্বে, আর অম্নি রোগ এসে চেপে বস্বে।"

জয়সুন্দরী।—"রোগ হউক, তোমার তো আমার জন্য চাল-ডাল খরচ হবে না!"

হরিশঙ্কর।—"তার তিন গুণ আমায় খরচ কর্তে হবে। রোগ হ'লে কাজেই ডাক্তার কবিরাজ ডাক্তে হবে; ভিজিট, ঔষধের দাম ও পথ্যের খরচ যোগাতে হবে।"

জয়সুন্দরী।—"আমার রোগ হ'লে ডাক্তার কবিরাজ কাউকে ডেক না,—পথ্য দিও না।"

হরিশঙ্কর।—"তবে মারা যাবে যে!"

জয়সুন্দরী।—"তোমার কি ক্ষতি?"

হরিশঙ্কর।—“আমার ক্ষতি নয়? একবার দেড় হাজার টাকা ব্যয় ক'রে তোমায় বিয়ে করেছি, এবার কি দ্বিগুণ টাকা ব্যয় ক'রে বিয়ে কর্‌তে হবে না? আবার তোমার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষেও ঢের টাকা ব্যয় কর্‌তে হবে। আমার ইচ্ছা, তুমি সুস্থ দেহে বেঁচে থাক! তা'হলে সম্প্রতি আর কোনও আপদ-বালাই নেই।”

জয়সুন্দরীর প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। এই কি পত্নীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা! এই কি স্বামীকে প্রাণপাত পূজার পুরস্কার! জয়সুন্দরীর নয়ন-প্রান্ত হইতে মুক্তাফলসদৃশ অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়া কক্ষতল অভিষিক্ত করিল। দুঃখের আবেগ-প্রাবল্যে জয়সুন্দরী সহসা কোনও কথা বলিতে পারিলেন না।

হরিশঙ্কর ক্রমেই জয়সুন্দরীর সহিষ্ণুতার সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। জয়সুন্দরীর মনে হইতে লাগিল,—তিনি পিত্রালয়ে যাহা ছিলেন, এখানেও তাহাই আছেন। বরং তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে। এ গৃহে আসিয়া অবধি তিনি যাহা হারাইয়াছেন, এ জীবনে আর তিনি তাহা ফিরিয়া পাইবেন না। ভাবিতে ভাবিতে, জয়সুন্দরী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন; অবসন্ন-চিত্তে অবসন্ন দেহে কক্ষতলে শয়ন করিলেন। তখন কত কথাই জয়সুন্দরীর মনে হইতে লাগিল। মনে হইল,—পিতা-মাতা ছাই-পাঁশ অর্থরাশির প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছিলেন—আর কিছু লক্ষ্য করেন না! তিনি মনে মনে কহিলেন,—একজন

পথের ভিখারীও তাঁচার অপেক্ষা সুখী। এ সংসারে আসিয়া তিনি কেবল অর্থের পূতিগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন; কেবল পরহিংসা পরদ্বেষ পরশোষণ পরপীড়নের অভিনয় দেখিলেন! কিন্তু কৈ, এক দিনও তো জীবে দয়া, পরানুচিকীর্ষা, দেবদ্বিজে ভক্তি, অতিথি-সৎকার, দানধর্ম্ম কিছুই দেখিতে পাইলেন না! হায়! কত মর্ম্মপীড়িত ব্যক্তি সজল-নয়নে উর্দ্ধপানে চাহিয়া দেবতার সদনে প্রতিকার প্রার্থনা জানাইতেছে! হায়! কত নিরীহ জন, সর্ব্বস্ব-ধনে বঞ্চিত হইয়া, এ গৃহের উপর দারুণ অভিসম্পাত বর্ষণ করিতেছে! কে জানে—ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে! জয়সুন্দরী ভাবনার কূল কিনারা পাইলেন না। তাঁহার মনে হইল,—মানুষ প্রবলকে ভয় করে, অর্থের খাতির করে, অত্যাচার-উৎপীড়ন ভয়ে অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়-গিরির ন্যায় কষ্ট-অপমানের জ্বলন্ত প্রস্রবণ হৃদয়ে চাপিয়া আনুগত্যের অভিনয় করে, দণ্ডের ভয়ে হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু সহস্র-নেত্র ভগবানের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি কেহ অতিক্রম করিতে পারে কি? পরিণামে পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার বিধাতা তুলাদণ্ডে বিধান করেন।

পরিণয়ের পর হইতে একদিনের তরেও জয়সুন্দরী সুখী হইতে পারেন নাই। স্বামি-গৃহের অনাচার-ব্যভিচার দেখিয়া দেখিয়া এ গৃহের প্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছে। তিনি প্রাণের শান্তি-হারা হইয়াছেন। কেন এমন হইল, ভাবিয়া কারণ অনুসন্ধান

করিতে পারিলেন না। কৈ—তিনি এক দিনের জন্যও তো নারীর কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই! পতির গৃহের মঙ্গল কামনায়, আপনি অলঙ্কার-রাশি বিক্রয় করিয়া, সে বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিনি বিপন্নজনকে দান করিয়াছেন! কৈ—তাহাতেও তো তাঁহার সংসারের প্রতি ভগবানের দৃষ্টি পড়িল না! স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আপন অঞ্চল-কোণে তিনি কত আর্ত্তের উষ্ণ অশ্রুধারা মার্জ্জনা করিয়াছেন! প্রাণের আবেগে কত প্রপীড়িত পরিক্লিষ্ট জনের অশ্রুর সহিত অশ্রুধারা মিশাইয়া তাহার হৃদয়ের দুঃখভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্নেহনিষিক্ত সান্ত্বনা-বাক্যে কত জনের হৃদয়-ক্ষত দূর করিয়াছেন! তবু ভগবান্ তাঁহার সংসারের প্রতি একবার কৃপা-কটাক্ষ পাত করিলেন না!

স্বামী বর্ত্তমানেও জয়সুন্দরী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় দিনযাপন করিতেছেন, ভোগবাসনা সকলই পরিত্যাগ করিয়াছেন। দিনান্তে এক মুষ্টি আহার না করিলে, প্রাণ বাঁচে না; তাই তিনি দিনান্তে এক বেলা আহার করেন। চিন্তার তীব্র দংশনে তাহার দেবী-দুর্ল্লভ রূপরাশি নিদাঘতাপদগ্ধ গোলাপের ন্যায় ম্লান ও লাবণ্যশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার প্রাণে আশা নাই, আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই;—তিনি কেবল কর্ত্তব্য-বোধে ঘরকন্নার কাজ-কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু, কেবলই কেন তাঁহার হৃদয় অদূর ভবিষ্য বিপদের ঘনছায়া সন্দর্শনে চমকিয়া উঠে! জয়সুন্দরী যাহা চান,

এ গৃহে তাহা প্রাপ্য নহে। তিনি যাহাতে আনন্দানুভব করেন, এ গৃহে তাহা দুর্ল্লভ। তিনি আবাল্য ধর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যে প্রতিপালিত। পাপের কল্পনা মাত্রে তিনি শিহরিয়া উঠেন।

বড় ঘরে আসিয়া তাঁহার কোনও সাধ-বাসনা পূর্ণ হয় নাই, কোনও আশা সফল হয় নাই। পিতামাতা বড়লোক জামাতা চাহিয়াছিলেন; তাঁহাদের সাধ পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিয়া গিয়াছেন—জয়সুন্দরী সুখী ও সৌভাগ্যবতী। পিতা এই ধারণা লইয়াই দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। মাতা ও ভ্রাতা এই ধারণায়ই এখনও উল্লসিত ও গৌরবান্বিত। ভগবান্ তাঁহাদের এ অলীক ধারণা অক্ষুণ্ণ রাখুন।

ভাবিতে ভাবিতে জয়সুন্দরী তন্দ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কালীশঙ্কর রায়ের অন্তঃপুর পানে চাহিয়া দেখ,—তথায় কি এক পবিত্র দৃশ্য! বৃহৎ প্রাঙ্গণতলে শত ভিখারিণী পুত্র-কন্যা-গণ সহ পাত পাতিয়া আহার করিতে বসিয়াছে। কালীশঙ্করের পুণ্যবতী ভার্য্যা সুরসুন্দরী, শিবসীমন্তিনী অন্নপূর্ণার ন্যায় রূপে দিক আলোকিত করি..া, প্রসন্ন বদনে পুলক-পূরিত-চিত্তে দর্ব্বী হস্তে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন। কেহ বলিতেছে—'মা, এ দিকে ভাত দিয়ে যাও', কেহ বলিতেছে 'ডাল্ নিয়ে এস', কেহ

বলিতেছে—'জল দাও।' এইরূপে বুভুক্ষু ভিখারিগণ নানাবিধ ফরমাইস্ করিতেছে। ইহাতে সুরসুন্দরীর অণুমাত্র বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ নাই।

তিনি কটিদেশে অঞ্চলপ্রান্ত জড়াইয়া যাহার যাহা আবশ্যক, ক্ষিপ্রহস্তে যোগাইতেছেন। প্রশান্ত ললাটমূলে সর্পশিশুবৎ অলকগুচ্ছ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, কর্ণাভরণ দুল দুল দুলিতেছে, প্রভাত-কমল-সন্নিভ ঢলঢল বদনমণ্ডলে মুক্তাফল সদৃশ স্বেদ-বিন্দু শোভা পাইতেছে। অবেণীবদ্ধ কেশদাম আনিতম্ব বিলম্বিত। স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নযুগলে যেন অসীম দয়া বিপুল স্নেহ পূর্ণ প্রতিভাত। এ মাতৃ রূপ যে দেখিল, সে আর নয়ন ফিরাইতে পারিল না। জগতের অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা যেন মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া শত ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিতেছেন।

এমন সময় কালীশঙ্কর রায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি অলক্ষিতে অদূরে দাঁড়াইয়া অতৃপ্তনয়নে সহধর্ম্মিণীর স্বর্গীয়-সুষমাজড়িত মাতৃরূপ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। যত দেখেন, ততই যেন সুরসুন্দরীর রূপরাশি প্রোজ্জ্বল প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

বিমুগ্ধ কালীশঙ্কর মনে মনে কহিলেন,—"বহু তপস্যার ফল এমন পুণ্যবতী পত্নী লাভ করিয়াছি। যে গৃহ এমন নারীরত্নে অলঙ্কৃত, সে গৃহ মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গ। কিন্তু এমন

ভাবে প্রতিদিন খাটিয়া খাটিয়া সুরসুন্দরী স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিবে কি !"

কালীশঙ্কর সহাস্য মুখে অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"এইভাবে দৈনিক ব্রত পালন ক'রে, দেখ্‌ছি তুমি অসুস্থ হয়ে পড়্‌বে। আর সব কোথায় ?"

সুরসুন্দরী অধরপ্রান্তে হাসির জ্যোৎস্না ফুটাইয়া মধুর কণ্ঠে কহিলেন,—"কৈ, আমি তো একটুও শ্রান্তিবোধ কর্‌ছি-নে। মেয়েরা, বউমারা, সবাই তো পরিবেশন কর্‌তে চেয়েছিল ! আমিই তাদের নিষেধ করেছি। ওরা ছেলেমানুষ ; এতটা পার্‌বে কেন ? মা অন্নপূর্ণা করুন, তোমার প্রসাদে যেন চিরজীবন এইরূপ খাটতে পাই।"

কালীশঙ্কর কহিলেন,—"ভগবান তোমার সাধ পূর্ণ করিবেন ! বলি, তোমার এ পোষ্যবর্গ কোথা হইতে জুটিল ?"

সুরসুন্দরী।—"ইহারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী। আহা ! ইহারা বড় কাঙ্গাল ! শিশুসন্তানগুলি সময়মত খেতে পরতে পায় না ! না জানি, মায়ের প্রাণে কত কষ্ট !"

বলিতে বলিতে সুরসুন্দরীর নয়ন-প্রান্তে অশ্রু সঞ্চারিত হইল। তিনি অশ্রু মার্জ্জনা করিতে করিতে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন—জনৈক ভিখারিণীর পাত খালি। সুরসুন্দরী পলক মধ্যে ছুটিয়া গিয়া থালা-ভরা ভাত লইয়া আসিলেন এবং যাচিয়া যাচিয়া সকলের পাতে ভাত দিতে লাগিলেন।

কালীশঙ্কর রায় আনন্দ-বিভোর চিত্তে বৈঠকখানায় গিয়া ভিখারিণীগণকে দান করিবার জন্য কিছু টাকা সুরসুন্দরীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সহসা তিন জন দারোগা পঞ্চাশ জন কনষ্টেবল সহ আসিয়া কালীশঙ্কর রায়ের বাড়ী ঘেরাও করিল। আমলা-কর্ম্মচারিগণ বিস্মিত স্তম্ভিত। কেহ কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

জনৈক দারোগা কালীশঙ্কর রায়ের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—আপনার নামে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত। আপনি মতি ঘোষের বিধবা ভ্রাতৃবধূ বিনোদিনীকে কুঅভিপ্রায়ে দুই দিন যাবৎ আপনার গৃহে কয়েদ করে রেখেছেন। আমরা আপনার গৃহে খানাতল্লাস কর্‌ব।"

কালীশঙ্কর স্থির অবিচঞ্চল। তাঁহার চিরপ্রসন্ন বদন-শ্রী অবিকৃত। তিনি মনে মনে হাস্য করিয়া কহিলেন,—"আপনারা স্বচ্ছন্দে আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করুন। আমার গৃহে খানা-তল্লাস কর্‌তে আমার অণুমাত্র আপত্তি নাই।"

দারোগা, কালীশঙ্কর রায়ের মুখপানে চাহিয়া মনে মনে কহিলেন,—"যাহার বদন-শ্রী এমন স্বর্গীয় পবিত্রতা-মণ্ডিত, তেমন

ব্যক্তি দ্বারা আরোপিত ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়া অসম্ভব। তবে মানব-চরিত্র বৈচিত্র্যময়! দেখি—তদন্তের ফল কতদুর কি দাঁড়ায়।” প্রকাশ্যে কালীশঙ্করকে কহিলেন,—“তবে আপনার পুরমহিলাগণকে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট ঘরে অবস্থিতি করতে আদেশ করুন। আর আমাদের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ যেন আপনার গৃহ হইতে বাহিরে না যায়। আপনি সকলকে সতর্ক করিয়া দেন।”

“তাহাই হইবে।” এই বলিয়া কালীশঙ্কর রামমণি ঝিকে ডাকিয়া তদ্রূপ আদেশ করিলেন।

রামমণি ক্ষিপ্রগতিতে অন্তঃপুরে যাইয়া সুরসুন্দরীকে কহিল,—“মা-ঠাক্রুণ, এখনি সরে পড়ুন, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আপনি সকলকে নিয়ে এক কক্ষে যেয়ে থাকুন। পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করেছে। পিঁপড়ের সারের মত লাল-পাগড়ীওয়ালা কন্‌ষ্টেবলের পাল বড়ীময় গিস্‌গিস্ কচ্ছে। এখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ করে না জানি কি তল্লাস করবে।”

সুরসুন্দরী অবিচলিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেন? কি হয়েছে? পুলিশ কেন খানাতল্লাস করবে?”

রামমণি সঙ্কুচিত কণ্ঠে কহিল,—“মা-ঠাকরুণ, সে বড় সর্ব্বনেশে কথা! এ বয়সে এমন কেলেঙ্কারী! ওমা, আমি যাব কোথা?”

সুরসুন্দরী।—"কথা বারাস্তে; কি হয়েছে, আগে বল।"

রামমণি।—"আর কি হবে! যা হবার, তাই হয়েছে। কর্ত্তা নাকি মতি ঘোষের ভাদ্রবউ বিনোদিনীকে দুদিন যাবৎ কয়েদ রেখে তার ধর্ম্মনাশ ক'রেছেন? কত সোণা দানা তাকে দিয়েছেন? আরো কত কি—!"

সুরসুন্দরীর বদন-শ্রীতে রোষের রক্তিমরাগ ফুটিয়া উঠিল। তিনি রোষভরে কহিলেন,—"পাজী নচ্ছার মাগী, দেবতার নামে এমন পাপ কথা প্রকাশ করতে তোর একটু ভয় হ'ল না। দূর-হ, পোড়ারমুখী, আমার চক্ষুর সম্মুখ হতে দূর-হ; ফের এমন কথা বল্‌বি তো তোর জিভ কেটে কুকুরকে খাওয়াব।"

রামমণি কহিল,—"তা মা ঠাকুরুণ, আমার উপর রাগ করলে কি হবে! দেশের লোকের মুখ তো চেপে রাখতে পারবে না! গ্রামে ঘরে ঘরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠেছে, থানা পুলিশ জাহির হ'য়েছে; ক'জনের মুখ চেপে রাখ্‌বে মা? আমরা গরীব দুঃখী, পেটের দায়ে গতর খাটাতে এসে চোর দায়ে ধরা পড়েছি; আমরা না হয়, কিছু নাই বল্‌লাম! কথা তো আর গোপন থাকে নাই, থাকবেও না।

এই বলিয়া রামমণি বিড় বিড় করিতে করিতে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

ভিখারিণীর দল এ সংবাদে বিচঞ্চল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে

স্নেহসিক্ত কণ্ঠে সুরসুন্দরী কহিলেন,—"তোমরা বাছা, ভয় পেয়ো না। নিশ্চিন্ত-মনে আহার কর। তোমাদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিশ অন্দর-খণ্ডে ঢুকৃতে পাবে না।"

এই বলিয়া তিনি মোক্ষদা ঝিকে কহিলেন,—"যা তো মোক্ষদা, জমাদার হনুমান সিংহকে ব'লে আয়, আমার ব্রত সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিশ যেন অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে না পারে। বলপূর্ব্বক প্রবেশ করতে উদ্যত হ'লে, জমাদর বাধা প্রদান করতে ভয় না পায়।"

মোক্ষদা-ঝি, সুরসুন্দরীর আদেশ লইয়া জমাদারের সন্ধানে প্রস্থান করিল।

ভিখারীদলের আহার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে পর, সুরসুন্দরী প্রত্যেককে এক একটী আধুলী দান করিলেন। প্রচুর আহার্য্য ও নগদ পয়সা দান পাইয়া ভিখারীরদল সমকণ্ঠে সুরসুন্দরীর জয় গান করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথে চলিয়া গেল।

পুলিশ খানাতল্লাস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সঙ্গে মতি ঘোষ। অন্তঃপুরের প্রাচীর-বেষ্টন মধ্যে প্রবেশ দ্বারের অনতিদূরে পাশা-পাশি-ভাবে দুইটী কক্ষ অবস্থিত। এই কক্ষ দুইটীতে সামান্য সামান্য জিনিষ-পত্র রক্ষিত হয়। অনবধানতাবশতঃ বা অনাবশ্যক বোধে অনেক সময় কক্ষদ্বয়ের দ্বার রুদ্ধ করা হয় না। পুলিশ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীর নাম ধরিয়া ডাকিতে

লাগিল। সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত কক্ষাভ্যন্তর হইতে বিনোদিনী বহির্গত হইয়া অবগুণ্ঠনাবৃত-বদনে পুলিশের সমক্ষে দাঁড়াইল।

মতি ঘোষ বলিয়া উঠিল,—"ইনিই আমার ভ্রাতৃ-বধূ বিনোদিনী।"

পুলিশ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া, বিজয়ী সৈন্যের ন্যায় বক্ষঃ স্ফীত করিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিল। অতঃপর কালীশঙ্কর রায়ের কাছারী বাটীতে বসিয়া, বিনোদিনীর এজাহার গ্রহণ করিতে লাগিল।

পরিশেষে, কালীশঙ্কর রায়, তাঁহার দুইটী কর্ম্মচারী এবং দুই জন দ্বারবানের বিরুদ্ধে অভিযোগ সাব্যস্ত করিয়া, পুলিশ বিচারার্থ তাঁহাদিগকে চালান দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কালীশঙ্কর রায় জামিনে খালাস পাইয়াছেন। দশ দিন পরে মকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছে।

সুরসুন্দরীর মন স্থির—অবিচলিত। স্বামীর প্রভাত-পদ্মের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক চরিত্র কু-লোকের ষড়যন্ত্রে কখনও কলঙ্কিত হইবে না। সুরসুন্দরী মনে মনে স্থির জানিয়া রাখিয়াছেন—ভগবানের ন্যায়ের রাজ্যে মিথ্যার জয় নিশ্চয় হইবে না। দেবোপম পূতচরিত্রে এমনই তাঁহার বিশ্বাস।

তিনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে পূর্ব্ববৎ জন-সেবা করিয়া আসিতেছেন। তিনি একদিনের তরেও ব্রতভঙ্গ করেন নাই।

কালীশঙ্কর রায়ের গৃহ থানাতল্লাসের পর দিন, হঠাৎ মতি ঘোষেব দুইটা হালের বলদ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার এক-মাত্র পুত্র জ্বরে শয্যাগত, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হঠাৎ আছাড় খাইয়া বাম পদ ভাঙ্গিয়া গিয়া চলচ্ছক্তি রহিত।

মতি ঘোষ বুঝিল,—"এ সকল দুর্লক্ষণ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাপুরুষের মিথ্যা কলঙ্ক আরোপণের একমাত্র ফল।"

তাহার সঙ্কল্প বিচলিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ততরেও তাহার চিত্তে শান্তি রহিল না। মতি ঘোষ দিন রাত্রি নিভৃতে বসিয়া কেবলই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে, আর আকাশ পানে চাহিয়া কত কি ভাবে। ভাবিতে ভাবিতে মতি ঘোষের দেহ ক্লিষ্ট, মন উদ্যমবিহীন হইয়া উঠিল। মতি স্থির বুঝিল,—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। একে মহাজ্ঞানী সাধু ব্রাহ্মণ, তাহার উপর মনিব। অপরের প্ররোচনায় ছার অর্থলোভে এমন মহাপুরুষের প্রতিকূলে চণ্ডালের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে বলিয়া, তাহার হৃদয় অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইতে লাগিল।

রজনী শেষে নিদ্রাঘোরে মতি ঘোষ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সে দেখিল,—যেন অনল-সংযোগে তাহার গৃহ ভস্মীভূত, পুত্র-কলত্র কাল-কবলিত, মতি কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত, উত্থানশক্তিরহিত;

ব্যধিক্লিষ্ট গৃহশূন্য মতি যেন বিজন প্রান্তরে বৃক্ষতলে শয়নে থাকিয়া কষ্টময় দিন গণনা করিতেছে।

বিভীষিকাময় স্বপ্ন দর্শনে মতি উন্মাদবৎ বিচঞ্চল হইয়া উঠিল! মতি স্থির করিল,—'কালীশঙ্করের পায়ে ধরিয়া, তাঁহার নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা লইবে; মকদ্দমার শুনানীর দিন সত্য ঘটনা প্রকাশ করিবে। অত্যাচার উৎপীড়ন-ভয়ে মহাপাপে লিপ্ত হইবে না। গ্রাম ছাড়িয়া ভিন্ন এলাকায় চলিয়া যাইবে, তথাপি সত্য কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।'

বিনোদিনীর মনের গতিও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। থানাতল্লাসীর দিবসদ্বয় অন্তর বিনোদিনী শূলরোগগ্রস্তা হইয়া পড়িল। কে যেন তাহার হৃদয় মধ্য হইতে বলিতেছে—'সত্য ঘটনা প্রকাশ না করিলে, তাহার রসনা খসিয়া পড়িবে।'

বিনোদিনী সাহসে বুক বাঁধিয়া, একদিন সুরসুন্দরীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইল এবং সজল নয়নে ক্ষমাভিক্ষা চাহিল। কহিল,—"মা! আমি মহাপাপী! আমি যে মহাপাতক করিয়াছি, পরকালে তাহার ফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে। মা, তুমি ক্ষমাময়ী, এ পাপিনীকে ক্ষমা করিবে না কি?"

সুরসুন্দরী স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—"বাছা, যিনি পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কারের নিয়ন্তা, সেই ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

করিও। তুমি অবোধ অবলা। প্রলোভনে বাধ্য হইয়া তুমি যাহা করিয়াছ, তজ্জন্য যদি যথার্থ তোমার চিত্তে অনুতাপ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে ভগবান অবশ্যই তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। আমরা তোমায় ক্ষমা করিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত হও।”

বিনোদিনী অপেক্ষাকৃত লঘু চিত্তে সুরসুন্দরীর নিকট বিদায় গ্রহণে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরিশঙ্কর প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর প্রত্যহ আট ঘটিকার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে কাছারি-বাটীতে গমন করেন। আজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে হরিশঙ্কর জলযোগ করিতে বসিয়াছেন। ভার্য্যা জয়সুন্দরী পার্শ্বে উপবিষ্টা।

জয়সুন্দরী সঙ্কুচিত-কণ্ঠে কহিলেন,—“কাল রাত্রিতে আমার ভাই ও ভাইপো এসেছে। তুমি বুঝি শোন-নি!”

হরিশঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—“তোমায় নিয়ে যেতে এসেছে কি?”

জয়সুন্দরী।—“তুমি আমায় যেতে দাও কি না?”

হরিশঙ্কর।—“এবার যাবে যদি বল, ছেড়ে দিতে রাজি আছি।”

জয়সুন্দরী।—“আমি চলে গেলে, তোমার ঘর-সংসারের কাজে খাটাবে কাকে?”

হরিশঙ্কর—"সে ব্যবস্থা তখন করা যাবে।"

জয়সুন্দরী কহিলেন,—"যখন যেতে হয়, তখন যাব। এখন-কার কথা শোন। আজ কিছু দুধ মাছ আন্‌তে বলে দিও। ভাই ও ভাইপোটী চারটি খেয়ে যাবে তো ?"

হরিশঙ্কর কহিলেন,—"খেয়ে দেয়ে যাবে বৈ কি ? এসেছে যখন, দুদিন থেকে যাক্ না।"

জয়সুন্দরী।—"থাকে যদি, ভালই ; বলে দেখ্‌ব এখন। দুধ মাছ ও কিছু মিঠাই আনাতে যেন ভুলো না !"

হরিশঙ্করের মুখভঙ্গী বিরক্তি-ভাব ধারণ করিল ; হরিশঙ্কর কহিলেন,—"যা দৈনিক বরাদ্দ আছে, তাতে দু'টী প্রাণীর এক রকম করে চলে যাবে। বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় কর্‌তে আমায় অনুরোধ করো না। অনুরোধ রক্ষিত না হ'লে তোমার মনে কষ্ট হতে পারে। তা যেন না হয়।"

জয়সুন্দরী ব্যথিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"রোজও তো তোমায় এমন অনুরোধ করি-নে ! আত্মীয় স্বজন এলে, ছোট-বড় সকল পরিবারেরই বরাদ্দের অতিরিক্ত কোন-না-কোনও জিনিস আন্‌তে হয়। কেবল তোমার সংসার বলে তুমি অনাবশ্যক মনে কর্‌ছ।"

হরিশঙ্কর কহিলেন,—"অপর দশটা পরিবারের সহিত এ সর-কারের তুলনা দিও না। অপব্যয় করে অধঃপাতে গিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে।"

জয়সুন্দরীর প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। তাঁহার বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় ছলছল করিতে লাগিল।

তিনি কহিলেন,—"তোমার সরকারের বরাদ্দও তো সৃষ্টিছাড়া। কোনও জিনিসেরই প্রয়োজনানুরূপ বরাদ্দ ধরা নাই। এমন করে নিয়ত অনটনের মধ্যে ঘরকন্না চালান এক বিষম ঝঞ্ঝট। রোজ যে দুধ ও মাছ-তরকারী আসে, তাতে পরিজনদেরই কুলায় না। ইহার উপর দু'চার জন অতিরিক্ত খাবার লোক জুটলে, অনেককেই আধপেটা খেয়ে উঠতে হয়! তুমি দুধ খাবে, অপর কারো পাতে এক বিন্দুও দেওয়া হবে না,—এমন রীতি গৃহস্থ-ঘরে শোভা পায় না! এমন আপন-পর ব্যবহারে মা কমলার কোপদৃষ্টি পতিত হয়!"

হরিশঙ্কর বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠে কহিলেন,—"আমি আর আমার পুত্র কন্যা ছাড়া, এ বাড়ীতে অপর যারা আছে, তাদের কারো এমন অবস্থা নয় যে, দুধ বিনে খাওয়া চলে না। আপন আপন অবস্থার ওজনে সকলেরই অশন-বসনের ওজন ঠিক রাখিয়া চলা উচিত।"

এই গর্ব্বিত উক্তি শ্রবণে জয়সুন্দরীর প্রাণে ঘৃণার উদ্রেক হইল। তিনি কহিলেন,—"অন্নভুক্ত গরীবদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করা অধর্ম্ম। ইহাতে ভগবান রুষ্ট হন। তোমার পুত্রকন্যা-সহ তুমি দই-দুধ খাবে, অপর দশ জন অমনি পাত

ছেড়ে উঠে চলে যাবে! না-জানি, কোন্ পাপের ফলে আমাকে প্রতিদিন এমন দৃশ্য দেখ্‌তে হচ্ছে!"

এই বলিয়া জয়সুন্দরী এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পর জয়সুন্দরী অবনত মস্তকে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, হরিশঙ্কর বাধা দিয়া কহিলেন,—"জয়-সুন্দরী! আমার বিশেষ অনুরোধ, হাত সঙ্কোচ কর্‌তে একটু আধটু অভ্যাস করিও। আর এক কথা, তোমার ভাই ভাইপো পর নয় যে, তাদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে। রোজ যে দুধ মাছের বরাদ্দ আছে, তা কি তোমার বিবেচনায় নিতান্ত অপ্রচুর?"

জয়সুন্দরী।—"আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করে তোমার কাজ নেই। তুমি জমিদার; তোমার সরকারে বন্দোবস্তের মধ্যে, দরিদ্রের দুহিতা আমি, আমার লিপ্ত থাকা শোভা পায় কি? সামান্য সের দুই দুধ আর যৎসামান্য কিছু খুচরা মাছ— এই তোমার বড় সরকারের অতি বড় সুব্যবস্থা। ইহাতে আত্মীয়-কুটুম্বকে খাওয়াইতে হইলে, লজ্জা রাখ্‌বার ঠাঁই হয় না।"

হরিশঙ্কর বিস্মিতভাবে কহিলেন,—"বল কি! রোজ গোটা এক সিকি মাছ খরিদ জন্য বরাদ্দ ধরা আছে; ইহাও তোমার বিবেচনায় যৎসামান্য বলে পরিগণিত? আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য— অতি আশ্চর্য্য! যাক্, একটা কথা বল্‌ব কি? হাঁ, বল্‌ব

বৈ কি ? যে ব্যক্তির পাঁচ লক্ষ টাকা ঘরে মজুত, তার যদি খুচরা মাছ দ্বারা তৃপ্তির সহিত আহার চলে ; তবে যে ব্যক্তি কায়ঃক্লেশে কোনরূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে আস্‌ছে, তার কেন চল্‌বে না ? ইহা তো আমি ভাল বুঝ্‌তে পারি-নে !”

এই বলিয়া হরিশঙ্কর বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসির সহিত জয়সুন্দরীর প্রতি গর্ব্বপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টিতে যেন বিষমণ্ডিত সুতীক্ষ্ণ বাণ জয়সুন্দরীর বক্ষ বিদীর্ণ করিল।

জয়সুন্দরী বুঝিলেন, তাঁহার ভ্রাতার আর্থিক অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই এই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ পাইল। সুখে দুঃখে স্বামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা নারীর ধর্ম্ম নহে। জয়সুন্দরী তাহা জানেন। জানেন বলিয়া স্বামীর এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মধ্যেও তিনি অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু আজ সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি জয়সুন্দরী বিচলিত হইলেন। তিনি ধীরভাবে কহিলেন,—“অর্থের জোরে কাহারও গর্ব্বিত হওয়া উচিত নহে। দর্পহারী ভগবান মুহূর্ত্তে দর্প খর্ব্ব কর্‌তে পারেন। যাহাতে পুণ্য-প্রতিষ্ঠা আছে, এমন কাজে ব্যয় কর্‌তেই স্বভাবতঃ তুমি কুণ্ঠিত। যাহাতে অধর্ম্ম লোকনিন্দা, কৈ, তেমন কাজে অর্থব্যয় কর্‌তে তো তুমি কুণ্ঠিত নও! ঠাকুর-পোর বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমা কর্‌তে গিয়ে যে অজস্র অর্থব্যয় কর্‌লে, তা কি অপব্যয় নয় ?”

হরিশঙ্কর যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন; কহিলেন,—"কে বল্‌লে তোমায়—আমি কালীর নামে মিথ্যা মকদ্দমা করেছিলাম?"

জয়সুন্দরী।—"পাপকার্য্য শতমুখে প্রচারিত হয়।"

হরিশঙ্কর।—তুমি বিপরীত শুনিয়াছ।"

জয়সুন্দরী।—"বিপরীত বা অলীক সংবাদ শুনি নাই। সেদিন বিনোদিনী স্বমুখে সকল রহস্য প্রকাশ করে গিয়েছে। বলি, ঠাকুর-পোর প্রতি তোমার এত শত্রুতাচরণ কেন? শুকদেবের ন্যায় যাহার নির্ম্মল চরিত্র, তাহার নামে একটা জঘন্য মকদ্দমা দায়ের করতে তুমি একবার ধর্ম্মের পানে চাইলে না! ঠাকুর-পো তো কখনও তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করে নাই! ঠাকুর-পো নিয়ত তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় অনুগত। আর আমার ছোট-জা সুরসুন্দরীর কথাই বা কি বলিব? সে তো সাক্ষাৎ দেবী! এত যে উহাদের প্রতি তোমার হিংসাদ্বেষ, তথাপি আমার ছোট-জা সুরসুন্দরী নিয়ত তোমার ও তোমার পুত্রকন্যাগণের মঙ্গল-কামনা করে আস্‌ছে। হায়! তোমার কেন এমন দুর্ম্মতি ঘট্‌লো? তোমার এরূপ জঘন্য ব্যবহার মনে করে, উহাদিগকে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করে। ছি!—এমন কাজে আর হাত বাড়াইও না; আমার শ্বশুরের পুণ্যের সংসারে পাপের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিও

না! লক্ষ্মণের মত ভাই ও সীতার মত ভাজ পেয়ে, তাদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চল্‌তে পার্‌লে না! না জানি তোমার কেমন মন?"

পাপীর হৃদয় স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। এতক্ষণ হরিশঙ্কর গর্ব্ব-ব্যঞ্জক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে জয়সুন্দরীর প্রতি অবজ্ঞার তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু জয়সুন্দরী যেই কালীশঙ্করের অনাবিল উন্নত চরিত্রের গুণকীর্ত্তনে তাহার চরিত্র-হীনতার বিষয় উল্লেখ করিলেন, অমনি হরিশঙ্কর ব্যালজীবী সমক্ষে লুপ্তফণা ভুজঙ্গের ন্যায় কেমন এক রকম হইয়া গেলেন। অবশেষে অপ্রতিভের অশোভন হাস্য-সহকারে কহিলেন,—"তুমি কালীকে চিন্‌তে পার-নি। তার হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি! সে নিয়ত বিবিধ বিধানে আমার সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প।"

জয়সুন্দরীর অধর-প্রান্তে অবিশ্বাসের হাস্য স্ফুরিত হইল। তিনি কহিলেন,—"ঠাকুর-পো এদেশে দেবতার ন্যায় পূজিত। শত চেষ্টায়ও তাঁহার শুভ্র যশোরাশি ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। যাক, এক বিষয়ে তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি; দাসীর কথা পায়ে ঠেলো না। তোমার ব্যবহারে ছোট জা দেবীপ্রতিম সুরসুন্দরীর একবিন্দু অশ্রুপাত হইলে, আমার শ্বশুরের ধনধান্য-পূর্ণ সংসারের উপর দেবতার অভিসম্পাত বর্ষিত হইবে। তুমি স্বামী, নারীর একমাত্র আরাধ্য দেবতা! ভাবী অমঙ্গল আশকায়

আমার প্রাণে শান্তি মাত্র নাই, তাই এ কথা বল্‌ছি। যা বল্‌ছি, দাসীর অপরাধ নিও না।"

এই বলিয়া জয়সুন্দরী ব্যথিত-চিত্তে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দিষ্ট তারিখে কালীশঙ্কর ও তাঁহার সহকারিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মতি-ঘোষ ও বিনোদিনীর এজাহারে সকল রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। বিচারক, কালীশঙ্কর রায় প্রভৃতিকে খালাস দিয়া, রায়ে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, কালীশঙ্কর রায়—ইচ্ছা করিলে মতি ঘোষ ও তাহার সাহায্যকারীর প্রতিকূলে মিথ্যা অভিযোগ-আনয়নের অপরাধে মোকদ্দমা করিতে পারেন।

কালীশঙ্কর চিরক্ষমাশীল। তিনি বলিলেন,—"মতি দরিদ্র ও নিরীহ। সে আপন ইচ্ছায় মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে নাই। অত্যাচার-উৎপীড়ন ভয়ে সে এইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাকে দণ্ডিত করাইতে আমার ইচ্ছা নাই।"

এই মোকদ্দমা উপলক্ষে হরিশঙ্করের ঘৃণিত চরিত্র অধিকতর পরিস্ফুট হইল। সম্ভ্রান্ত-মহলে তাঁহার উদ্দেশে ঘৃণার নিষ্ঠীবন নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

কিন্তু হরিশঙ্কর অল্পে নিরস্ত থাকিবার পাত্র নহেন। এই মকদ্দমার বিফলতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হিংসাবৃত্তি ভীষণাকার

ধারণ করিল। তিনি উপর্য্যুপরি কালীশঙ্করের নামে ঘর-জ্বালানী, লুণ্ঠন, দাঙ্গা ও খুনের অভিযোগে মকদ্দমা দায়ের করাইতে লাগিলেন। কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে যে সকল সাক্ষী তাঁহার শিক্ষামত প্রমাণ-প্রয়োগ দিতে সম্মত হইয়াছিল, বিচার-কালে তাহারা কেহই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিল না। সুতরাং কালী-শঙ্কর আরোপিত সকল অভিযোগ হইতে নির্দ্দোষরূপে মুক্তিলাভ করিলেন। এই সকল মকদ্দমা উপলক্ষে একদিকে হরিশঙ্করের জঘন্য চরিত্র অধিকতর মসীমণ্ডিত ও অপর দিকে কালীশঙ্করের নির্ম্মল চরিত্র বর্ষাবিধৌত প্রভাতকমলবৎ সমধিক পরিস্ফুট হইল।

উপর্য্যুপরি অসাফল্য-জনিত মনঃক্ষোভে হরিশঙ্কর ভ্রষ্টশিকার-শার্দ্দূলবৎ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। যে সকল সাক্ষী তাঁহার সহিত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই, হরিশঙ্কর বিষম আক্রোশবশতঃ তাহাদের উপর আপতিত হইলেন। এই কারণে কালীশঙ্কর কিছুকাল অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগে কাল-কর্ত্তন করিলেন বটে; কিন্তু ক্রূর-প্রকৃতি হরিশঙ্কর আবার কখন বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলেন,— এই ভাবনায় কালীশঙ্করের চিত্তে সম্যক্ সুখশান্তি রহিল না।

সহসা কালীশঙ্কর রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দৃষ্ট হইল না। উত্তরোত্তর রোগ বৃদ্ধি। সুরসুন্দরী আহার-নিদ্রা ভুলিয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া কালীশঙ্করের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কালীশঙ্কর সুরসুন্দরীকে নিভৃতে পাইয়া কহিলেন,—"সুরো! আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তুমি বিচলিত হইও না। আমি এ যাত্রায় রোগ হইতে উদ্ধার পাইব না। তোমার প্রকৃতি জানি এবং তোমার সংকল্পও আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। সর্ব্বাগ্রে তোমাকে একটা কথা বলিয়া রাখি। ইতিপূর্ব্বেও তোমাতে আমাতে অনেক দিন এ সম্বন্ধে কত কথা হইয়াছে। আমি জন্ম-শোধ চলিলাম বলিয়া, সেই পুরানো কথাই আবার নূতন করে বল্‌ছি। প্রবৃত্তির অনুরোধে মানুষকে কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিতে নাই। ধর্ম্মসাধনের একাঙ্গ কর্ত্তব্য-পালন। কর্ত্তব্য অপালনে ধর্ম্মসাধনে ব্যাঘাত ঘটে। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, স্বামী-ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য, পুত্র-কন্যা প্রতিবেশী ও গ্রামবাসী স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য, ইহার পর কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রসারিত হইলে সমগ্র মানব-জাতির প্রতি কর্ত্তব্য,—এইরূপ বিবিধ কর্ত্তব্য মানুষকে প্রতিপালন করিতে হয়। এ সকল তোমার জানা কথা এবং তুমি নিজে যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছ। তুমি এ বিষয়ে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করলে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারি।"

সুরসুন্দরী অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া কহিলেন,—"প্রতিজ্ঞা কেন? তোমার আদেশই আমার নিকট অকাট্য বেদ বিধি। আমি কবে তোমার কোন্ আদেশ লঙ্ঘন করেছি?"

কালীশঙ্কর কহিলেন,—"তা তো জানি। তথাপি মহাপ্রস্থান-

কালে হৃদয়ের চাঞ্চল্যবশতঃ একই বিষয়ে পুনঃপুনঃ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও মন নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। মনে হয়—কি যেন হইল না, কি যেন বলিতে বাকি রহিল, আরও যেন বলা ও করা উচিত ছিল। আজ আমি তোমাকে তোমার প্রকৃতি ও সঙ্কল্পের বিপরীত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিব।"

সুরসুন্দরী অনতাজাড়ত কণ্ঠে কহিলেন,—"অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলেও তোমার আদেশ পালন করিব।"

কালীশঙ্কর অশ্রুনিষিক্ত-নয়নে সুরসুন্দরীর বিষাদ-বিমলিন মুখপানে দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলেন,—"সুরো! আমার অভাবে এ বৃহৎ পরিবারের সকল দায়িত্ব তোমার স্কন্ধে পতিত হইবে। আমার পুত্রদ্বয় যদিও লেখাপড়া শিখিয়াছে, তথাপি ইহারা বালক মাত্র। কর্ত্তব্য বোধে দুঃসহ যাতনা হইলেও তোমাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে।"

সুরসুন্দরী সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণের ভিতর শোকের ঝড় বহিতেছিল।

কালীশঙ্কর কহিলেন,—"কৈ সুরো, আমার কথার উত্তর দিলে না যে!"

সুরসুন্দরী।—"কি বলিব তোমায়! তোমার অভাবে জীবন ধারণ যদি সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিব।"

কালীশঙ্কর।—"না সুরো! তোমার উত্তরে নিশ্চিন্ত হইতে

পারিলাম না। অসম্ভবকেও কর্ত্তব্য-বোধে তোমায় সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। সুরো, ভুলিও না—তুমি শতলোকের মাতৃস্থানীয়। তোমার অভাব ঘটিলে, তোমার অসংখ্য পোষ্যবর্গকে কে পালন করিবে? কে তাহাদের বেদনাদিগ্ধ হৃদয়ে মাতৃ-স্নেহের সুধাধারা ঢালিয়া দিবে? ধৈর্য্যই নারীর একতম প্রধান ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য-পালন জন্য তোমাকে অলৌকিক ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। দেখিও, আমার নগেন সুরেনকে অনাথ করিও না। সংসারের কুটিল পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, শত্রুকে কেমন করিয়া ক্ষমা করিতে হয়, শোকে দুঃখে কেমন করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে হয়, তোমাকে বলিতে হইবে না। তোমার ন্যায় পুণ্যবতী প্রিয়কারিণী ভার্য্যার সাহায্য না পাইলে, আমার জীবন-চিত্র যে ভিন্নবর্ণে চিত্রিত হইত না, কে বলিবে? ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তোমার ন্যায় পুণ্যবতী পত্নী ও অনুগত পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া এই কুটিল সংসারের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি।"

বলিতে বলিতে কালীশঙ্কর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কণ্ঠ বিশুষ্ক, মস্তক বিঘূর্ণিত, নয়নের দৃষ্টি ক্ষীণ, হস্ত পদ অবশ, দেহগ্রন্থি শিথিল হইল। তিনি যাতনাসূচক অস্পষ্ট শব্দ করিতে করিতে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন। সুরসুন্দরী ক্ষিপ্রহস্তে আলমারী হইতে বলকারক ঔষধ খুলিয়া আনিয়া কালীশঙ্করকে সেবন করাইলেন। ঔষধ সেবনান্তে কালীশঙ্কর অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিতে

লাগিলেন। সুরসুন্দরী জনৈক চাকরাণীকে শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত রাখিয়া, স্বহস্তে পথ্য প্রস্তুত করিবার জন্য গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

রজনীতে জ্বরের প্রকোপ ও বুকের বেদনা বৃদ্ধি পাইল। কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হইল। সুরসুন্দরী, তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ সারারাত্রি শয্যাপার্শ্বে শোকাকুলচিত্তে উপবিষ্ট রহিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কষ্টময় রজনী অবসান হইল; পরদিন প্রাতে কালীশঙ্করের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল বোধ হইল।

কালীশঙ্কর সুরসুন্দরীকে বলিলেন,—"দাদাকে ডাকিয়া আনিতে নগেনকে পাঠাইয়া দাও।"

নগেন্দ্র হরিশঙ্করকে ডাকিয়া আনিল।

হরিশঙ্কর আসিলেন। কালীশঙ্করকে দেখিয়া কহিলেন,—"কালী! তোমার এমন অবস্থা! কৈ, আমাকে তো কেউ বলে নাই! রীতিমত চিকিৎসা চলিতেছে তো?"

কালীশঙ্কর ক্ষীণ ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন,—"হাঁ দাদা! চিকিৎসা চলিতেছে। কিন্তু বৃথা চিকিৎসা; এ যাত্রা রক্ষা পাইব না, তাহা নিশ্চয়।"

বিষাদজড়িত কণ্ঠে হরিশঙ্কর কহিলেন,—"ছি কালী! এমন

কথা বল্‌তে নাই! তুমি সেদিনের কালী বৈ তো নও,—হতাশ হইও না! ভয় কি ভাই! ঔষধ-পত্র সেবন কর্‌তে থাক। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, দু'দিনে সেরে উঠবে। রোগ কার না হয়—ভাই?"

কালীশঙ্কর ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"দাদা! মৃত্যুশয্যায় আপনার শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর্‌বার জন্য আপনাকে ডেকেছি। দাদা! আমার বালক পুত্রদ্বয় ও উহাদের গর্ভধারিণী রহিল। আপদ-বিপদে আপনিই উহাদের একমাত্র ভরসা-স্থল। আপনি উহাদিগকে নিয়ত স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন। আপনার স্নেহানুগ্রহে উহারা যেন আমার অভাব বুঝিতে না পারে। আর দাদা! না বুঝিয়া অনেক সময় আপনার নিকট কত অপরাধ করেছি। মৃত্যুশয্যায় আপনি সে সকল ক্ষমা করে আশীর্ব্বাদ করুন—আমার আত্মার যেন সদ্গতি হয়!"

হরিশঙ্কর কহিলেন,—"নগেন সুরেনের জন্য তুমি ভাবিও না। উহারা বালক বটে; কিন্তু শিক্ষিত। ঈশ্বর না করুন, সত্য সত্যই যদি তুমি আমাদিগকে কাঁদিয়ে অসময়ে চলে যাও, নিশ্চয় জানিও, তোমার পুত্র-পরিবার কখনই আমার পরিত্যজ্য নহে। এক্ষণে অন্য চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে, একমাত্র ভগবানের নাম স্মরণ কর।"

ইহার পর দুই চারি কথায় জীবনের আশ্বাস প্রদান করিয়া, হরিশঙ্কর স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেইদিন শেষ রজনীতে কালীশঙ্কর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে মহাপ্রস্থান করিলেন। নৈশগগন প্রকম্পিত করিয়া ক্রন্দনের মহা রোল সমুত্থিত হইল। কালীশঙ্কর অনেককেই পিতৃহীন করিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

যথাকালে মহা-সমারোহে কালীশঙ্করের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রলাল সুরসুন্দরীর উপদেশানুযায়ী জমিদারীর কাজ কর্ম্ম পরিচালনা করিতে লাগিল। কিছুকাল মধ্যেই প্রজাবৃন্দ ও জনসাধারণ বুঝিতে পারিল যে, পুত্র কর্ত্তৃক পিতার শুভ্র যশোরাশি ক্ষুণ্ণ হইবে না।

সুরসুন্দরীর দেহ শীর্ণ, বদন-শ্রী বিশুষ্ক ও লাবণ্যহীন; তিনি কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাণের ভিতর লোকলোচনের অগোচরে শোকানল ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। তিনি জন-সেবায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। পতির পারত্রিক মঙ্গল-কামনায় অচিরকাল মধ্যে তিনি দেবালয় প্রতিষ্ঠা, ঔষধালয়-সংস্থাপন, জলাশয় খনন প্রভৃতি সদনুষ্ঠান-সমূহ সম্পন্ন করিলেন। দৈনিক অন্নদান পূর্ব্ববৎ নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল।

হরিশঙ্কর দেখিলেন, কালীশঙ্করের অভাব-সত্ত্বেও তাঁহার সংসার

পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ; বরং কোনও কোনও বিভাগে পূর্ব্বাপেক্ষা শৃঙ্খলা ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। জনসাধারণের আনুরক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ; আয়ের পথ ক্রমশঃ সুগম ও প্রশস্ততর। সকল দিকে সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা দেখিয়া, হরিশঙ্কর বিস্মিত ও স্তম্ভিত! অবোধ স্ত্রীলোকের কর্তৃত্বাধীনে, একটা অপরিপক্ক-বুদ্ধি বালক দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হইতেছে, প্রবীণ হরিশঙ্কর তাহাতে অকৃত-কার্য্য। ইহা কি সাধারণের সমালোচ্য নহে? হরিশঙ্করের চিত্তে অশান্তিকর ভাবনা সঞ্চারিত হইল।

নগেন্দ্রলাল স্বভাবতঃ বিনয়-নম্র, মিষ্টভাষী ও সহৃদয়। এই বয়সেই তিনি ন্যায়-নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। জননীর শিক্ষাগুণে নগেন্দ্রলালের তদ্‌গুণরাশি উত্তরোত্তর মার্জ্জিত ও পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

নগেন্দ্রলাল বিষয়কর্ম্ম-সংক্রান্ত উপদেশ পাইবার আশায় প্রায়ই হরিশঙ্করের নিকট যাইয়া থাকে। আজও সেই অভিপ্রায়ে হরি-শঙ্কর-সদনে উপস্থিত। জমিদারী-সংক্রান্ত নানা কথার পর সদর খাজানা সম্বন্ধে কথা উঠিল। ময়মনসিংহ জেলার জমিদারীর কালেক্টারীর বর্ত্তমান কিস্তীর দেয় সদর রাজস্ব কখন কি উপায়ে প্রেরণ করা হইবে, অনেকক্ষণ তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিল।

নগেন্দ্রলাল বিনীতভাবে কহিল,—"আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপেই সদর খাজানা পাঠাইব।"

হরিশঙ্কর গাম্ভীর্য্য-সহকারে নগেন্দ্রলালকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে,—কালী ভায়া বর্ত্তমানে ময়মনসিংহের মোক্তার ন্যস্ত-বিশ্বাসের অপব্যবহার করিয়াছেন, নগেন্দ্রলালের তাহা জানা নাই; কিন্তু তিনি তাহা বিশেষরূপেই অবগত আছেন। সুতরাং সদর রাজস্ব দাখিল-বিষয়ে মোক্তারের উপর নির্ভর না করিয়া অন্য উপায়ে (যাহাতে কোনও ভয়-ভাবনার কারণ নাই, সেই উপায়ে) দাখিল করাই আবশ্যক। সদর খাজানা দাখিলের শেষ তারিখে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় টাকা ময়মনসিংহে পৌঁছিতে পারে, এইরূপ ঠিক করিয়া জনৈক বিশ্বস্ত আমলা দ্বারা খাজনা প্রেরণ করাই তাঁহার বিবেচনায় নিরাপদ। যদি নগেন্দ্রের আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে হরিশঙ্করের সরকারী সদর খাজানাও একই সঙ্গে প্রেরিত হইতে পারে। উভয় সরকারী সদর খাজানা একযোগে প্রেরিত হইলে, পথিমধ্যে বিপদ-সম্ভাবনাও দূরীভূত হইবে।

নগেন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন,—"যে আজ্ঞে, মার সহিত পরামর্শ ক'রে আপনাকে জানাব।"

হরিশঙ্কর কহিলেন,—"অবশ্য জানাইবে। ভরসা করি, বধু-মাতারও এ সম্বন্ধে অন্যমত হইবে না। আহা! কালী চলে গেল, আর আমি কিনা তার শোক-শেল বুকে করে সংসারের অশেষ জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করছি। কালী যে আমায় অকালে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে, তা কখনও ভাবি নাই। বাপু! ভ্রাতৃ-

শোক যে কি অসহনীয়, তা তোমাকে বলে বুঝান অসাধ্য। সকলই ভগবানের লীলা! আমি আর ভেবে কি করব!"

পিতার নামোল্লেখ মাত্র নগেন্দ্রলালের চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল। অতঃপর নগেন্দ্রলাল বিদায়-গ্রহণে চলিয়া আসিল। মাতৃ-সন্নিধানে জ্যেঠা মহাশয়ের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

সুরসুন্দরী আপন মনে অনেক চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"রাজসাহী ময়মনসিংহ এখান হইতে অনেক দূর বটে। পথিমধ্যে নানা বিপদ সম্ভাবনা আছে। ঠিক লাটের দিন কাছারির পূর্ব্বে টাকা পৌঁছিবে, এইরূপ স্থির করিয়া যদি সঙ্কীর্ণ সময়ে টাকা পাঠান হয়, আর ঈশ্বর না করুন পথিমধ্যে কোনও বিপদ ঘটে, তাহা হইলে সদর হইতে পুনর্ব্বার টাকা প্রেরণের সময় থাকিবে না। সুতরাং মহাল নিলামে চড়িবে। বলা বাহুল্য যে, ময়মনসিংহের সম্পত্তিই তোমাদের মূল্যবান সম্পত্তি। আমার বিবেচনায় জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর হেপাজাতে উপযুক্ত সংখ্যক রক্ষী পুরুষ সঙ্গে দিয়া কাল সদর খাজনার টাকা তথাকার মোক্তারের নিকট পাঠান হউক। মাত্র আট দিন সময় আছে। আর বিলম্ব করা উচিত নহে।"

নগেন্দ্রলাল কহিলেন,—"জ্যেঠা মশায় রাগ করিবেন না তো?"

সুরসুন্দরী।—"না, তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লে, তিনি রাগ কর্‌বেন না। কালই সদর খাজানার টাকা পাঠান হবে, এই সংবাদ

তাঁকে জানান সঙ্গত বটে। জনৈক আমলাকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দাও, সকল কথা তাঁকে খুলে বলে আসুক।"

"তাহাই করিব।"—এই বলিয়া নগেন্দ্রলাল চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সুরসুন্দরী কহিলেন,—"শোন নগেন, ময়মনসিংহের মোক্তার এ সরকারের বহুকালের পুরাতন কর্ম্মচারী। তিনি আমাদের একান্ত হিতৈষী—তোমার অভিভাবক-স্থানীয়। সম্মান-সহকারে তাঁহাকে পত্রাদি লিখিও।"

পরদিন সদর খাজানার টাকা প্রেরিত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

খাজানা প্রেরণের দ্বিতীয় দিবস শেষ বেলায় আমলা ও রক্ষী পুরুষগণ ক্ষতবিক্ষত-দেহে ফিরিয়া আসিল। তাহারা জানাইল যে, পূর্ব্ব রাত্রিতে মদনগঞ্জের চটিতে দস্যু কর্ত্তৃক সদর-খাজানার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে।

রজনী প্রহরার্দ্ধ। হরিশঙ্কর সায়ংকৃত্য সমাপনান্তর শয়ন-কক্ষে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। ভার্য্যা জয়সুন্দরী ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত। তাঁহার বদন শ্রী বিষাদ-মলিন, গণ্ডস্থল-প্রবাহিত অশ্রুরেখা অবিশুষ্ক।

জয়সুন্দরী অনুযোগ-সহকারে কহিলেন,—"বলি, শ্বশুর ঠাকুর বিপুল অর্থ রেখে গিয়েছেন, তাহাতে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হ'ল

না, অবশেষে ডাকাতি কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছ! তোমার এ অধঃপতন দেখ্‌বার পূর্ব্বে কেন এ হতভাগিনীর মৃত্যু হল না!"

জয়সুন্দরীর অনুযোগ-বাক্যে হরিশঙ্কর কেমন যেন সঙ্কুচিত ও অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। পাপীর এমন দশাই ঘটে। পুণ্যের সমক্ষে পাপ চিরকালই শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত। হরিশঙ্কর সহসা কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন,—"জয়সুন্দরী! আজ তোমার একি মূর্ত্তি,—একি ভাব! কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নে!"

জয়সুন্দরী দেখিলেন, হরিশঙ্কর কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি কহিলেন,—"নাও, নেকামি করো না! জান সব, বুঝেছ সব, স্বীকার কর্‌বে না, তাই বল। তুমি স্বীকার কর বা না কর, কিন্তু জেনো, পাপকার্য্য কখনও গোপন থাকে না। সহস্র-নেত্র ও সহস্র-জিহ্ব ধর্ম্ম তাহা প্রচার করেন। পাপী শত চেষ্টাতেও তাহা রোধ কর্‌তে পারে না!"

হরিশঙ্কর বিস্মিতের ভাণ করিয়া কহিলেন,—"আমার কোন্ কুকার্য্য লক্ষ্য করে আমার প্রতি তীব্র অনুযোগ বর্ষণ কর্‌ছ, তা তো এখনো বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নে! খুলে বল, কবে কোন্ পাপ কার্য্য করেছি!"

মানুষ যে কার্য্য আপন স্ত্রীপুরুষের নিকট প্রকাশ কর্‌তে কুণ্ঠিত হয়, যে কার্য্য লোক-লোচনের অন্তরালে রাখ্‌বার জন্য

নিয়ত অশান্তিকর চেষ্টা করে, সে কার্য্য অবশ্য পবিত্র পুণ্যময় নহে। যাহা বিবেক অননুমোদিত, সমাজ কর্ত্তৃক যাহা নিন্দিত, নৈতিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ, রাজবিধানে দণ্ডার্হ, তেমন কার্য্য অতি অল্প লোকেই অম্লানবদনে স্বীকার করিতে পারে। হরিশঙ্কর তাহা পারিলেন না।

জয়সুন্দরী ব্যথিতকণ্ঠে কহিলেন,—"নারীর পতিই একমাত্র আরাধ্য দেবতা। দেবতার কার্য্যে দোষ-গ্রহণ পাপজনক, সন্দেহ নাই; কিন্তু কি করিব, পোড়া মন যে প্রবোধ মানে না! তোমার নামে শত অক্লান্ত-রসনা কলঙ্ক-প্রচার করছে, তা আমি আর সহ্য করতে পারি না। দেবতার অধঃপতন ভক্তের প্রাণে বিষম আঘাত প্রদান করে। তুমি কতকগুলি কুচরিত্র লোকের পরামর্শে গভীর পাপ-পঙ্কে ডুবিতেছ দেখিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না। নগেন, সুরেন, সংসার-জ্ঞানবিহীন ক্ষুদ্র বালক, তোমার পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন! বিশেষতঃ ঠাকুর-পো মৃত্যু-শয্যায় ছেলে-দু'টিকে তোমার হাতে স'পে দিয়ে গিয়েছেন। তুমি কিনা বৎসর যেতে না যেতে উহাদের সর্ব্বনাশ-সাধন মানসে উহাদের প্রেরিত সদর খাজানার টাকা লুটে নিয়েছ! একবার ভাব দেখি—তোমার কি অধঃপতন ঘটেছে!"

বলিতে বলিতে জয়সুন্দরীর নীলোৎপলসন্নিভ নয়নযুগলে অশ্রুবিন্দু সঞ্চারিত হইল। তিনি বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন,—

"দাসীকে চিরদুখিনী ক'রো না। আমার শ্বশুরের সোণার সংসারে স্বহস্তে অনল জ্বেলো না। আপনি পুড়িয়া মরিবে, অপর দশজনকেও পুড়াইয়া মারিবে।"

হরিশঙ্কর বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, জয়সুন্দরী যাহা শুনিয়াছেন, তাহা শত্রুগণের হিংসাবিজৃম্ভিত অলীক কল্পনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ইহার মূলে একবিন্দু সত্যও নিহিত নাই। তাঁহাকে কলঙ্কিত উপহাসিত করিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ ঘটনার প্রচার হইয়াছে। নগেন—সুরেনের এই প্রবৃত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে কালীশঙ্কর হইতে প্রাপ্ত। নগেনের পক্ষীয় লোকের দ্বারাই হরিশঙ্করের প্রতিকূলে অলীক অপবাদ প্রচারিত হইয়াছে। জয়সুন্দরী যেন অলীক ঘটনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকে অনুযোগ না করেন।

স্বামীর বাক্যে অবিশ্বাস করা নারীর পক্ষে অকর্ত্তব্য হইলেও জয়সুন্দরী ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন,—"সত্য কথায় দেবতা কচিৎ রুষ্ট হন। তুমিও স্বরূপ-বাক্যে দাসীর উপর রাগ ক'র না। এক পাপ কার্য্য ঢাক্‌তে গিয়ে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, পাপ-সঞ্চয় ক'রো না—আমার সাধের ফুল-বাগান পাপের অনলে ভস্মীভূত ক'র না। হায়! আমার প্রাণের বেদনা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। আমি যেন দেখিতেছি, চারিদিক হইতে বিপদের ঘনছায়া

ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। এক মুহূর্ত্তের তরেও প্রাণে শান্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

হরিশঙ্কর কহিলেন,—"বলিয়াছি তো, এ সকল অলীক কল্পনা মাত্র। তুমি যদি অলীক সংবাদের উপর নির্ভর ক'রে সাধ ক'রে প্রাণের শান্তি হারাও, তা'হলে আমি আর কি কর্‌ব?"

সেই ঘটনার রজনীতে ভীম সর্দ্দার কয়েক তোড়া টাকা হরিশঙ্করকে দিয়া গিয়াছিল; জয়সুন্দরী সে সংবাদও জানিতে পারিয়াছেন। সে কথাও তিনি উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। হরিশঙ্কর বুঝাইলেন,—সেগুলি মহালের খাজানা; তহশীলদার কর্ত্তৃক প্রেরিত।

আজ জয়সুন্দরী, হরিশঙ্করের ক্রোধ-বিরক্তির ভয় দূরে রাখিয়া, তাঁহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জয়সুন্দরী শুনিয়াছেন,—নগেনদের যে সকল কর্ম্মচারীর জিম্বায় সদর-খাজনার টাকা প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সকল কর্ম্মচারী, ডাকাতদলের মধ্যে হরিশঙ্করের কতিপয় বেতনভোগী ভৃত্যকে চিনিতে পারিয়াছে। আর ডাকাতি-মোকদ্দমার তদন্তকারী পুলিশকে হরিশঙ্কর সহস্র রৌপ্য-মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়াছেন।

জয়সুন্দরী কহিলেন,—"তবে এ সকল সংবাদ তোমার নামে রাষ্ট্র হইল কেন?"

হরিশঙ্কর দেখিলেন,—তাঁহার পাপকার্য্য গোপন থাকে নাই। তাঁহার বড় ভয় হইল এবং জয়সুন্দরীর প্রতি ক্রোধ সঞ্চারিত হইল। হরিশঙ্কর, কুটীল-রক্তিমলোচনদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন,—"তুমি স্ত্রীলোক, এ সকল খবরাখবরে তোমার কি প্রয়োজন? সাবধান জয়সুন্দরী! এ সকল বিষয়ে তুমি আর কখনও আমায় বিরক্ত করিও না।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কালীশঙ্করের অন্য এক ভ্রাতা দুর্গাশঙ্কর, প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত এক কন্যা ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বর্ত্তমান রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দুর্গাশঙ্কর চরম-পত্র দ্বারা তাঁহার স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি কালীশঙ্করকে দিয়া যান। তাঁহার বালিকা দুহিতা পারিজাত, কালীশঙ্কর ও তৎপত্নী সুরসুন্দরীর স্নেহের স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছিল। পিতৃব্য ও পিতৃব্য পত্নীর স্নেহরসাভিষিক্ত পারিজাত, একদিনের তরেও পিতৃমাতৃ-স্নেহের অভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

বিমাতা অধিকাংশ স্থলে সপত্নী-সন্তানের প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্রা। পারিজাতের বিমাতা-সম্বন্ধেও সে সাধারণ নিয়মের অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

কালীশঙ্কর যথাকালে মহাসমারোহে সদ্বংশজাত পাত্রের হস্তে পারিজাতের বিবাহ দিয়াছিলেন। সুরসুন্দরী অশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে পারিজাতকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিয়া আপন বৃহৎ ভবন শূন্য-বোধ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর কালীশঙ্কর প্রায়শঃ জামাতা-সহ পারিজাতকে আপনাদের কাছে আনিয়া রাখিতেন—কত আদর-সোহাগ করিতেন। কালীশঙ্করের পর-লোক-প্রাপ্তির পর সুরসুন্দরী বৎসরের অধিকাংশ সময় পারি-জাতকে আপনার কাছে রাখিয়া স্নেহের পূতধারায় তাহাকে পরিতৃপ্ত রাখিয়া আসিতেছিলেন।

কিন্তু সহসা এক বিপরীত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল । পারিজাতকে শ্বশুরালয় হইতে আনিবার জন্য সুরসুন্দরী শিবিকা পাঠাইয়াছিলেন। পারিজাত, গৃহস্থালী-সংক্রান্ত অরক্ষণীয় কার্য্যের ভাণ করিয়া, সুরসুন্দরীর প্রেরিত শিবিকা ফেরত পাঠাইল।

সুরসুন্দরী অশ্রুসিক্ত নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিলেন,—“এ মাসের কয়টা দিন্ যাউক ; পুনর্ব্বার শিবিকা পাঠাইয়া পারিজাতকে আনিয়া লইব।”

সহসা নির্ম্মল আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে জলদপটল বিস্তৃত ঘনীভূত হইয়া প্রবল প্রভঞ্জনের সূচনা বিঘোষিত করিল। সুরসুন্দরী—বিস্মিত, স্তম্ভিত ; নগেন্দ্র দুঃখিত

ও চিন্তিত হইল। পারিজাত পৈতৃক সম্পত্তি দাবী করিয়া আদালতে মকদ্দমা রুজু করিয়াছে।

সুরসুন্দরী সহসা এ সংবাদ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন,—ইহা অসম্ভব। শত্রুপক্ষীয় কোনও লোক এই অলীক সংবাদ প্রচার করিয়া থাকিবে। পারিজাত কথনও এমন নীচ ও স্নেহমমতাশূন্য হইতে পারে না।

অচিরে সদর মোকামের মোক্তারের পত্রে সকল সংশয় দূর হইল। নগেন্দ্র, মোক্তারের প্রেরিত পত্র হস্তে করিয়া জননী-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিল,—"মা! সহসা এ কি হইল! দিদি সত্য সত্যই আমাদের নামে নালিশ দায়ের করিয়াছেন! মোক্তার মহাশয় সেই সংবাদই জানাইয়াছেন।"

সুরসুন্দরীর পবিত্র বদন-শ্রী বিষাদের কৃষ্ণছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল। নীরব নিস্তব্ধ সুরসুন্দরী মনে মনে ভাবিলেন—"স্নেহের বন্ধন কি এতই শিথিল যে, স্বার্থের আকর্ষণে দু'দিনে ছিন্ন হইয়া যাইবে?" পারিজাতের কোনও বাসনা কোনও অভাবই তো তিনি অপূর্ণ রাখেন নাই! নগদে জিনিস-পত্রে প্রতি বৎসর প্রায় তিন হাজার টাকা করিয়া তিনি তাহাকে দিয়া আসিতেন। ইহার উপর পারিজাত যখন যাহা চাহিত, তখনই সুরসুন্দরী নির্ব্বিকারে অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাহা যোগাইতেন।"

জননীর বিষাদ-সমাচ্ছন্ন মুখপানে চাহিয়া, নগেন্দ্র কোনও কথা

বলিতে পারিল না। জননীকে চিন্তা-কাতর দেখিয়া, সে তাহার হৃদয়ে বেদনা বোধ করিতে লাগিল। নগেন্দ্র নীরবে দণ্ডায়মান রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সুরসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন,—"নগেন, তুমি বাছা এক কাজ করিও;—পারিজাতের সহিত দেখা ক'রে মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করে ফেলিও। নিরর্থক অর্থ ব্যয় করে কোনই লাভ নাই। পারিজাত তোমাদের পর নয়। তোমরা যেমন আমার সন্তান, পারিজাতকেও তেমনই মনে করিও। ভাই বোনে মকদ্দমা চলিতে থাকিলে, দশ জনে নিন্দা করিবে। পারিজাতের পৈতৃক সম্পত্তি আমরা ছলে-বলে আত্মসাৎ করি নাই। কর্ত্তার পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও ভাশুরঠাকুর উইল করে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁকে দিয়ে গিয়েছেন। পারিজাত যদি তাহার পিতৃদান ফিরিয়ে নিতে চায়, নিয়ে যাক,—আমরা আপত্তি ক'রব না। পারিজাত তাহার পৈতৃক সম্পত্তির জন্য লালায়িত—যদি আগে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা আপনা হতেই তাকে জমিদারীর কতক অংশ ছেড়ে দিতাম। কর্ত্তারও এমন ইচ্ছা ছিল। ভগবানের অভিপ্রায় অন্যরূপ; কাজেই তিনি তাঁহার বাসনা পূর্ণ করে যেতে পারেন-নি।"

নগেন্দ্র কহিল,—"মা, আমার নিকট ইহা বড়ই বিচিত্র ঘটনা বলে বোধ হচ্ছে। দিদি কোন্ প্রাণে আমাদের নামে

মকদ্দমা দায়ের কর্‌লেন? দিদি আমাদিগকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন, কত স্নেহ আদর করিতেন। জানি-না—দিদি কেন আমাদিগকে পর করে তুল্‌তে চাহেন। আচ্ছা মা, শীঘ্রই দিদিকে দেখ্‌তে যাব। দেখে আসি, এ যাত্রা দিদি আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন।"

সুরসুন্দরী কহিলেন,—"আমার মনে এরূপ ভরসা আছে যে, পারিজাত তোমার মুখ দেখে মকদ্দমা চালাবার কথা একেবারে ভুলে যাবে। তবে বাছা, বিলম্ব করে কাজ নেই; দুচার দিন মধ্যেই একটী ভাল দিন দেখে রওনা হও। পার যদি, পারিজাতকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।"

"তাহাই করিব"—এই বলিয়া নগেন্দ্র মাতার নিকট বিদায় লইয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতৃ-আদেশে পারিজাতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নগেন্দ্র স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

জননী-সমক্ষে আসিয়া নগেন্দ্র হতাশ-চিত্তে কহিল,—"মা! সকল যত্ন-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। দিদি মকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিতে সম্মত নহেন।"

সুরসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"হায়,

আমার স্নেহের পারিজাত সহসা এমন পাষাণ হয়েছে যে, একবার তোমাদের মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লে না!"

নগেন্দ্র কহিল,—"না মা, দিদির ইহাতে তত দোষ নেই। দিদি, তাঁহার স্বামীর ও অপর দশ জনের মন্ত্রণানুসারে মকদ্দমা দায়ের করেছেন। ইহাতে তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। অশ্রু-প্লাবলো দিদি আমার সহিত ভাল করে কথাবার্ত্তা কইতে পারেন নাই। কিন্তু মা! দিদির স্বামীর অভদ্রোচিত ব্যবহারে নিতান্ত ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছি।"

ইহার পর নগেন্দ্র, তথায় যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, একে একে সমস্ত বিবৃত করিল। পারিজাতের মন্ত্রণাদাতৃগণ আপোষ-নিষ্পত্তির ঘোরতর বিরোধী। তাহারা বলে—'নরেন্দ্র নাবালক; এক্ষণে আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া গেলে, নরেন্দ্র সাবালক হইয়া তাহা পণ্ড করিতে পারিবে।' সুতরাং তাহারা পারিজাতের দাবী আদালত কর্ত্তৃক সাব্যস্ত করিয়া লইতেই বিশেষ ব্যগ্র ও কৃতসঙ্কল্প।

সুরসুন্দরীর প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। পারিজাত,—যাহাকে তিনি বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, যাহার সুন্দর মুখমণ্ডলে ঈষৎ বিষাদের ছায়া পতিত হইলে তিনি আকুল হইয়া পড়িতেন,—সেই পারিজাত তাঁহার জীবিত-কালেই দূরে সরিয়া পড়িতেছে। ইহা ভাবিয়া তাঁহার কমল-নয়নে অশ্রু সঞ্চারিত হইল।

তিনি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন,—"নগেন! আপোষ-

নিষ্পত্তির যখন আশাই রহিল না, তখন জনৈক বিচক্ষণ উকীল দ্বারা বর্ণনা প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিও। সদরের মোক্তার তোমাদের চিরহিতৈষী ও অবস্থাভিজ্ঞ। এ সরকারের আভ্যন্তরিক সমস্ত বিষয়ের সংবাদ তিনি রাখেন। তাঁহার সাহায্যে বর্ণনা প্রস্তুত করান তোমার পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু নগেন, আমি বুঝিতে পারি না, পারিজাত কেন মকদ্দমা দায়ের করিয়াছে! পারিজাত যদি চাহিত, তাহা হইলে তোমাদিগকে বলিয়া কহিয়া জমিদারীর কতকাংশ তাহাকে ছাড়িয়া দিতাম।"

নগেন বিস্মিতভাবে কহিল,—"তা হ'লে মা, মকদ্দমার তদ্বির করে আর কি হবে? দিদিকে যাহা দিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছ, দিদি তাহা নিয়ে যা'ন।"

সুরসুন্দরী বুঝাইলেন,—"বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মকদ্দমার তদ্বির করা তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। মকদ্দমা দায়ের হইবার পূর্ব্বে তোমরা যদি পারিজাতকে ডেকে এনে জমিদারীর কতক অংশ তাহাকে ছেড়ে দিতে, তাহা হইলে তোমাদের সহৃদয়তা সদাশয়তা প্রকাশ পাইত। এখন মকদ্দমা রুজু হওয়ার পর যদি কতকাংশ ছেড়ে দিতে হয়, তাহা হইলে কর্ত্তার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হইবে; লোকের ধারণা জন্মিবে যে, কর্ত্তা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার পৈতৃক সম্পত্তি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করিতেছিলেন। তাঁহার শুভ্রযশোরাশি

তোমাদিগকে অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। ইহাতে যে কর্ত্তার কোনই স্বার্থাভিসন্ধি ছিল না, তাঁহা সপ্রমাণ করিতে হইবে। ভগবানের প্রসাদে তোমরা যদি মকদ্দমায় জয়লাভ কর, তাহা হইলেও পারিজাতকে বঞ্চিত করিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

নগেন্দ্রলাল ব্যথিত কণ্ঠে কহিল,—"মকদ্দমায় জয়লাভ করার পক্ষে আমাদের কতদূর আশা-ভরসা আছে, বল্‌তে পারি-নে।"

সুরসুন্দরী পুত্রকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন,—"মকদ্দমায় জয়লাভের পক্ষে কতকগুলি প্রবল হেতু বর্ত্তমান আছে। সদরের মোক্তার সে সকল হেতু অবগত আছেন।" আরও বুঝাইলেন যে, অনেকগুলি সম্পত্তি নগেন্দ্রের পিতৃব্যের পরলোক-প্রাপ্তির পর সদর খাজানার নীলামে সুরসুন্দরীর অর্থে ও নামে খরিদ হইয়াছে, এবং পৈতৃক সম্পত্তি যাহা আছে, তাহার কতকাংশ হাতছাড়া হইলেও নগেন্দ্রকে তত ক্ষোভ করিতে হইবে না।

নগেন্দ্র কহিল,—"মা, দিদিকে মকদ্দমা দায়ের কর্‌তে অনেক টাকা খরচ কর্‌তে হয়েছে। দিদি এত টাকা কোথায় পেলেন? দিদির তো তেমন অবস্থা নয় যে, তিনি মকদ্দমার খরচ বহন কর্‌তে সক্ষম!"

সুরসুন্দরীর বুঝিতে বাকি ছিল না যে, পারিজাতের পক্ষে মকদ্দমার খরচ কোথা হইতে সংগ্রহ হইতেছে। তিনি যাহা অনুমানে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, অচিরে তাহাই ধ্রুব-সত্য রূপে প্রতিপন্ন হইল। হরিশঙ্করের উত্তেজনায় এবং তাঁহারই অর্থ-

সাহায্যে যে পারিজাত মকদ্দমা দায়ের করিয়াছে, তাহা নগেন্দ্রকে খুলিয়া বলিলেন।

নগেন্দ্র দুঃখিত-চিত্তে কহিল,—"জ্যেঠা মহাশয়ের নিকট আমরা যে কি অপরাধ করেছি, জানি-না। তিনি নিয়তই আমাদের অনিষ্ট-সাধনে বদ্ধপরিকর!"

সুরসুন্দরী কহিলেন,—"কারণ একমাত্র ভগবানই জানেন। যাহা হউক, বাছা, তোমরা তোমাদের জ্যেঠা-মহাশয়ের প্রতি কখনও অশ্রদ্ধা বা অসম্মান প্রকাশ করিও না। নগেন! তুমি সংসারে নূতন প্রবেশ করেছ। তোমাকে অনেক ঝঞ্ঝট অনেক বিপদ নীরবে সহ্য করিতে হইবে। দেখিও বাছা, সুখ-দুঃখে কখনও বিচলিত হইও না, সত্য ও ধর্ম্মপথ কখনও পরিত্যাগ করিও না। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে নিয়ত যত্নশীল থাকিও। মনে অন্যায় লাভের আকাঙ্ক্ষা কখনও পোষণ করিও না। প্রজাবৃন্দকে পুত্রবৎ স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিও; অথচ, তাহাদের অন্যায় কার্য্যে কখনও প্রশ্রয় দান করিও না। প্রজাগণ যেন তোমাকে দস্যুর ন্যায় ভয় না করে, পিতার ন্যায় ভক্তিমিশ্রিত ভয় করে,—তাহাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিও। যে স্থলে ভয়মূলক আনুগত্য, সে স্থলে কোনও কারণে ভয় দূর হইলে কেহ আর আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহেন না,—ইহাই সংসারের রীতি, মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম। প্রজার হৃদয়ের উপর আধিপত্য

স্থাপন করিতে পারিলেই বুঝিব, তুমি জমিদারীর শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ। কর্ত্তা যে নীতি অবলম্বনে বিষয়-কর্ম্ম পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই কতক আভাষ তোমায় প্রদান করিলাম। আর কি বলিব বৎস!—তোমরাই আমাকে সংসার-বন্ধনে জড়াইয়া রাখিয়াছ। তোমাকে সংসারাভিজ্ঞ দেখিতে পাইলেই সংসার পরিত্যাগ করে জীবনের অবশিষ্ট কাল তীর্থধামে অতিবাহিত করিব মনে করিয়াছি। ভগবান জানেন, আমার এ বাসনা পূর্ণ হইবে কি না?"

নগেন্দ্র কহিল,—"মা, তোমার অমোঘ আশীর্ব্বাদ ও উপদেশই আমার জীবন-পথের নিয়ামক। তোমার আশীর্ব্বাদে, সুখ-দুঃখে কখনও কর্ত্তব্য-বিমুখ হইব না!"

"ভগবান তাহাই করুন!"—এই বলিয়া সুরসুন্দরী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

উভয় পক্ষেই খুব জেদের সহিত মকদ্দমার তদ্বির-তদারক চলিতে লাগিল। অবশেষে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল।

হাইকোর্টে পারিজাতের অনুকূলে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছিল। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলে নগেন্দ্রের জয়লাভ ঘটিল। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষে বহু অর্থব্যয় হইয়া গেল।

পারিজাতের পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব হরিশঙ্কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। পারিজাতের সহিত তাঁহার এইরূপ সর্ত্তে চুক্তি হইয়াছিল যে, মকদ্দমায় জয়লাভ করিলে পারিজাত তাহার পৈত্রিক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ হরিশঙ্করকে লিখিয়া দিবে; যদি মকদ্দমায় পরাজয় ঘটে, তাহা হইলে মকদ্দমার দরুণ সমস্ত খরচের টাকার দায়ী হরিশঙ্করকে হইতে হইবে। একমাত্র কালীশঙ্করের সংসারের অধঃপতন কামনায়, হরিশঙ্কর বিপুল অর্থ-ব্যয়ের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিংসার উত্তেজনায় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়,—পরিণাম-ফলের প্রতি লক্ষ্য করিতে কচিৎ অবসর ঘটে।

মকদ্দমার পরাজয়-সংবাদে হরিশঙ্করের মস্তকে যেন অশনিপাত হইল। অর্থনাশে হৃদয়ে অনুতাপের তুষানল জ্বলিয়া উঠিল। এদিকে লোক-নিন্দার সহস্র রসনা হরিশঙ্করের কলঙ্ক প্রচার করিতে লাগিল।

যাহা হইবার, তাহা হইয়া গেল। সুরসুন্দরী কিন্তু সেই অপ্রীতিকর ঘটনার স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিলেন। তিনি পারিজাতকে আনিবার জন্য আবার শিবিকা পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে একখানি পত্র লিখিলেন,—"পারিজাত—বাছা, অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই। তোমাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ বড় আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে। তোমাকে একবার কোলে লইয়া তোমার মুখচুম্বন করিতে পারিলে, সকল দুঃখ সকল বেদনা

ভুলিয়া যাইব। তোমার জন্য পথপানে চাহিয়া রহিলাম। তোমাকে না দেখিয়া জলবিন্দু স্পর্শ করিব না।"

পত্র পাঠ করিতে করিতে, পারিজাতের নয়নপ্রান্ত দিয়া অশ্রু-প্রবাহ প্রবাহিত হইল। এ অশ্রু—অনুতাপের অশ্রু। মাতৃসমা পিতৃব্য-পত্নীর প্রাণে বেদনা দিয়াছি বলিয়া পারিজাত অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইতে লাগিল।

পারিজাত মনে মনে কহিল,—"মাকে কেমন করে এ কালামুখ দেখাব!"

পারিজাতের শৈশবকালে মাতৃবিয়োগ হয়। সুরসুন্দরীকেই সে মা বলিয়া জানিত। পারিজাত স্বামীকে পত্র দেখাইল। তিনিও লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। অনেক ইতস্ততেঃর পর পারিজাত অবশেষে যাওয়াই স্থির করিল।

সুরসুন্দরী পারিজাতকে ক্রোড়ে স্থান দিলেন। মকদ্দমায় জিত হইলেও পারিজাতের মান-সম্ভ্রম রক্ষার উপযোগী বিষয়-সম্পত্তি তাহাকে দান করিলেন। দেশ মধ্যে সুরসুন্দরীর প্রশংসার অবধি রহিল না।

এদিকে প্রিভি কাউন্সিলের মকদ্দমার দায়ে, হরিশঙ্কর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত খরচার দায়ী তাঁহাকে হইতে হইল; আর সেই খরচার দায়ে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আটক পড়িল। তাঁহার প্রজারা তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া ছিল। সুতরাং

তাহারা কেহই কোনরূপ সাহায্য করিল না; পরন্তু এখন অবসর পাইয়া তাঁহার নিজের কর্ম্মচারিগণই তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মানুষের যখন অর্থসামর্থ্য থাকে, মদমত্ত মন সুহৃজ্জনের সুপরামর্শে কর্ণপাত করে না। তখন আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ অযাচিত বন্ধু-বান্ধব আসিয়া পরামর্শ দেয়; প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী পদদলিত হন।

জয়সুন্দরী সারাজীবন পতির মতি-পরিবর্ত্তনের প্রয়াস পাইতেছিলেন; কিন্তু কোনই সুফল ফলে নাই; পরন্তু পদে পদে তাঁহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতেই হইয়াছিল।

আজ যখন দারুণ দুর্ব্বিপদের বিষয় স্মরণ করিয়া হরিশঙ্কর মুহ্যমান্ হইলেন, কপোলে করবিন্যাস করিয়া আকাশ-পাতাল ভাবনার বিভোর হইলেন; জয়সুন্দরী স্বাভাবিক ধীর-মন্থর-গতিতে নিকটে আসিলেন; মৃদুস্বরে কহিলেন,—"কেন অত ভাব্ছো? ভগবানকে ডাকো; তিনি উপায় কর্বেন।"

হরিশঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আর উপায়! সব গিয়েছে—শেষে পথের ভিখারী হ'তে হ'ল!"

জয়সুন্দরী বিনীত-স্বরে কহিলেন,—"সারাজীবন আমার কোনও কথা শোনো নাই; আজ একটা কথা শোন'।"

হরিশঙ্কর কহিলেন,—"আর কোনও কথা শোনবার নেই।

আমি এমনেও পথে ব'সেছি, অমনেও পথে ব'সেছি। যা হবার হয়ে যাক্। আর কোনও কথা কয়ো না।"

জয়সুন্দরী কহিলেন,—"সারা জীবনে আমার একটি কথাও শোনো-নি। আজ আমার শেষ অনুরোধ, রাখ্‌তেই হবে।"

হরিশঙ্কর।—যখন শোন্‌বার ক্ষমতা ছিল, তখন যখন শুনি-নি; এখন এ অক্ষম অবস্থায় শোনা-না-শোনা উভয়ই সমান।

জয়সুন্দরী।—যাই হোক, তুমি এখনও আমার কথা রাখ।

হরিশঙ্কর।—রাখবার ক্ষমতা আর নেই! তবে বল্‌বে, বল, শুনি।

জয়সুন্দরী ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন,—"ডিক্রীর দায়ে মাড়োয়ারী মহাজনকে যে বিষয়টা লিখে দেবে, তা হবে না। আমি বলি কি, নগেন তো তোমার ভাইপো, ডিক্রীর দাবী শোধ গিয়ে যা কিছু সম্পত্তি থাক্‌বে, তাকেই বরং লিখে দাও। পৈতৃক সম্পত্তি বংশের দুলাল ভোগ করুক।"

হরিশঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন। জয়সুন্দরী তাঁহাকে এমন বিসদৃশ উপরোধ করিবেন, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি একটু বিরক্তির স্বরে কহিলেন,—"ও সব কথা আর কেন? ও আমি এক রকম স্থির করেই ফেলেছি। মাড়োয়ারী এলেই আমি সই ক'রে দেব।"

জয়সুন্দরী বাধা দিয়া কহিলেন,—"ও কথা আর মনেও এনো

না। সে কাজ কিছুতেই করো না। আমার শ্বশুরের ভিটে, অন্য লোকে এসে দখল ক'র্‌বে, আমি তা কখনই করতে দেব না। পিতৃপুরুষের নাম স্মরণ করে, তোমার পায়ে পড়ি, আমার অনুরোধ রাখ।"

এই বলিয়া জয়সুন্দরী পতির পদযুগলে মস্তক লুটাইলেন; অশ্রুজলে পতির পদতল সিক্ত হইল।

হরিশঙ্কর একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলেন; পরিশেষে কহিলেন,—"ভাল জয়সুন্দরী, তোমার যা ইচ্ছা, তাই পূর্ণ হোক।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই সময়েই পরিচারিকা আসিয়া জয়সুন্দরীকে ডাকিল,—"মা! একবার এদিকে আস্‌বেন তো!"

জয়সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া পরিচারিকা অন্তঃপুরের অন্য অংশে প্রবেশ করিল। জয়সুন্দরীকে দেখিবা মাত্র, নগেন্দ্রলাল আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইল। অনেক দিনের পরে স্নেহের পুতলি নগেন্দ্রলালকে বাটীতে আসিতে দেখিয়া, জয়সুন্দরীর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি আহ্লাদে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

নগেন্দ্রলাল কহিলেন,—"জ্যেঠাই মা! আপনাদের আশীর্ব্বাদে সকলই মঙ্গল।"

জয়সুন্দরী।—"বাবা, তোমাকে দেখে আজ আমার বড় বিষাদে বড় হর্ষ হয়েছে। বাবা, কর্ত্তার সহিত এতক্ষণ তোমারই কথা হচ্ছিল। যদি তিনি কিছু দুর্ব্যবহার ক'রে থাকেন, গুরুজন বলে, ভুলে যাও বাবা!"

নগেন্দ্র।—"জ্যেঠাই মা! ও সব কথা বলে আর লজ্জা দেন কেন? আমরাই জ্যেঠা মহাশয়ের চরণে শত অপরাধী। তাঁহার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছি। তিনি হয় তো মনে করেছেন, তাঁর সম্পত্তি আমরা নিলাম করিয়ে নিচ্ছি; কিন্তু জ্যেঠাই-মা, আপনি গুরুজন, আপনার সামনে বলছি, আমাদের ভ্রমেও কখনও সে ইচ্ছা হয়-নি। এই দেখুন, আপনাদের সম্পত্তি আপনাদের নামেই আমি খরিদ করেছি। মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন; আপনার কাছে চুপি চুপি এই খবরটা দিয়ে যাবার জন্য।"

এই বলিয়া নগেন্দ্রলাল জ্যেঠাই-মার চরণতলে একখানি কাগজ রক্ষা করিলেন। হরিশঙ্করের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি জয়সুন্দরীর নামে নিলামে খরিদ করা হইয়াছে—সেই কাগজ তাহার নিদর্শন।

জয়সুন্দরী আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন,—"তুমিই বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে! ভগবান করুন,—তুমি দীর্ঘজীবী হও। আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হোক।"

উপসংহার

নগেন্দ্রলাল জ্যেঠাইমার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে, জয়সুন্দরী পুনরায় পতির নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন।

হরিশঙ্কর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। অতীতের শত স্মৃতি তাঁহার মানস-পটে জাগিয়া উঠিল। যে কালীশঙ্কর তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, তাহার প্রতি তিনি কি দুর্ব্ব্যবহারই না করিয়াছেন! সুরসুন্দরী যে দেবীপ্রতিম, এতদিন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। নগেন্দ্রলালের হৃদয় যে এতদূর মহত্বপূর্ণ, তাহা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। সারাজীবন যে বিষম ভ্রম করিয়া আসিয়াছেন, এখন কেবলই সেই কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। জয়সুন্দরী তাঁহাকে পূর্ব্বাপর সদুপদেশ দিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তৎপ্রতি তিনি কর্ণপাতও করেন নাই। তজ্জন্যও তাঁহার বড় অনুশোচনা হইতে লাগিল।

হরিশঙ্কর কহিলেন,—"দেখ, এত দিন আমি যে অন্যায় ক'রে এসেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবু যতটুকু পারি, তারই চেষ্টা

পায় নাই, আসেও নাই। যাহারা অসুখ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারাও এত বড় রোগ—তাহা জানিতে পারে নাই।

পার্ব্বতীর এক পুত্র হরকুমার ও এক কন্যা তারা। তারার বয়স এগার বৎসর; কিন্তু সে বিধবা। হরকুমার ও তারা জননীর যৎপরোনাস্তি সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল। কিন্তু সেবা-শুশ্রূষায় কি হইবে? চিকিৎসা হইল না। বালক-বালিকা কেবল সেবা করিয়াছে ও কাঁদিয়াছে। মাতার কাতরতায় তাহাদের মনে যত ব্যথা লাগিয়াছে, তাহারা তত কাঁদিয়াছে। কোনক্রমেই রাত্রি কাটিল না। সকাল হইল। বালক-বালিকা পিতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পার্ব্বতী পতিপরায়ণা সতীলক্ষ্মী; পার্ব্বতীও স্বামীর জন্য কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন; পার্ব্বতী বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরাধাম ত্যাগ করিতে হইবে; একবার স্বামীর পাদপদ্ম দেখিয়া যাইতে পারিলে, জীবনটা সার্থক হয়, মরণটা সার্থক হয়; তাই পতিকে পাইবার জন্য পার্ব্বতী এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আসিলেন না।

বেলা বাড়িতে লাগিল, রোগ বাড়িতে লাগিল; পার্ব্বতী, তারা ও হরকুমারের কষ্ট বাড়িতে লাগিল; গৃহস্বামীর দর্শন নাই। বালক-বালিকা কেবল ঘর-দ্বার করিতেছিল; একবার করিয়া মাতার গায়ে হাত বুলায়, মাতাকে মুছাইয়া দেয়, মাতার তৃষ্ণার জল দেয় ও দৌড়িয়া রাস্তায় গিয়া পিতা

আসিতেছেন কিনা—দেখিয়া আইসে। ক্রমে বেলা এগারটা হইল। বাড়ীর ভিতর কেবল কাতরতা ও কান্না। রোগিণী মরিতেছেন, চিকিৎসা হইতেছে না।

হঠাৎ পথে গাড়ীর শব্দ হইল। পিতা আসিতেছেন মনে করিয়া, হরকুমার দৌড়াইয়া গিয়া পথে দাঁড়াইল। গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীতে পিতা নহে, 'অন্নদা' ডাক্তার। ডাক্তারকে দেখিয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল। ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করাতে হরকুমার সকল কথা নিবেদন করিল।

অন্নদা বাবু পরম দয়ালু, দয়ার্দ্রচিত্ত। একে সুন্দর শিশু; তাহার উপর সে কাঁদিতেছে; অবহিত চিত্তে বালকের সকল কথা শুনিয়া তিনি গলিয়া গেলেন। বালকের সঙ্গে রোগিণীর গৃহে প্রবেশ করিয়া, বেশ যত্ন করিয়া পার্বতীকে পরীক্ষা করিলেন।

পরীক্ষার ফলে ডাক্তার বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, আরোগ্যের কোনও আশা নাই; কিন্তু এ কথা বালক-বালিকাকে না বলিয়া একখানা ব্যবস্থা-পত্র লিখিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই ডাক্তার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গৃহস্থের কি অবস্থা। গৃহে দুইটা ভাঙ্গা টিনের বাক্স, তক্তপোষ ভাঙ্গা, বিছানা ছেঁড়া ও ময়লা, মশারি ছেঁড়া, ঘরের মেজের মাদুরের উপর রোগিণী শায়িতা। দুই একটা থালা, ঘটি, গেলাস আছে; তাহাও ভাঙ্গা।

ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা তো আমার ভিজিট দিতে পারিবে না; ঔষধ কিনিতে পারিবে?"

হরকুমার বলিল,—"ঔষধের কড়ি কোথায় পাইব? আমাদের কাছে এক পয়সাও নাই। বাবা আসিলে, তবে হইবে।"

ডাক্তার।—"বাবা কোথায়?"

হরকুমার।—"তিনি কালীসিংহের বাগানে গেছেন।"

ডাক্তার।—"কখন আসিবেন?"

হরকুমার।—"তা জানি না; তাঁর আসিবার ঠিক থাকে না।"

ডাক্তার।—"আচ্ছা, আমার বাড়ীতে যাও। ঔষধ ও যে সকল জিনিষ-পত্র লিখিয়া দিয়াছি, সব দৌড়াইয়া গিয়া আন। দাম লাগিবে না, আমি লিখিয়া দিতেছি।"

ডাক্তার বাবু ব্যবস্থা-পত্রের উপর আরও কি লিখিয়া দিলেন। বালক চলিয়া গেল। ডাক্তার বাবু তারাকে ডাকিয়া দশটি টাকা দিয়া 'আবার আসিব' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

(২)

হরকুমার ঔষধ ও জিনিষ-পত্র আনিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত মাতৃ-সেবায় মনোযোগ দিল। ভ্রাতা ও ভগিনীর আশা হইল,—'ডাক্তার দেখিয়াছেন, তবে মা ভাল হইবেন।'

ক্রমে পার্ব্বতী অসাড় হইয়া পড়িলেন; কেবল একবার স্বামীর উদ্দেশে কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। বালক-বালিকা আসন্ন

কথাটা না বুঝিয়া বুঝিল,—'মার ঘুম আসিয়াছে, মা ভাল হইবেন।' বেলা একটা বাজিয়া গেল। বালক-বালিকা তখনও কিছু খায় নাই। ঘরে কিছু আহার্য্যও নাই, খাবার বিষয় মনেও নাই।

সহসা আবার গাড়ীর শব্দ হইল। হরকুমার ছুটিয়া রাস্তায় গেল। একখানা বড় জুড়ি গাড় হইতে তাহার পিতা নামিলেন। হরকুমারের পিতা মাধব ঘোষাল একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। কলিকাতার সকল ধনী লোকের বাড়ীতে তাঁহার যাতায়াত। সন্ধ্যার পর তাঁহার কোন-না-কোনও বাটীতে গান গাহিবার ও সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ থাকে। মাধবের বেশ ভূষা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; কাপড়-চোপড়ে আতর-গোলাপের সুগন্ধ। পিতাকে দেখিয়াই হরকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা বলিল।

মাধব ঘোষাল ধীর মন্থর পদবিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষে বসিলেন। তারা কাঁদিয়া উঠিল। ক্রন্দনে মুহূর্ত্তের জন্য পার্ব্বতীর চৈতন্য হইল। পার্ব্বতী গড়াইয়া আসিয়া স্বামীর পদে আপনার মস্তক রাখিলেন; একবার ঊর্দ্ধে চাহিলেন; স্বামীর সহিত আবার চারি চক্ষুর মিলন হইল; বলিলেন,—"আমি চল্লুম। ছেলেরা, হর, তারা—"

কণ্ঠরোধ হইল, চক্ষু দিয়া জল পড়িল, মাথা লুটাইয়া পতির পদে পড়িল। পার্ব্বতীর প্রাণ-পাখী উড়িয়া গেল।

মাধব ঘোষাল যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তখনও তাঁহার

চক্ষু মদান্ধকারিত ছিল। অন্ধকার কাটিয়া গেল; তিনি সব দেখিতে পাইলেন। চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। হরকুমার ও তারা ঘোর রোলে কাঁদিতে লাগিল।

মাধব ঘোষাল আবার চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। পতিপ্রাণা, চির-উপেক্ষিতা, সন্তানবৎসলা পার্ব্বতীর মৃতদেহ পদপ্রান্তে। পতিব্রতা এতক্ষণ তাঁহারই জন্য প্রাণ রাখিয়াছেন। যমের আহ্বানেও পতির অনুমতি না লইয়া যাইতে পারেন নাই। পতি আসিলেন, তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু কোথায়? নিশ্চয়ই স্বর্গে। মাধব কত কি ভাবিতে লাগিলেন; পার্ব্বতীর বিবাহ অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যত ঘটনা হইয়াছিল, মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িল যে—তিনি পার্ব্বতীকে প্রহার করিয়াছেন, সে নীরবে প্রহার সহ্য করিয়াছে; তাহার পিতৃদত্ত অলঙ্কার বন্ধক দিয়া মাধবের নিজের বেশভূষা হইত, সেই সকল অলঙ্কার পার্ব্বতী প্রফুল্লচিত্তে স্বামীর হস্তে দিত। তিনি একদিনের জন্য পার্ব্বতীকে আদর করেন নাই। পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ কি করিয়া হইত, তাহা পার্ব্বতীই জানিত। ভাবনা অপার। মাধব ঘোষাল অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে রোদনের একটা বিরাম আসিল। তারা জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, এখন কি হবে? সৎকার কি করে হবে?"

মাধব।—"কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না।"

তারা।—"বাবা, একটা তো বিহিত ক'র্‌তে হবে। তোমার বন্ধুবান্ধবদের ডেকে আন না!"

মাধব।—"আমার বন্ধুবান্ধব সব বড়লোক, তারা আস্‌বে কেন?"

তারা।—"তাই তো, তবে কি হবে?"

হরকুমার।—"আমি দেখিতেছি।"

হরকুমার উঠিয়া গেল। যে মার শরীর বজায় রাখিবার জন্য হরকুমার এতক্ষণ যুঝিতেছিল, এখন সে সেই মার শরীর বিদায় করিতে ব্যস্ত হইল। প্রথমে কিয়ৎক্ষণ পথে এদিক ওদিক ঘূরিল; কাহাকে ডাকিবে, এ বিপদে কে উদ্ধার করিবে,—কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পরে তাহার পণ্ডিত মহাশয়কে মনে পড়িল। পণ্ডিত মহাশয় হরকুমারকে ভালবাসিতেন। সুতরাং হরকুমার একেবারে পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় চলিয়া গেল। কিন্তু এখান হইতে হরকুমারকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইল। পণ্ডিত মহাশয়ের শরীরটা ভাল নয় ও তাঁহার এমন কোনও লোকের সঙ্গে আলাপ নাই, যাহারা শবদাহ-কার্য্যে সহায়তা করে। হরকুমার আরও কিছুক্ষণ পথে পথে ঘুরিয়া, গৃহে ফিরিয়া আসিল।

হরকুমার আসিয়া দেখিল, বাড়ীতে অনেক লোক আসিয়াছে, ডাক্তার বাবুর অনুগ্রহে সকল আয়োজন হইয়া গিয়াছে। লোক-জন শব লইয়া ও হরকুমারকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে চলিয়া গেল।

(৩)

পনের দিন কাটিয়া গিয়াছে, অশৌচান্ত হইয়া গিয়াছে। মাধব ঘোষাল ইতিমধ্যে একদিনও বাড়ীর বাহিরে পা দেন নাই। ডাক্তার বাবু দত্ত দশটি টাকা তারার আঁচলে ছিল। তাহাও শেষ হইয়া আসিয়াছে; কেবল দুইটী মাত্র পয়সা বাকি আছে। সন্ধ্যার সময় একখানা গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল। তখনও মাধব বা তাহার পুত্র-কন্যার রাত্রিকালের আহার হয় নাই। মাধব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, ফুলবাবুটি সাজিয়া, চলিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন, —"একটু বেশী রাত্রিতে ফিরিব, তোরা থাস্‌নে, খাবার আনিব।"

বালক-বালিকা বসিয়া রহিল। রাত্রি এগারটা বাজিল, মাধব ফিরিলেন না। হরকুমার এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিল। ভাই ভগিনী মুড়ি খাইয়া শয়ন করিল ও কিয়ৎক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িল।

বালক-বালিকা প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিল,—পিতা আসেন নাই। তারা গৃহ পরিস্কার করিল, কর্ম্ম শেষ হইয়া গেল। আর তাহাদের কোনও গৃহকর্ম্ম ছিল না। সম্বল একটী মাত্র পয়সা; তাহাতে রাঁধিবার উদ্যোগ হইতে পারে না। বেলা হইলে, পিতা খাবার আনিবেন আশায় তাহারা বসিয়া রহিল।

ক্রমে বেলা বাড়িল, মাধব আসিলেন না। তাহারা অনাহারে বসিয়া আছে; ক্ষুধার জ্বালা তাহারা কতকটা সহ্য করিতে শিখিয়াছিল। তাহাদের কষ্ট—আজি বড় নির্জ্জন। মা গিয়াছেন, সব গিয়াছে, বুকের

হাড় খসিয়া গিয়াছে। পিতা অনুপস্থিত, তাই বড় কষ্ট। তাহারা আশ্রয়শূন্য, অবলম্বনরহিত ; তাই কষ্টে ভাই-ভগিনী অনেক কাঁদিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল। ঘরে প্রদীপ পড়িল না। ভাই-ভগিনী অনাহারে শুইয়া পড়িল। অনেক রাত্রি হইয়া গেল, মাধব আসিলেন না, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রত্যুষে মাধব ফিরিলেন। তখনও হরকুমার শয্যায়। তারা ঘরের কাজ সারিয়াছে, অর্থাৎ ঘর পরিস্কার করিয়াছে। মাধবের সেই অবস্থা। চক্ষু রক্তাভ, পা টালতেছে, কথা হদদদ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সে কাজ ভুলে নাই, যাহা কিছু একটু দেরী হইয়াছে। রুমালে বাঁধিয়া লুচি সন্দেশ আনিয়াছে, কিছু পয়সাও আনিয়াছে! বাবুদের গাড়ীতে না আসিয়া, গাড়ী ভাড়ার টাকা লইয়াছিল। তাহা হইতে চারি আনা বাঁচিয়াছে,—এই কথা সে আপনার পুত্র-কন্যাকে জানাইল।

বালিকা হইলে কি হয়! তারা ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা! এ খাবার খাইতে সে আপত্তি করিল। একদিকে অনাহার, অন্যদিকে অস্পৃশ্য খাদ্য। না খাইয়া একদিন কাটিয়া গিয়াছে। তথাপি সে অনাহার শ্রেয়ঃ মনে করিয়া, ভাইকে ও পিতাকে খাবার খাওয়াইয়া, অন্তরে কষ্ট ও মুখে প্রসন্নতা দেখাইয়া বসিয়া রহিল।

অপরাহ্ন আসিল, তারা খাইল না। মাধব তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, সে বুঝিল না। তখন মাধব পকেট হইতে তারার

হাতে চারি আনার পয়সা ফেলিয়া দিয়া কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহিরে গেলেন।

হরকুমারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। সে অর্দ্ধবেতনে নিকটস্থ স্কুলে পড়িত; তাহাও তিন মাস দেওয়া হয় নাই। পাঠশালার কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় ভালবাসিতেন বলিয়া হরকুমারের বিশ্বাস ছিল; কিন্তু সে বিশ্বাস টুটিয়াছে। যেদিন পার্ব্বতীর মৃত্যু হয়, সেই দিন হইতেই সে আর পণ্ডিত মহাশয়ের মুখদর্শন করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছিল। হরকুমার বালক হইলে কি হয়; সে যে ভয়ানক দরিদ্র, তাহা সে জানিত। কিন্তু মমতাহীন লোকের কাছে, উপকারের সম্ভাবনা থাকিলেও বালকেরা যাইতে পারে না।

তিন চারি দিন মাধব ঘোষাল ফিরিলেন না। পিতা যে লুচী-সন্দেশ আনিয়াছিলেন, তাহাতে হরকুমারের দুই দিন চলিল ও এক পয়সা করিয়া মুড়ি খাইয়া তারার দিন কাটিল।

হরকুমার ও তারা উভয়েই বেশ পড়িতে পারিত। ঘরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত ছিল, আরও খানকতক নাটক ছিল। দিনের বেলায় তারা পড়িত হরকুমার শুনিত, হরকুমার পড়িত তারা শুনিত। এই করিয়া দিন কাটিল। বাড়ীতে রান্নাবান্না ও রাত্রিতে ঘরে প্রদীপ দেওয়া, এ সকল আর হইল না। যাহাতে কোনপ্রকারে পয়সা খরচ না হয়, তারা

তাহাই করিতেছিল। লুচি-সন্দেশ ফুরাইয়া গেল, ভাই-ভগিনী দুই পয়সার মুড়-মুড়কি খাইয়া দিন কাটাইয়া দিল।

মাধব ঘোষাল যখন বাড়ী আসিলেন, তখন সকাল বেলা। বালক-বালিকা পিতাকে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেল; পিতাও পুত্র-কন্যাকে আদর করিলেন। আজি মাধব সেই অবস্থায় আসেন নাই, আজি স্বাভাবিক অবস্থা। মাধব পকেট হইতে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া তারার নিকট ফেলিয়া দিলেন। বালক-বালিকার বড় আনন্দ হইল। আজ পিতা বাড়ীতে থাকিবেন, আরও আনন্দ। তাহারা অনেক দিন ভাত খায় নাই, আজ খাইবে; তাহাদের মনের সুখ আর ধরে না।

মাধব ঘোষাল—বাবু মানুষ, বাজারে যাইতে পারেন না, আর বাজার করিতেও জানেন না; কারণ, কখনও এত নীচ কর্ম্ম করেন নাই। হরকুমার খুব শিশুকাল হইতেই বাজার করিতেছে, সেই বাজার করিয়া আনিল। হাঁড়ি চড়িল; রান্না হইল, সকলে মহা তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন।

দুই তিন দিন পরে আবার মাধব ঘোষাল ডুব মারিলেন। তারা এগার বৎসরের বালিকা; কিন্তু সে গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি কাটিয়া গেল, পিতা আসিলেন না; তারা বড় ভাবনায় পড়িলেন। তাহার ভাবনা—কি করিয়া দিন চলিবে। হর-কুমারের লেখাপড়া হইল না, তবে উহার দশা কি হইবে। পিতা—

বাবু মানুষ, তিনি কি সংসার দেখিবেন? তারা নানা ভাবনা ভাবিতে লাগিল। গৃহে খাদ্য-সংস্থান ছিল; রান্নাবান্না করিল, ভাইকে খাওয়াইল, নিজে খাইল, দিন কাটিয়া গেল। রাত্রি আসিল, হরকুমার পান্ত ভাত খাইল। কিন্তু তারার সারারাত্রি ঘুম হইল না; নিজেদের দশা—বিশেষতঃ হরকুমারের কি হইবে, ভাবিয়া, তারার মন আকুল হইয়া গেল।

পর দিন প্রভাতে উঠিয়া, তারা হাসিমুখে ঘর পরিষ্কার করিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া হরকুমারকে নাপিত ডাকিতে বলিল। হরকুমার মাতার মৃত্যু হইতে একদিনের জন্যও ভগিনীর কথা কাটায় নাই, এবারেও কাটাইল না। নাপিত আসিলে তারা আপনার চুল ছোট করিয়া ছাঁটাইয়া পয়সা দিয়া নাপিতকে বিদায় করিয়া দিল।

(৪)

তারাসুন্দরী চুল কাটিলেন। হরকুমারের বড় কষ্ট হইল। কেন যে কষ্ট, কিসের কষ্ট, সে তাহা বড় বুঝিতে পারিল না; কিন্তু কষ্ট, ভারি কষ্ট। চক্ষে জল আসিতে লাগিল, বুক গুর্‌গুর্‌ করিতে লাগিল। চুল কাটিবার সময় সে কিছু বলে নাই; কিন্তু এখন আর থাকিতে পারিল না, বলিল,—"দিদি, তুই চুল ছাঁটলি কেন?"

তারা।—"আমি ভাই বিধবা মানুষ, চুল রেখে কি কর্‌ব?"

হরকুমার।—"তুই তো অনেক দিন বিধবা হয়েছিস্‌, তবে আজ কেন চুল ছাঁটলি?"

তারা।—"ওরে তখন মা ছিলেন, তাই ছাঁটিনি।"

হরকুমার।—"তবে এখন তো বাবা আছেন, তবে কেন চুল ছাঁটাল? বাবা বুঝি কেউ নয়? বাবা বুঝি বকবে না?"

কথা শুনিয়া তারা কাঁদিয়া ফেলিল। হরকুমারও দিদির কান্না দেখিয়া কাঁদিল! পরে তারা উত্তর করিল,—"বাবা কি আর আসবে? বাবা পালিয়েছে। বাবা দুই তিন দিন ধরে আপনার নিজের কাপড়, জামা, চটি জুতা সরিয়েছে। তোর জন্য চারিটা জামা ও আমাদের জন্য দু'জোড়া কাপড় টিনের প্যাট্‌রায় রেখে দেছে। সেদিন বেরবার সময় একখানা দশ টাকার নোট চুপি চুপি বালিসের নীচে রেখে চলে গেল। বাবা কি কখন এ সব করে? তুই দেখিস্‌নি; আমি বাবার কাণ্ডকারখানা সব দেখেছি।"

হরকুমার।—"দূর, বাবা আস্‌বেই আস্‌বে। কাপড় জামা এনেছে, টাকা রেখেছে, ভালই করেছে।"

তারা।—"ওরে হাবা, তা নয়। বাবা কি কখনও আমাদের আদর করে? একদিন আদর করলে কেন?"

হরকুমার।—"বাবা আস্‌বে না তো তুই চুল ছাঁটলি কেন?"

তারা।—"ওরে হাবা, তবে শোন্‌। বাড়ীওয়ালার এক বৎসরের ভাড়া দেওয়া হয়-নি। সে নিত্তি নিত্তি কত বকাবকি করে শুন্‌তে তো পাস্‌? সে দিন সে বাবাকে যাচ্ছেতাই শুনিয়ে দিলে। সেকি আমাদের আর বাড়ীতে থাকতে দেবে? আমাদের তাড়িয়ে দেবে।"

হরকুমার।—"তাড়িয়ে দেয়, চলে যাব। তুই চুল ছাঁটলি কেন ?"

তারা।—"ওরে শোন্ শোন্, গোল করিস্নি। তুই বেটা ছেলে, তুই তো রাস্তায় দাঁড়াবি। আমি যে মেয়েছেলে, আমি যাব কোথায় ? তুই কি আমায় পথে দাঁড় করিয়ে চলে যাবি ?"

হরকুমার আবার কাঁদিয়া ফেলিল। তারা সান্ত্বনা করিল। হরকুমার বলিল,—"দিদি, তবে আমাদের কি হবে ?"

তারা।—"আমি যা বলি, তাই কর। এখনও টাকা আছে, ভাত আছে, কাপড় আছে। তুই রোজ রোজ ভাত খেয়ে ছাপা-খানায় ছাপাখানায় ঘুরে একটা কাজের যোগাড় কর। বাড়ীওয়ালা উঠিয়ে দিলে, আমরা আর ভবানীপুরে থাক্‌বো না। তুই যে ছাপাখানায় কাজ কর্‌বি, সেইখানে আমরা ঘরভাড়া নিয়ে থাক্‌ব। আমিও ব্যাটাছেলে সেজে ছাপাখানার কাজ কর্‌বো। সেখানে তুই আমাকে দাদা বল্‌বি। আমাদের আর কে চেনে ?"

হরকুমার।—"তোর শ্বশুর-বাড়ীর তারা যদি তোকে দেখে চিন্‌তে পারে ?"

তারা।—"আমার শ্বশুর-বাড়ীতে আছে কে ? বুড় শ্বশুর-শাশুড়ী, তারা কি কখনও কল্‌কেতায় আসে ? তারা আমার কখনও খোঁজ করে না।"

হরকুমার।—"আর বাবা যদি আসে ?"

তারা।—"তা হলেও তুই ছাপাখানায় কাজ কর্‌বি। আমি

রেঁধে তোকে আর বাবাকে ভাত দেব! বাবা বাড়ীভাড়া চুকিয়ে দেবে, আমরা এইখানেই থাক্‌ব।"

হরকুমার।—"আর তুই যে চুল ছেঁটেছিস্।"

তারা।—"বাবা বক্‌বে না, আমি তাঁকে বুঝিয়ে দেব।"

হরকুমার বুঝিল, কাঁদিল, ভগিনীর প্রস্তাবে সম্মত হইল।

(৫)

নিত্য নিত্য হরকুমার কর্ম্ম অন্বেষণ করিতে লাগিল। আট বৎসরের বালক, কে তাহাকে কর্ম্ম দিবে? হরকুমার দেখিতে অতি সুন্দর; তাহাকে দেখিয়া লোকের মায়া হইত; কিন্তু কেহ তাহাকে কর্ম্ম দিত না। দশ পনের দিন ঘুরিয়া সে বহুবাজারে একটা ছাপাখানায় কর্ম্ম যোগাড় করিল। বেতন চারি টাকা। বালক কৃতকার্য্য হইয়া, বাড়ী আসিয়া, তারাকে কর্ম্মের কথা বলিল। দুই জনেরই মনে আশা হইল, বুঝি দারিদ্র্যের অবসান হইল।

সেইদিন সন্ধ্যার পর মাধব ঘোষাল বাড়ীতে আসিলেন: পুত্র-কন্যাকে লইয়া অনেক আদর করিলেন। তারা বড় কাহিল হইয়া গিয়াছে বলিয়া বড় দুঃখ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাহার মাথার চুল যে ছাঁটা হইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন না। বালক-বালিকার কোনও কষ্ট হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। তারা কষ্টের কথা অস্বীকার করিয়া বলিল যে, তাহারা বেশ সুখে আছে, নিত্যই রান্না হইতেছে, খাওয়া হইতেছে। এই সকল কথা-বার্ত্তার পর,

হরকুমারের যে চাকরী হইয়াছে, তারা সেই কথা পিতাকে বলিল। মাধব ঘোষাল চমকিয়া উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, হরকুমার কি স্কুলে যায় না?"

তারা।—"না; তিন চার মাস মাইনে দেওয়া হয়-নি; স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

মাধব।—"শালারা তো ভারি পাজি দেখ্‌তে পাই; তার পর?"

তারা।—"তার পর, হর চাকরী যোগাড় করেছে।"

মাধব।—কে যোগাড় করে দিলে?"

তারা।—"আপনিই যোগাড় করেছে, কে আর করে দেবে? আমাদের কি কেউ খবর নেয়?"

মাধব।—"খবর আর নেয় না কি? কেন এই বাড়ীওয়ালা বেটা রাত দিন তো ভাড়া ভাড়া ক'রে খেয়ে ফেলে! হরকুমার চাকরী যোগাড় করেছে—বেশ করেছে।
তা বৌ-বাজার ভবানীপুর রোজ রোজ হাঁটাহাঁটি কর্‌তে পার্‌বে?"

তারা।—"তা পার্‌বে বৈ কি? গরীবের ছেলে, না পার্‌লে হবে কেন?"

মাধব ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন,—"দেখ তারা, তোকে আর গিন্নীপনা কর্‌তে হবে না। তুই গরীব গরীব করে দিবা-রাত্রি গালাগালি দিস্ কেন? তোর শ্বশুর গরীব, আমরা গরীব নয়। এককালে দেশে আমাদের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হত।

সে সব তোরা দেখিস্ নি তাই। তোরা জন্মে অবধি তো আমাদের কষ্ট! আমার যে এক পয়সা নেই, আমার চেহারা চাল্‌চোল দেখ্‌লে কেউ বুঝ্‌তে পারে? আমাকে রাগান্‌-নে।"

কথোপকথন বন্ধ হইল। কারণ, তারা আর কিছু বলিল না। পিতার অনুযোগটা কি, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পিতা যে বড় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল। পিতৃবৎসলা কন্যা আর কিছু বলিল না। আপনার ভাগ্যকে তিরস্কার করিল। তারা রাঁধিয়া পিতা ও হরকুমারকে খাওয়াইল। নিজেও কিছু খাইল। সকলেই শয়ন করিলেন।

পিতা পুত্র নিদ্রা গেল, কিন্তু তারার নিদ্রা হইল না। সে পিতার [illegible] মনে করিতে লাগিল। গরীব বলিলে পিতা রাগ করিলেন কে[illegible] স্কুলের বেতন দেওয়া হয় নাই, স্কুলওয়ালারা হরকুমারকে [illegible] হইয়া দিয়াছে,—তাহাতে পিতা তাহাদিগকে গালাগালি [illegible] কেন? এতদিন তো স্কুলওয়ালারা হরকুমারকে অবেতনে পড়াইতেছিল; তাহারা তো আমাদের অনেকটা উপকার করিয়াছে। যাহাদের বাড়ীতে থাকি, তাহারা ভাড়া চায়; পিতা তাহাদিগকে বা গালি দেন কেন? বাড়ীওয়ালা এতদিন ভাড়া ফেলিয়া রাখিয়াছে, সেটা তার দয়া নয়!

তারা অনেক ভাবিল, কিছুই কিনারা পাইল না। তাহার পর তাহার নিজের কথা ভাবিল। "আমি জন্মিয়াছি, সেইদিন হইতে

আমাদের কষ্ট,—বাবা তো এই কথা বলিলেন। কৈ, মা তো এ কথা বলেন নাই। তাঁহার মুখে তো শুনিয়াছি, মার বাপ মা ভাই ভগিনী ছিল না; তাই তাঁহার বিবাহ হইতেছিল না। তাঁহার বাপের জ্ঞাতিরা খরচের ভয়ে গরীব দেখিয়া বাবার সহিত মার বিবাহ দিয়াছিলেন! অথবা, হবেই বা, আমি জন্মাইতে কষ্ট বাড়িয়া গেল। আমি নিশ্চয়ই হতভাগিনী। হতভাগিনী না হইলে, বিবাহ হইতে না হইতেই স্বামী কেন নিজ বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, আমাকে চিরদুঃখিনী করিয়া, কালের কোলে আশ্রয় লইলেন?"

অন্ধকারে অদৃশ্যে তারার চক্ষুজলে বালিশ ভাসিয়া গেল।

তারা সারারাত্রি ঘুমাইল না। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া, ঘরের কার্য্য সারিয়া রাঁধিতে গেল। তারার বড় ভয়, পাছে বেলা হয়। হরকুমার আজি নূতন চাকরীতে যাইবে, তাহাকে অনেক হাঁটিতে হইবে। তারার পরিশ্রম বিফল হইল না। পিতা ও ভাইকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া দিল। হরকুমার কর্ম্মে গেল; পিতাও চলিয়া গেলেন। তারা আহারাদি করিয়া যেমন মহাভারত খুলিল, অমনি ঘুমাইয়া পড়িল।

বৈকালে উঠিয়া, বিছানা ঝাড়িতে গিয়া, তারা বালিশের নীচে দুইটি টাকা পাইল। বুঝিল—পিতা রাখিয়া গিয়াছেন; তবে আর কিছু দিন আসিবেন না। বেলা থাকিতে থাকিতে রাঁধিয়া

লইল; কারণ, কাজ করিয়া আসিয়া হরকুমার খাইবে। আর সন্ধ্যার পর, খরচের ভয়ে প্রদীপ জ্বালিতে তারার দারুণ অনিচ্ছা।

সন্ধ্যার সময় বেশ প্রফুল্ল-মনে হরকুমার ফিরিয়া আসিল। তারা তাহাকে খাওয়াইয়া নিজে কিছু খাইল। শয়ন করিতে যাইবে; এমন সময় বাড়ীওয়ালা আসিয়া ভাই-ভগিনীকে ডাকিয়া মাধব বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিল। বালক-বালিকা তাহার নিকট সত্য কথা কহিল।

মাধব বাবুর নিত্য-অঙ্গীকার ও শতবার অঙ্গীকার-ভঙ্গের কথা বাড়ীওয়ালা তাহাদিগকে শুনাইল। কোনরূপ রূঢ়বাক্য ব্যয় না করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া গেল,—"তোমাদিগকে ভাড়া দিতে হইবে না; কিন্তু তিন দিনের মধ্যে তোমাদিগকে বাড়ী ছাড়িতে হইবে। আমি আর ক্ষতি স্বীকার করিতে পারি না। মাধব বাবুকে চিনিতে অনেক দিনই পারিয়াছি; তোমরা শিশু, তোমাদিগকে আর কি বলিব?"

তারা এ কথার জন্য প্রস্তুত ছিল; কিন্তু হরকুমার বড় বিচলিত হইল। তাহার ভাবনা,—সে ভগিনীকে লইয়া কোথায় যাইবে? সে কোথায় স্থান পাইবে?—কাঁদিয়া কাঁদিয়া তারাকে সব কথা বলিল। তারা তাহাকে পূর্ব্ব পরামর্শের কথা স্মরণ করিয়া দিল, মধুসূদন রক্ষা করিবেন বলিয়া ভাইকে সাহস দিল। অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত দুই জনে এই কথাই হইল; নূতন চাকরীর কথাও হইল।

বৌবাজারে এক টাকায় একখানা ঘর ভাড়া করিবে ও তাহারা দুই বেলা মুড়ি খাইয়া থাকিবে, স্থির হইয়া গেল। পিতার আশা তাহারা ছাড়িয়া দিল।

(৬)

পরদিন সন্ধ্যার সময় যখন হরকুমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তখন সে সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছে। পিতার সহিতও দেখা হইয়াছিল; তিনি ও হরকুমার উভয়ে মিলিয়া বহুবাজারের জেলেদের বাড়ীর একটা খোলার চালের ঘর মাসিক এক টাকা ভাড়ায় স্থির করিয়াছেন। মাধব বাবুও এক মাসের ভাড়া বাড়ী-ওয়ালাকে অগ্রিম দিয়াছেন। এখন উঠিয়া যাইলেই হয়। মাধব বাবু একজন বড়মানুষের বাড়ীতে থাকিবেন; মধ্যে মধ্যে রাত্রি-কালে আসিবেন। দিনের বেলায় ঐরূপ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে তাঁহার লজ্জা হইবে। তারাও বেটাছেলে সাজিয়া চাকরী করিবে শুনিয়া তিনি তাহার বুদ্ধি-কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন।

সকল আপদ মিটিয়া গেল। সেই রাত্রিতেই ভাই-ভগিনী উভয়ে মিলিয়া যাহা কিছু সামান্য জিনিষ-পত্র লইয়া বহুবাজারের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। তারা গাড়ীর ভিতরেই বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছিল।

পরদিন সকালে হরকুমার মুড়ি খাইয়া ছাপাখানায় গেল। যতদিন না তারার চাকরী হয়, ততদিন উভয়ে দুই বেলা মুড়ি

খাইয়া কাটাইবে, ভাই-ভগিনী এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল। যখন পিতা টাকা দিবেন, তখন অবশ্য রান্না হইবে। এই সঙ্কল্প অনুসারে কয়েক দিন চলিল। বাড়ীওয়ালা জেলে ও তাহার পরিবার এইটা লক্ষ্য করিতেছিল; ভাড়ার জন্য তাহাদের ভাবনাও হইয়াছিল। কিন্তু মাসের ভাড়া অগ্রিম পাইয়াছে; সুতরাং বলিবার কিছু ছিল না। মাসকাবারে তারা বাড়ীওয়ালাকে পুনরায় এক টাকা ভাড়া দিতে চাহিল; সে টাকা লইল; কিন্তু তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। সে তো এত দারিদ্র্য ও সততা দেখে নাই।

জেলের নাম—পীতাম্বর। তাহার বাড়ীর সম্মুখে একজন উচ্চদরের গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বাড়ী। ব্রাহ্মণের নাম হরকালী মুখোপাধ্যায়। হরকালী বাবুর এক ছেলে—নাম যামিনী। ছেলেটি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে। দেখিতে বেশ সুন্দর ও বলিষ্ঠ; বয়স ১৮।১৯। বাড়ীতে আর দুইটী শিশু কন্যা; একটী পাঁচ বৎসরের ও একটী আট বৎসরের। ইহাঁরা হরকালী বাবুর কনিষ্ঠ মৃত সহোদর গঙ্গানারায়ণের কন্যা।

পীতাম্বর হরকালী বাবুকে সব কথা বলিল। তারাকুমার ও হরকুমার নিত্য দুই বেলা মুড়ি-মুড়কি খাইয়া কাটায় শুনিয়া তাঁহার মনে বড় ব্যথা লাগিল। তখন মধ্যাহ্ন, বাড়ীর খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে। তিনি আপনার গৃহিণীকে

দরিদ্র বালক-বালিকার কথা বলিলেন। পরে উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া, পীতাম্বরকে দিয়া তারাকুমারকে ডাকিয়া আনাইলেন। হরকুমারের ও তারাকুমারের সম্বন্ধে গৃহস্থ ও গৃহিণীর অনেক কথা হইল।

হরকালী বাবু তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা ভাত খাও না কেন?"

তারা।—"আমাদের দুই ভাইয়ের আয় চারি টাকা। দুই বেলা ভাতে চারি টাকায় কুলায় না। আমরা এক টাকা বাড়ী দিই, দুই টাকায় খাই ও এক টাকা থাকে। তাহাতে প্রদীপের তৈল ও কাপড় কাচিবার সাজিমাটী প্রভৃতি হয়।"

গৃহিণী।—"আহা-হা! বাছার আমার এমন সুন্দর চেহারা না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেছে দেখ। ছোট ভাইটী কর্ম্ম করে, তুমি কেন কর্ম্ম কর না, বাছা? তুমি বুঝি লেখাপড়া জান না?"

তারা।—"বাঙ্গালা জানি আর ইংরাজী অক্ষর চিনি।"

হরকালী।—"তুমি অঙ্ক জান?"

তারা।—"আমি ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত ক'রতে পারি।"

হরকালী।—"আচ্ছা, তোমার কাকা যে বিদেশে থাকেন বল্‌লে, তিনি তোমাদের টাকা দেন না?"

তারা।—"তিনিই তো টাকা দেন। তবে তাঁর আয় কম; মাসে মাসে সমান টাকা দিতে পারেন না। যখন যেমন হয়,

তখন তেমনি দেন। হরকুমার তো আজ মাস খানেক কাজ করছে! তিনি না দিলে, আমরা এত বড় হলুম কোথা থেকে?"

গৃহিণী।—"আচ্ছা, তোমরা যে ভাত খাওনা; আহা, মা নেই; তাই বুঝি কে রেঁধে দেবে বলে ভাত খাও না! তোমার কর্ম্ম হ'লে তোমরা কি ভাত খাবে? তখন কে রেঁধে দেবে?"

তারা।—"হরকুমার জানে না; আমি রাঁধতে পারি।"

গৃহিণী।—সে কি গো! বেটা ছেলে তুমি, কি করে রাঁধবে?"

তারা।—"মার অসুখ কর্‌লে [illegible] আমিই রাঁধতুম।"

গৃহিণী।—"আহা আমার বাছারে! আচ্ছা তোমার নাকে কাণে ছেঁদা কেন?"

তারা।—"ছেলেবেলায় দিদি-মা আমাকে মেয়ে সাজিয়ে গয়না পরাতেন।"

গৃহিণী।—"তোমরা দু'ভাই আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়ীতে খেও। লুচি খাবে, মাছ খাবে, দুধ খাবে।"

তারা।—"আমাদের মা মরেছেন, এক বৎসর মাছ খেতে নেই; আর কারুর বাড়ীতে খেতে নেই।"

গৃহিণী।—"হাঁ হাঁ, সব ভুলে যাই, কাল অশুদ্ যে! আচ্ছা, বাছা তুমি এক কাজ কর না! কোথায় কাজ-কর্ম্ম খুঁজে বেড়াবে! আমাদের প্রভা আর বিভাকে কেন দুপুর বেলা পড়াও না? মেয়ে দুটো দৌরাত্ম্যি করে বেড়ায়, আট্‌কা

থাক্‌বে। বাবু তোমাকে মাসে আট টাকা মাহিনা দিবেন। আর তুমি একটু একটু "ইংরাজী ঘরে ব'সে শেখ। বড় হ'লে চাক্‌রী করবে।"

হরকালী।—"হাঁ কে ছোক্‌রা তাই কর।"

গৃহিণী।—"আর আজ বাছা তোমরা যখন পরের বাড়ী খাবে না, আমি চাল ডাল সব পাঠিয়ে দিই, তোমরা রেঁধে খেও।"

তারা হাতে স্বর্গ পাইল। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। গৃহিণী তারাকুমার ও হরকুমারেরওয়ঃ এক মাসের মত চাল, ডাল, কাঠ, তৈল, কয়লা সব পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার সময় হরকুমার বাড়ীতে আসিয়া ভাত, ডাল, তরকারী পাইয়া খুব আনন্দে খাইল। হরকালী বাবুর ও তাঁহার গৃহিণীর সহিত যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তারা হরকুমারকে সব বলিল।

সেই রাত্রিতে যখন দুইজনে শয়ন করিল, অনেক রাত্রি পর্যান্ত তারার ঘুম হইল না। তারার কপালে যখন দুইটি মেয়ে পড়ান ছিল, তাহার পুরুষ বেশ পরিয়া সমাজকে প্রতারণা করিবার কোনও আবশ্যকই ছিল না। আর, এক প্রতারণা করিতে গিয়া, কত মিথ্যা কথা কহিতে হইতেছে! সে বৃথা পাপে লিপ্ত হইতেছে। কিন্তু এখন আর উপায় নাই, আরও অনেক প্রবঞ্চনা করিতে হইবে, আরও অনেক মিথ্যা কথা

কহিতে হইবে। এইরূপ অনেক ভাবনা ভাবিয়া তারা ঘুমাইয়া পড়িল।পরদিন হইতে তারা চাকরী করিতে লাগিল।

(৭)

তিন চারি দিন পরে রবিবার আসিল। যামিনী তারাকে দেখিল, তারাও যামিনীকে দেখিল। উভয়ে উভয়ের দিকে অনেক-ক্ষণ চাহিয়া রহিল। যামিনী আগেই কথা কহিল—"তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

"হুগলি জেলায়, তারকেশ্বরের কাছে। আমি কখনও দেখি নাই। ভবানীপুরে থাক্‌তুম, এখন এখানে এসেছি।

"তুমি ইংরাজী জান?"

"না।"

"আমি তোমাকে ইংরাজী পড়াব, তুমি পড়বে?"

"আমি আপনি পড়ব। আমার ভাইয়ের কাছে পড়ব।"

যামিনী চলিয়া গেল। তারা বড় রোগা; কিন্তু এত সুন্দর রূপ—যামিনী তো কোথাও দেখে নাই! বিশেষতঃ, তারার কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট!

তারা বড় বিপদে পড়িল। সে দিন বৈকালে ভাল করিয়া রাঁধিতে পারিল না। যাহা কিছু করিতে যায়, কোনও কর্ম্মে মন বসে না। সে যামিনীকে দেখিয়া অবধি, কেবল যামিনীকে ভাবে। যামিনী কেন এত যত্ন করিয়া কথা কহিল? যামিনী

কেন তাহাকে পড়াইতে চাহিল? তারার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় হরকুমার আসিল; তাহার সহিত তারা ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিল না। এ বাড়ীতে আসা অবধি মাধব ঘোষাল আইসেন নাই। এ রাত্রিতে তিনি বাড়ীতে আসিলেন। তারা পিতার সহিতও ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিল না। কেবলই হাঁ, না, আচ্ছা করিয়া পিতার প্রশ্নের উত্তর দিল। হরকালী বাবুর বাড়ীর কোনও কথা হইল না।

মাধব বাবু ভোরে চলিয়া গেলেন। তারা গৃহকর্ম্ম সকলই করিল; কিন্তু মন কিছুতেই নাই, মন কেবল যামিনী যামিনী করিতেছে। হরকুমার চলিয়া গেলে যামিনীকে দেখিবার জন্য কলেজে যাইবার সময়, সে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। যে অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাই তাহার যুগ পরিমাণ মনে হইতে লাগিল। একবার মনে হইল, সে তো পুরুষ সাজিয়াছে, আড়ালে না থাকিয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলেই তো হয়! কিন্তু তাহা পারিল না। কেন যে লুকোচুরি, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; কিন্তু যামিনীকে না দেখিলেই নয়! যামিনী বাড়ীর বাহির হইল। সেও, জেলেদের বাড়ীর দিকে যেন কাহাকে খুঁজিতেছে! কিছু দেখিতে না পাইয়া কলেজে চলিয়া গেল।

বেলা হইল। তারা আহারাদি করিয়া, হরকালী বাবুর বাড়ীতে পড়াইতে গেল। প্রথমেই হরকালী বাবুর গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ।

গৃহিণী বলিলেন,—"তারা, তোমাকে দাদাবাবু পড়াইতে চাহিলেন, তুমি তাহার কাছে পড়িবে না ?"

"না, মা, দাদাবাবুর নিজের পড়ার ক্ষতি হইবে।"

"সে বল্‌ছিল, তুমি বড় সুন্দর!"

তারা আর উত্তর দিতে পারিল না। মাথা নীচু করিয়া রহিল। প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেই তাহাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। যামিনী আন[illegible] যাহা বলিয়াছে, তাহা শুনিয়া তারার ভ্যাবাচাকা লাগি[illegible], সে চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছে। সে কোনমতে সামলাইয়া লইল। গৃহিণীর মনে সন্দেহ থাকিলে ধরা পড়িত। যাহা হউক, বিপদ কাটিয়া গেল, গৃহিণী চলিয়া গেলেন। তারা শিশুদিগকে পড়াইতে বসিল।

সপ্তাহ কাটিয়া গেল, আবার রবিবার আসিল। তারা প্রমাদ গণিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া যামিনীকে দেখিতে ভালবাসে, কিন্তু একেবারে সম্মুখে যাইতে তাহার একটা কি হয়। সেটা ভয় নহে—লজ্জা। তারার ইচ্ছা—যামিনীর কথা শুনে; কিন্তু যমিনীর সহিত কথা কহিতে সাহস হয় না। এ বিপদে কি উপায় ? প্রবঞ্চনা বৈ গতি নাই।

গৃহকর্ম্ম সারিয়া, আহারাদি করিয়া, তারা শুইয়া পড়িল। হরকুমারকে দিয়া বাবুদের বাড়ী খবর পাঠাইয়া দিল যে, অসুখ করিয়াছে।

ইহাতে আপদ শান্তি হইল না। হরকালী বাবুর স্ত্রী খোকাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হরকুমারকে তিনি 'খোকা' বলিয়া ডাকিতেন। হরকুমার বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না; কেবল বলিল,—"কি অসুখ, তা জানি না; কিন্তু অসুখ করেছে।"

যামিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। গৃহিণী তাহাকে তারাকুমারকে দেখিয়া আসিতে বলিলেন। বা

যখন তারা বাহিরে হরকুমারের ও আর এক জনের পদশব্দ শুনিতে পাইল, তখনই বুঝিল যে, এ আর একজন যামিনী। মিথ্যাকথায় ফলোদয় হইল না; সেই যামিনীই আসিল। যামিনী আসিয়াছে বলিয়া মনে আনন্দ হইল; আবার কি করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবে, এই একটা সমস্যা হইল। যাহা হউক, যামিনী আসিল, কথাবার্ত্তাও হইল। 'মাথা ধরিয়াছে' বলিয়া ভাণ করিয়া অসুখটা কি, যামিনীকে তাহা তারা বুঝাইয়া দিল। একটা সুবিধা হইল, অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়া তারার সঙ্কোচটা দূরে গেল—লজ্জা কাটিয়া গেল; আর তাহার যামিনীর সহিত আলাপের বিঘ্ন রহিল না।

তারার উপর যামিনীর স্নেহ হইয়াছে, যামিনীর উপর তারারও অনুরাগ জন্মিয়াছে। কিন্তু এ স্নেহ ও এ অনুরাগ যে কি, তাহা উভয়েই বুঝিতে পারে নাই। হরকালী বাবু,

তাঁহার গৃহিণী ও বাড়ীর আর সকলে তারা ও হরকুমারকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভা ও বিভা উভয়েই তারার বড় অনুগত হইল। মাধব বাবু দশ পনের দিন বাদে এক এক রাত্রি পুত্রকন্যাকে দেখিয়া যাইতেন।

(৮)

তিন বৎসর কাটিয়াছে। যামিনী তারাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না, তারাও যামিনীকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। এখন সন্ধ্যার পর নিত্য নিত্য যামিনী একা তারাকে ইংরাজী পড়ায়। তারাও অনেক শিখিয়াছে। শিক্ষক অতি যত্ন করিয়া পড়ায়, শিক্ষকের প্রীতি ও উৎসাহনের জন্য তারাও মনোযোগ করিয়া পড়ে।

তারার সর্ব্বদা সর্দ্দী, কাশী, গায়ে ব্যথা। শরীরের আবরণ একবারও উন্মোচন করে না। সমাজ বিধবা তারাকে স্বামিসুখে বঞ্চিত করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতি তারাকে যৌবন দিতে ছাড়িল না। নবযৌবন তাহার শরীর বিভক্ত করিল। প্রবঞ্চনা আর চলে না।

এদিকে যামিনী বি-এ পাশ হইল। বাড়ীতে বড় ধুমধাম। থিয়েটারের উদ্যোগ হইল। স্বয়ং যামিনী মেঘনাদ সাজিবে। প্রমীলা সাজিবার বালকের অভাব। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া বালক পাওয়া গেল না। শেষে তারার উপর লোকের চক্ষু পড়িল। তারা প্রমীলা সাজিবে স্থির হইয়া গেল।

আজ থিয়েটার। বাড়ী সুসজ্জিত, আলোকে পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণ

জনপরিপূর্ণ। থিয়েটার আরম্ভ হইল। অভিনেতৃগণ সকলেই সুশিক্ষিত, অভিনয়ে সকলেই মুগ্ধ। উপরে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার আসন ছিল! তাঁহারাও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে, যখন সুপ্তা প্রমীলাকে নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য মেঘনাদ বলিলেন,—

"—ডাকিছে কুজনে,
হৈমবতী উষা [illegible], রূপসি, তোমারে
পাখীকুল। মিল, প্রিয়ে, কমললোচন।
উঠ চিরানন্দ মোর, সূর্য্যকান্তমণি
সম এ পরাণ, কান্তে, তুমি রবিচ্ছবি—
তেজোহীন আমি, তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম, তুমি হে জগতে
আমার। নয়নতারা, মহার্হ রতন।"

দর্শকগণ মোহিত হইয়া গেল। ইহা যে নাটক অভিনয়, তাহারা ভুলিয়া গেল। বক্তৃতা এত স্বাভাবিক হইল যে, প্রমীলার চক্ষে জল আসিল। মেঘনাদ নিজে গলিয়া গেল। যামিনীর মাতার চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রু পতিত হইল। তিনি ঐরূপ একটী সুন্দরী কন্যা আনাইয়া, এক মাসের মধ্যে যামিনীর বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন। মেঘনাদ ও প্রমীলা উভয়ে উভয়কে বাহু বেষ্টিত করিয়া শয়নকক্ষ হইতে নির্গত হইয়া গেলেন। এ সুন্দর

দৃশ্য গৃহিণীর প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর করিল। দম্পতিও ভাবে আত্মহারা।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে যখন প্রমীলা মেঘনাদকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

"রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ। শুনিয়াছি, শশিকলা নাকি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা, দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষসকুলরবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগৎ, নাথ, কহিনু তোমারে।"

তখন রঙ্গমঞ্চের বাহিরেও একটা [illegible] হইতেছিল। প্রমীলার বক্তৃতা শুনিয়া হরকালী বাবু থাকিতে পারিলেন না; তিনি বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন। দৌড়াইয়া বাড়ীর ভিতর আসিয়া, গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, কেমন মানাইয়াছে! তারাকুমারকে বেটাছেলে বলিয়া কিছুতেই টের পাওয়া যায় না।"

"শীঘ্রই যামিনীর বিয়ে দিতে হবে। অমনি একটি সুন্দর মেয়ে চাই, এক পয়সাও চাই না। এই মাসের মধ্যে।"

"আহা—তারা যদি মেয়ে হত!"

"যদি মেয়ে হত!"

ইতিমধ্যে প্রমীলা বলিয়া উঠিল;—

প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্রনন্দিনী,
সাধি তোমা, কৃপাদৃষ্টি কর লঙ্কাপানে
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে।

অভেদ্য কবচরূপে আবর শূরেরে।
যে ব্রততী সদা সতী, তোমারি আশ্রিত
জীবন তাহার জীবে, ওই তরুরাজে,
দেখো মা কুঠার যেন স্পর্শে না উহারে।
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি,
তোমা বিনা জগদম্বে, কে মান রাখিবে?"

বলিতে বলিতে প্রমীলা অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া গেল। যামিনীর পিতামাতার অবস্থাও তাদৃশ; তাঁহারা উভয়েই একবাক্যে বলিলেন,—"আহা তারা যদি মেয়ে ছেলে হ'ত।"

অভিনয় যথাসময়ে শেষ হইয়া গেল। হরকালী বাবু ও তাঁহার স্ত্রী একত্রে শয়ন করিয়া কেবল যামিনীর বিবাহের কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মহা কষ্ট—তারা মেয়ে ছেলে নয়। মেয়ে ছেলে হইলে তাঁহারা তারার সহিত [illegible] বিবাহ দিতেন। যামিনী ও তারাকে স্ত্রীপুরুষ ভাবে দেখিয়া, ইহারা মোহিত হইয়া গিয়াছেন।

(৯)

যামিনী অস্থির হইয়া গিয়াছে। সে তারাকে বাহুবেষ্টন করিয়াছে, তাহার শরীরের ভিতর বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়াছে। তারা যে কিরূপ বালক, যামিনী স্পষ্ট বুঝিয়াছে। তারাকে সে আজি তিন বৎসর চক্ষের অন্তরাল করিতে পারে নাই; মনে করিত—

একটা স্নেহ। এখন বুঝিল—এ স্নেহ নহে, প্রণয়। কিন্তু তারা কেন পুরুষ সাজিয়া কাটায়?

তারার হর্ষবিষাদ। যামিনীকে স্বামী সম্বোধন করিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই। মনের অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। যামিনী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে, আদর করিয়া প্রিয়-সম্ভাষণ করিয়াছে, তাহার জীবন কৃতার্থ হইয়াছে। কিন্তু সে বিধবা; পরপুরুষ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, আর তাহার বাঁচিয়া থাকা উচিত নহে। আর বাঁচিলে ধর্ম্মে জলা[illegible]া দিতে হইবে। যতদূর হইয়াছে, সেই পাপই যথেষ্ট; কিন্তু আর পাপে কাজ নাই। যে পাপ হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি? আবার তারা ভাবিল—কিসের প্রায়শ্চিত্ত? তাহার কি পাপ?

তাহার ক্ষুদ্র মনে সে অনেক চিন্তা করিল; চিন্তার কূল পাইল না। যেটুকুখানি কূল পাইল, তাহা এই যে, যামিনীকে না পাইলে, তাহার জীবন বৃথা। কিন্তু যামিনীকে পাইলে, তাহার পিতৃকুলে, শ্বশুরকুলে ও যামিনীর পিতামাতার মনে দারুণ আঘাত লাগিবে।

পরদিন সকালবেলা যামিনী তারার গৃহে আসিল। তখন হরকুমার কাজে গিয়াছে।

যামিনী বলিল,—"তারা।"

"কি

"তুমি আমাকে ভালবাস ?"

"ভালবাসি।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি পুরুষ সাজিয়া থাক কেন ?"

তারা অকপটে সকল কথা বলিল।

"তুমি আমাকে বিবাহ করিবে ?"

তারা।—"তাও কি কখনও হয় ? বিধবার আবার বিবাহ কি ? তোমার জাতি যাবে। তোমার বাপ মার কাছে, আশ্রিত থাকিয়া, আমি তাঁহাদের ইক্ষেকুল খাইব ? তাহা কখনও হইতে পারে না।"

যামিনী।—"তোমাকে না পাইলে, আমি থাকিতে পারিব না।"

যামিনী চলিয়া গেল। সে পিতামাতাকে বুঝাইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত দেখাইয়া, তাঁহাদিগকে এ বিবাহে সম্মত করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিল।

... ...

সন্ধ্যার সময় হরকুমার ছাপাখানা হইতে আসিয়া দেখিল,—তারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।